জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

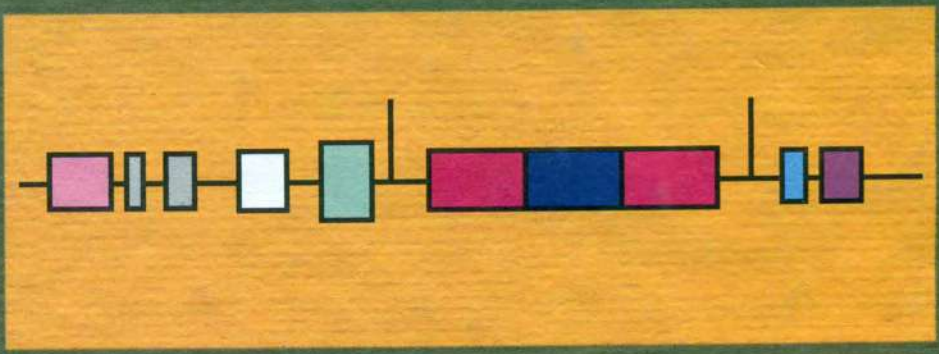

মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক গ্রন্থটি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যসূচি অনুসরণে প্রণীত। জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত জীবপ্রযুক্তির আধুনিকতম উপশাখা হলো জিন প্রকৌশল বা জিন প্রযুক্তি। জিনের গঠন ও কাজ, জিন কর্তন ও জিন ডিজাইনকরণ এবং জিনের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ ফসলে জিন সংযোজন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন জিন প্রযুক্তির আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া ফসল উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ফসলে জিন ক্রিয়ার স্বরূপ অন্বেষণ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট জিএম ফসলের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আগামী দিনে ফসল উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। জিএমও সম্পর্কে সাধারণভাবে যেসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা রয়েছে সে সম্বন্ধে এ গ্রন্থে বিধৃত করা হয়েছে। গ্রন্থটি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজে আসবে আশা করা যায়। সর্বোপরি পাঠ্যসূচি অনুসরণে বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়নে যথাসম্ভব আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধকরণ ও প্রমিত বানানে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের অভ্যাস গঠনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে।

Bangla Academy
ISBN 984-07-4671-5

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
প্রফেসর
কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

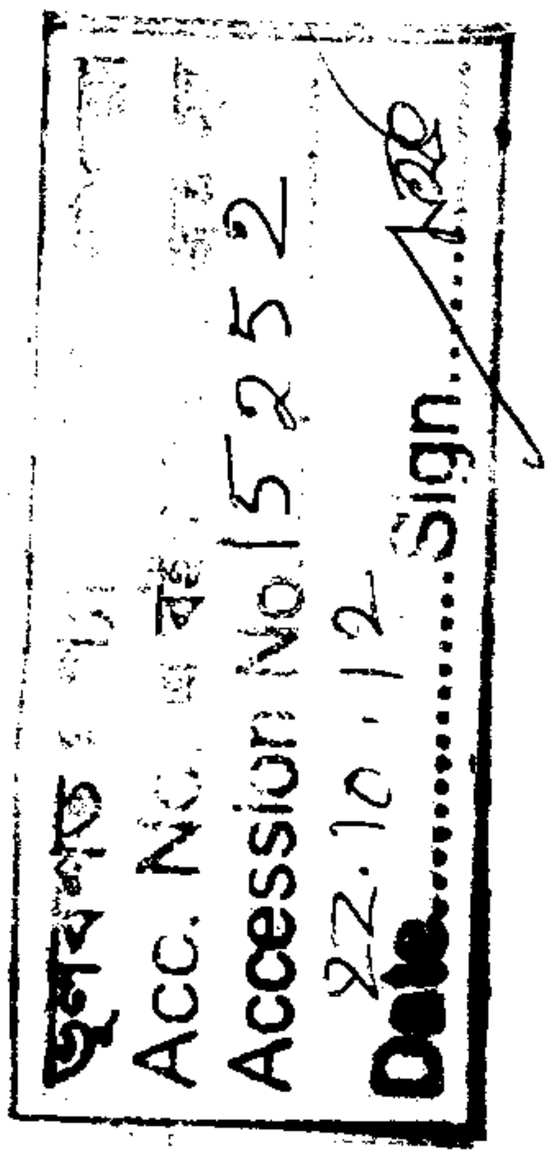

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৫ / জুন ২০০৮

বাএ ৪৬৬২
(২০০৭ - ২০০৮ : পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ৯)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ
জীকৃচি ৩৩৮

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত পনের টাকা মাত্র

GENETICALLY MODIFIED FOSHOL : BARTAMAN O VABISSAT (Genetically Modified Crops : Present and Future). Published by Dr. Abdul Wahab, Director (In-charge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, First Published : June 2008. Price Taka : 115.00 only.

ISBN 984 - 07 - 4671-5

উৎসর্গ

ফসল উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে
যাঁরা কথা বলছেন তাঁদের উদ্দেশে

ভূমিকা

'জেনেটিক্যালি মোডিফাইড' শব্দ দুটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'জিএম' অক্ষর দুটি ব্যবহারে গঠিত শব্দটি আজ আর অপরিচিত নয়। জিএম শব্দটি জুড়ে দিয়ে এখন পাওয়া যায় জিএম ফসল, জিএম মাছ, জিএম প্রাণী এবং সব মিলিয়ে জিএম খাদ্য। গত তিন দশক ধরে অভূতপূর্ব সাফল্য সৃষ্টি করেছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিনপ্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত জিন আহরণ করে তা ফসলে বা অন্য জীবে এখন সংযোজন করা যায়। সকল জীবের ডিএনএ গঠনে যে আশ্চর্য রকম সাজুয্য রয়েছে সে সাজুয্যের কারণেই যে কোনো জীব থেকে ফসলে জিন সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের জিন কিংবা মাছ বা ভেড়ার জিন ফসলে ঢুকিয়ে দেয়ার বিষয়টিকে অনেকেই ভালো মনে করছে না। এমনকি জিন সংযোজনে ব্যবহৃত জিন প্রযুক্তিটির মধ্য দিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেকের আশংকা রয়েছে। আবার অন্য দিকে 'জিএম' ফসল অধিকতর পরিবেশ-বান্ধব বলে অনেকে মনে করেন। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবীয় ও অজীবীয় পীড়নের সহিষ্ণু ফসলের জাত সৃষ্টির ফলে ফসল উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে বলে অনেকে মনে করেন। ভালো-মন্দ নানারকম দোলায় দুলছে মানুষ জিএমও নিয়ে। তদুপরি এ বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সহজে বিষয়টি সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারে সে চিন্তাও মাথায় রয়েছে অনুক্ষণ। সবচেয়ে বড় কথা, যেসব মানুষের মনে জিএমও বা জিএম ফসল নিয়ে বহুমাত্রিক প্রশ্ন রয়েছে তাঁদের কৌতূহলও যেন নিবৃত হয় সে উপাদানও এতে রয়েছে– অর্থাৎ সবরকম পাঠকের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে পারবে এ আশা নিয়ে বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। জিএম ফসলের প্রতি আলাদা কোনো পক্ষপাত নয় বরং প্রকৃত সত্যটাকে তুলে ধরাই এ গ্রন্থটি রচনার মূল কারণ। পুরোপুরি পাঠ্য পুস্তক না হলেও এটি যে একটি পাঠ্যসহায়ক বই হিসেবে সুধীজনের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

গ্রন্থটিকে আরও তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর করা যেতো। কিন্তু তাতে সব ধরনের পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি নিয়ে যাওয়া কঠিন হতো। সে কারণে সব কুল রক্ষা করার একটি ব্যবস্থা এতে নেয়া হয়েছে। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী আগামীতে গ্রন্থটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে।

সর্বোপরি, জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে গর্ববোধ করছি।

জুন ২০০৮

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল পরিচিতি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল উদ্ভাবন	৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল	২২
চতুর্থ অধ্যায়	:	কীট প্রতিরোধী ফসল	২৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল	৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ফসল	৪০
সপ্তম অধ্যায়	:	ছত্রাক প্রতিরোধী ফসল	৪৫
অষ্টম অধ্যায়	:	অজীবীয় প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ফসল	৪৯
নবম অধ্যায়	:	ভিটামিন- এ সমৃদ্ধ ধান	৫৬
দশম অধ্যায়	:	অধিক গুণবিশিষ্ট জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল	৬০
একাদশ অধ্যায়	:	ফুলের বর্ণ, গন্ধ, গঠনকাঠামো ও সংরক্ষণকাল পরিবর্তন	৬৬
দ্বাদশ অধ্যায়	:	জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টি	৭১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	আণবিক ফার্মিং	৭৬
চতুর্দশ অধ্যায়	:	আগামী দিনের জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল	৮৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের বিশ্ব পরিস্থিতি	৯১
ষোড়শ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও বাংলাদেশ	৯৫
সপ্তদশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও পরিবেশ	১০১
অষ্টাদশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও জনস্বাস্থ্য	১০৮
উনবিংশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্যে পরিচিতি প্রদান	১১৪
বিংশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল নিয়ে নানা প্রশ্ন	১১৯
একবিংশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও মেধাস্বত্ব	১২৪
দ্বাবিংশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও ফসলের জিন সম্পদ	১৩৩
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	:	জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও জীব নিরাপত্তা	১৩৭
চতুর্বিংশ অধ্যায়	:	বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও জিএম ফসল	১৪৪
		তথ্যপঞ্জি	১৪৯

প্রথম অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল পরিচিতি

১. আবাদী ফসল নির্বাচনের পটভূমি

প্রায় আট থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ ফসলের আবাদ শুরু করে। আর সে সময় থেকেই শুরু হয় ফসলের নানারকম উন্নয়নের কাজ এবং ফসলের মাঠ থেকে নির্বাচন করে নেয় তার পছন্দের গাছ। এভাবে নির্বাচন করার ফলে দিনে দিনে পাল্টে গেছে ফসলের অবয়ব। প্রকৃতি বরাবরই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে ফসলের এ রূপান্তরে। ফসলের কোষস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত ডিএনএ অণুর মধ্যে সৃষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আকস্মিক পরিবর্তন ফসলের নানা বৈশিষ্ট্যে নিয়ে আসতো পরিবর্তন। এসব পরিবর্তন মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। যেসব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন গাছকে প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য অধিকতর সুযোগ করে দিত প্রাকৃতিকভাবে সেসব গাছ এমনিতেই প্রাকৃতিক নির্বাচনে অধিক সুবিধা পেতো। এর সাথে মানুষের নির্বাচনী শক্তি মিলে বাছাই করে নিয়েছে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছ। ফসলের নিজস্ব মিয়োটিক কোষ বিভাজন কৌশল ও প্রাকৃতিক সঙ্করায়ন তথা পর-পরাগায়ন মিলে ফসলের বৈশিষ্ট্যে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতো তার উপরও চলতো প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম নির্বাচন। এভাবে নানা বৈশিষ্ট্য রূপান্তরের মাধ্যমে চলতো আগের দিনের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। তখনও মানুষ জানতো না কিভাবে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কিভাবে পিতামাতা থেকে বৈশিষ্ট্য বাহিত হয় সন্তানে, কে বহন করে নিয়ে যায় এসব বৈশিষ্ট্য।

২. মেন্ডেলের সূত্রের আলোকে ফসল উন্নয়ন

গত শতাব্দীর গোড়াতে এসে মানুষ জানতে পারে বংশগতির রহস্য। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে এ রহস্য উন্মোচন করেন ১৮৬৫ সালে। তাঁর গবেষণা কর্ম ছিল সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রসরমান। সে কারণে তাঁর চিরায়ত গবেষণা কর্মের ফলাফল বড় বড় বিজ্ঞানীরাও বুঝতে ব্যর্থ হন। সেজন্য বংশগতির উদ্‌ঘাটিত রহস্য বুঝতে মানুষের সময় লেগে যায় আরও পঁয়ত্রিশ বছর। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে এসে পুনরাবিষ্কৃত হয় মেন্ডেলের সূত্রদ্বয়ের সত্যতা। এ আবিষ্কার ভীষণরকম নাড়া দেয় জীববিজ্ঞানে। নতুন আঙ্গিকে শুরু হয় ফসল আর পশু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। জানা সম্ভব হয় কিভাবে বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয় পিতামাতা থেকে সন্তানে। কিন্তু তখনও অজানা রয়ে যায় আসলে কে বহন করে নিয়ে চলেছে এসব বৈশিষ্ট্য। কি বা তার গঠন। আর কিভাবে এত বৈশিষ্ট্যের তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ থাকে সেখানে যা নির্ভুলভাবে সঞ্চারিত হয় সন্তানে।

৩. ডিএনএ ও প্রোটিন উৎপাদন

ডিএনএ-এর রহস্য উন্মোচনের জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় আরও পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়। ১৯৫৩ সালে এসে ওয়াটসন এবং ক্রিক (Watson and Crick) নামক দু'জন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে ক্রোমোজোমের মধ্যকার ডিএনএ অণুর গঠন রহস্য। এরপর থেকে শুরু হয় ডিএনএ ভিত্তিক ব্যাপক গবেষণা। ক্রমে ক্রমে জানা সম্ভব হয় কিভাবে কাজ করে ডিএনএ। জানা যায় যে, ডিএনএ-এর একটি অংশ হলো 'জিন'। এসব জিনই আসলে নিয়ন্ত্রণ করে যতসব বৈশিষ্ট্য। এসব জিন থেকে তৈরি হয় বার্তাবহনকারী আরএনএ (messenger RNA বা m-RNA)। এর মধ্যে চলে আসে জিনের যত তথ্য। এ কাজটি সম্পন্ন হয় কোষস্থ নিউক্লিয়াসের ভেতরে। অতঃপর বার্তাবহনকারী আরএনএ চলে আসে সাইটোপ্লাজমে। সংযুক্ত হয় চমৎকারভাবে রাইবোজোমের সথে। সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান অ্যামাইনো এসিডকে বার্তাবাহক আরএনএ-এর তথ্যানুযায়ী ধরে এনে সুন্দর করে বসিয়ে দেয় রাইবোজোমের ভেতর। ধরে আনার কাজটি করে যে আরএনএ তাকে বলা হয় ট্রান্সফার আরএনএ (transfer RNA বা t RNA) (চিত্র ১.১)।

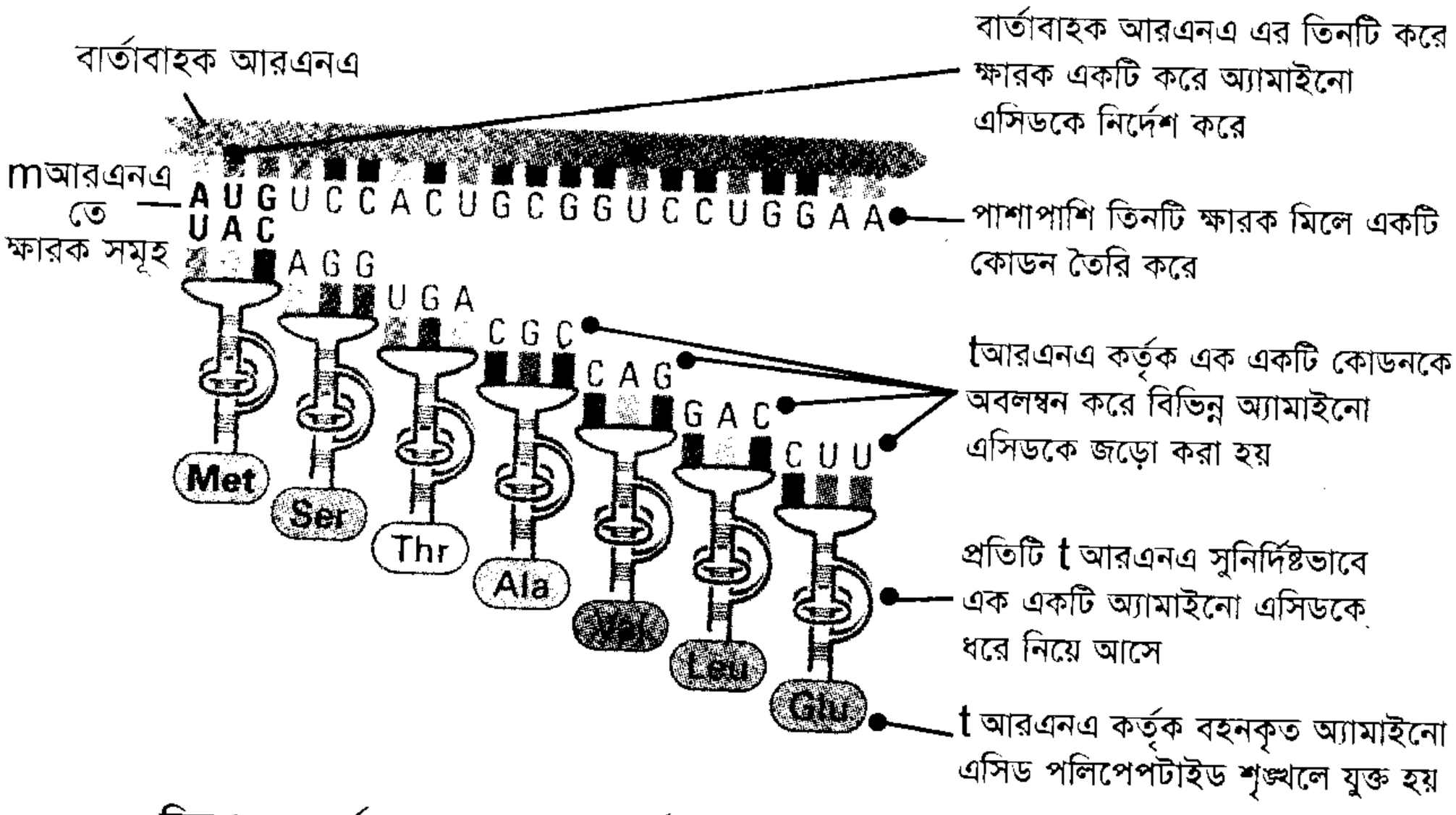

চিত্র ১.১: বার্তাবাহক আরএনএ কর্তৃক বয়ে আনা তথ্যানুযায়ী অ্যামাইনো এসিড পরম্পায় যুক্ত করার মাধ্যমে পলিপেপটাইড তথা প্রোটিন অনু সৃষ্টি

বার্তাবাহক আরএনএ-এর তিনটি করে নাইট্রোজেন ক্ষারক (nitrogen base) একটি করে অ্যামাইনো এসিডকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ তিনটি নাইট্রোজেন ক্ষারক মিলে

এক একটি জেনেটিক কোড (genetic code) তৈরি করে। U C A G (ইউরাসিল, সাইটোসিন, এডেনিন ও গুয়ানিন) এ চারটি নাইট্রোজেন ক্ষারক তিনটি করে কম্বিনেশনে তৈরি করে ৬৪টি জেনেটিক কোড। প্রোটিন তৈরির কাঁচামাল ২২টি অ্যামাইনো এসিডকে নির্দেশ করে এক একটি জেনেটিক কোড। ফলে এক একটি অ্যামাইনো এসিড, শুধু মিথিওনিন আর ট্রিপটোফেন ছাড়া, নির্দেশিত হয় একাধিক জেনেটিক কোড দিয়ে (চিত্র ১.২)।

সারণি ১.১ : আদর্শ কৌলিক সংকেতের অভিধান (M-RNA অণুতে)

	U	C	A	G	
	UUU Phe Phenyl alanine	**UCU** Ser Serine	**UAU** Tyr Tyrosine	**UGU** Cys Cysteine	U
U	**UUC** Phe Phenyl alanine	**UCC**Ser Serine	**UAC**Tyr Tyrosine	**UGC**Cys Cysteine	C
	UUA Phe Phenyl alanine	**UCA**Ser Serine	**UAA Termination**	**UGA Termination**	A
	UUG Phe Phenyl alanine	**UCG**Ser Serine	**UAG Termination**	**UGG** Trp Tryptophan	G
	CUU Leu Leucine	**CCU** Pro Proline	**CAU** His Histidine	**CGU** Arg Arginine	U
C	**CUC** Leu Leucine	**CCC** Pro Proline	**CAC** His Histidine	**CGC** Arg Arginine	C
	CUA Leu Leucine	**CCA** Pro Proline	**CAA** Gln Glutamine	**CGA** Arg Arginine	A
	CUG Leu Leucine	**CCG** Pro Proline	**CAG** Gln Glutamine	**CGG** Arg Arginine	G
	AUU Ile Isoleucine	**ACU** Thr Threonine	**AAU** Asn Aspargine	**AGU** Ser Serine	U
A	**AUC** Ile Isoleucine	**ACC** Thr Threonine	**AAC** Asn Aspargine	**AGC** Ser Serine	C
	AUA Ile Isoleucine	**ACA** Thr Threonine	**AAA** Lys Lycine	**AGA** Arg Arginine	A
	AUG Met Methionine	**ACG** Thr Threonine	**AAG** Lys Lycine	**AGG** Arg Arginine	G
	GUU Val Valine	**GCU** Ala Alanine	**GAU** Asp Aspartic acid	**GGU** Gly Glycine	U
G	**GUC** Val Valine	**GCC** Ala Alanine	**GAC** Asp Aspartic acid	**GGC** Gly Glycine	C
	GUA Val Valine	**GCA** Ala Alanine	**GAA** Glu Glutamic acid	**GGA** Gly Glycine	A
	GUG Val Valine	**GCG** Ala Alanine	**GAG** Glu Glutamic acid	**GGG** Gly Glycine	G

এভাবে বার্তা অনুযায়ী একটির পর একটি অ্যামাইনো এসিড সংযুক্ত হয় পরস্পরের সাথে। অবশেষে তৈরি হয় এক একটি প্রোটিন। এসব প্রোটিনের একটি বড় অংশ তৈরি করে নানারকম এনজাইম। এসব এনজাইম সংঘটিত করে নানা বিক্রিয়া। আর ফলশ্রুতিতে তৈরি হয় এক একটি বৈশিষ্ট্য। আর কোনো জিনে যদি পরিবর্তন ঘটে

তবে পরিবর্তন ঘটে প্রোটিনেও। পরিবর্তন ঘটে অনিবার্যভাবে এনজাইমে। পরিবর্তন আসে বিক্রিয়ায়। পরিবর্তন তৈরি হয় বৈশিষ্ট্যেও। এসব রহস্য ইতোমধ্যে জানা হয়ে যায় বিজ্ঞানীদের। m-RNA এর ৩ টি করে ক্ষারক একটি করে অ্যামাইনো এসিডকে নির্দেশ করে। পাশাপাশি তিনটি ক্ষারক মিলে একটি কোডন তৈরি করে। t-RNA কর্তৃক এক একটি কোডনকে অবলম্বন করে বিভিন্ন এমিনো এসিডকে জড়ো করা হয়। প্রতিটি t-RNA সুন্দরভাবে এক একটি এমিনো এসিডকে ধরে নিয়ে আসে। t-RNA কর্তৃক বহনকৃত অ্যামাইনো এসিড পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে যুক্ত হয়।

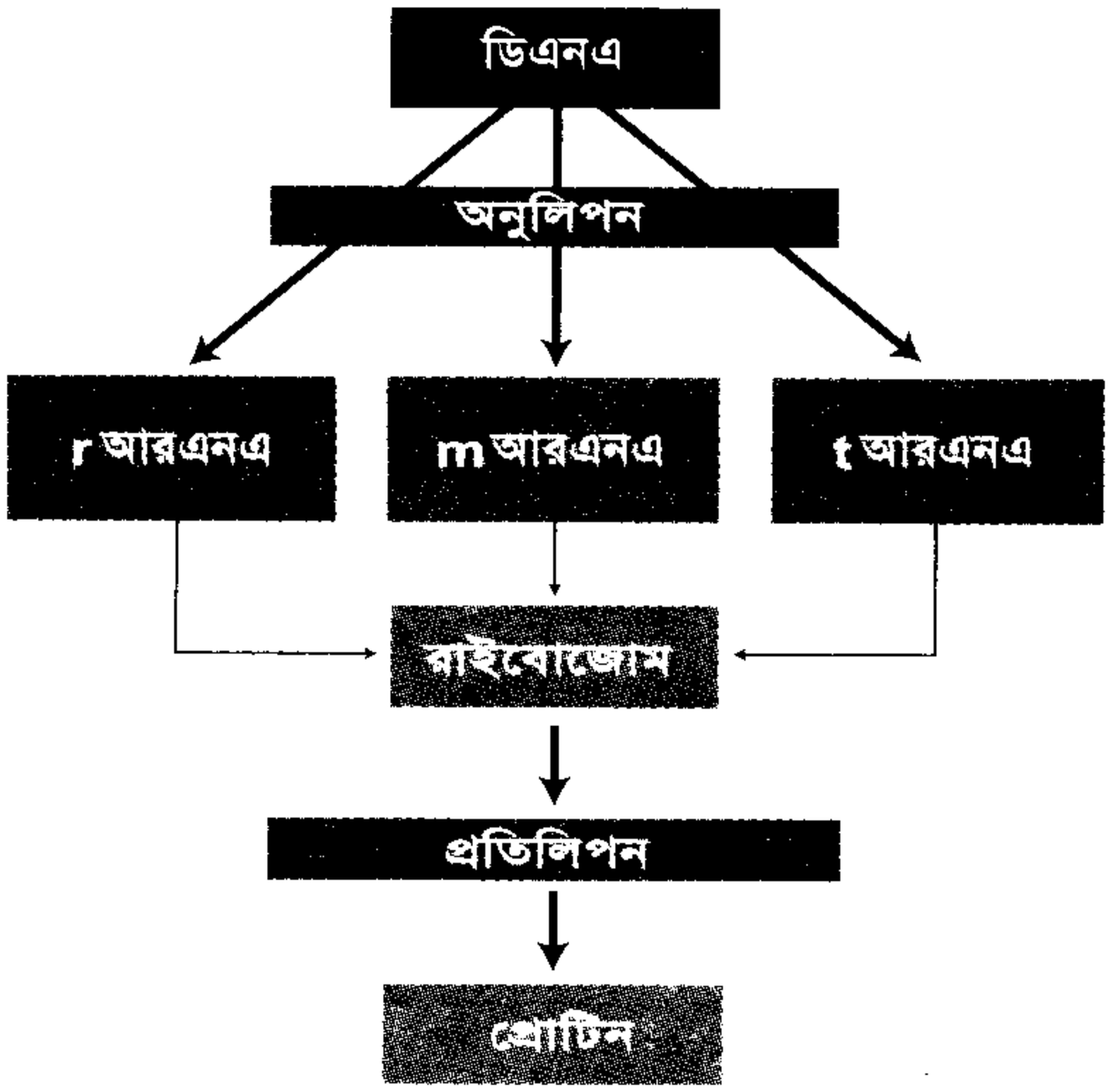

চিত্র ১.২: জিন / ডিএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি

৪. ডিএনএ ও প্রচলিত ফসল উন্নয়ন

ডিএনএ-এর গঠন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার পর থেকে অর্থাৎ গত শতাব্দির ষাটের দশকে এসে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেগবান হতে থাকে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ নানা কৌশল অবলম্বন করে জিনের নানা সংযোগ পুনঃসংযোগ ঘটিয়ে সৃষ্টি করে ফসলে বিভিন্নতা। আর এসব বিভিন্নতা থেকে বিজ্ঞানীরা বাছাই করে নেয় নানারকম উদ্ভিদ, তৈরি করে বিভিন্ন ফসলের নানারকম উন্নত জাত। এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ফসলের ফলন। কিন্তু এত সব সাফল্যের পাশাপাশি প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতির কিছু সমস্যা থেকেই যায়। প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে মূলত বৈশিষ্ট্যের আদান প্রদান সম্ভবপর হয় একই প্রজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন জাতের মধ্যে। ধানের এক জাতের বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করা যায় ধানের অন্য জাতে। ধানের বৈশিষ্ট্য গমের কোনো জাতে স্থানান্তর করা যায় না । এমনকি ধানের আবাদী প্রজাতিতে স্থানান্তর করা যায় না ধানের বুনো কোনো প্রজাতির বৈশিষ্ট্য সংকরায়ণের মাধ্যমে। এগুলোর সংকর বীজ

তৈরি করাই সম্ভব হয় না প্রচলিত পদ্ধতিতে। বুনো আধা বুনো প্রজাতির সাথে যৌন মিলন সম্ভব হয় না বলে প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসলে জিন আহরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতির আরো কিছু সমস্যা রয়েছে যা এতদিন অপনোদন করা সম্ভব হয়নি। নির্দিষ্ট একটি জিন কম্বিনেশন পাবার জন্য করতে হয় শত সহস্র ক্রস। কাঙ্খিত জিনের সাথে প্রায়ই থেকে যায় অনাকাঙ্খিত কিছু জিনও। আর কোনো ফসলের জাতে কোনো বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হলে তা সেই ফসলের অন্য জাতে না পেলে তা আর সংযোজন করার কোনো সুযোগ থাকে না। তাছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসলের এক একটি জাত পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় । ফলে বিকল্প কোনো পদ্ধতির কিংবা সহায়ক কোনো কৌশলের স্বপ্ন বিজ্ঞানীদের মনে বরাবরই যে জেগে উঠতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। সে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বিজ্ঞানীরা এতদিন।

৫. জিন প্রযুক্তিতে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল উদ্ভাবন

গত ত্রিশ বছর ধরে আণবিক জীববিদ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জিনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠন, জিনের নিয়ন্ত্রণ কৌশল, জিন কর্তন করার কৌশল, জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, জিনকে উদ্ভিদের কোষে পৌঁছে দেয়া, জিনের গতিবিধি লক্ষ্য করার কৌশল, কোষ বা কোষগুচ্ছ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি, পরিণত উদ্ভিদে জিনের উপস্থিতি এবং উদ্ভিদে জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এসব নানা তথ্য ততদিনে জানা হয়ে যায় বিজ্ঞানীদের। ইচ্ছে মাফিক যেকোনো জীব থেকে জিন আলাদা করে নিয়ে কোনো গাছে ঢুকিয়ে দিয়ে এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কাজটাকে বলা হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল। আর এভাবে যেকোনো জীবের জিন ফসলে ঢুকিয়ে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় যে ফসলে তাকে বলা হয় জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ক্রপ (Genetically Modified Crop) সংক্ষেপে জিএম ফসল।

ভিন্ন উৎস থেকে জিন এনে ফসলে সংযোজন করায় এটিকে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে রূপান্তরিত হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। আসলে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে নির্মিত ফসলের জাতও কিন্তু কৌলিতাত্ত্বিকভাবে রূপান্তরিত। নতুন জিন বিন্যাস না পেলে নতুন জাত হয় কি করে? এটিইতো প্রজননবিদদের মূল কাজ। বিজ্ঞানীরা তাই জিএম ফসল না বলে একে বলে ট্রান্সজেনিক ফসল (transgenic crop)। ট্রান্সজেনিক নামটি এসেছে ট্রান্সজিন (transgene) শব্দ থেকে। কোনো একটি ফসলের নিজস্ব প্রজাতির বাইরে থেকে আহরিত জিনকে ট্রান্সজিন বলা হয়। আর ফসলের দূর সম্পর্কিত প্রজাতি বা অনাত্মীয় কোনো প্রজাতি বা অন্য কোনো গোত্র বা অন্য কোনো জীব উৎস থেকে আহরিত ট্রান্স জিন ফসলে সংযোজন করে ফসলের যে জাত তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় জিএম ফসল বা ট্রান্সজেনিক ফসল।

জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ এতদিনে বিজ্ঞানীদের অনেক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। অনেক স্বপ্ন এখনো রয়ে গেছে স্বপ্ন হিসেবেই। দিনে দিনে গবেষণা যত বাড়বে

মানুষের স্বপ্ন তত পূরণ হবে। জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে অনেক বৈশিষ্ট্যই মানুষ রূপান্তর করতে চায়(সারণি১.২)। ফসলের সরাসরি ফলন বৃদ্ধি একটি অসম্ভব ব্যাপার।

সারণি ১.২ : জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরকরণে বিজ্ঞানীরা আগ্রহী

<table>
<tr><td rowspan="2"><u>বালাই ও আগাছা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন</u>
আগাছানাশক সহিষ্ণুতা
ভাইরাস প্রতিরোধিতা
কীটপতঙ্গ প্রতিরোধিতা
ছত্রাক প্রতিরোধিতা
ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধিতা</td><td colspan="2"><u>উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির উন্নয়ন</u>
পুংবন্ধ্যাত্ব ও হাইব্রিড বীজ উৎপাদন</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td><u>কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন</u>
খরা সহিষ্ণুতা
লবণাক্ততা সহিষ্ণুতা
শৈত্য সহিষ্ণুতা
প্লাবন সহিষ্ণুতা</td><td colspan="2"><u>ফসলের পুষ্টিমান বৃদ্ধি</u>
উচ্চ মিথিওনিন সমৃদ্ধ বীজ
উচ্চ লাইসিন সমৃদ্ধ বীজ
ভিটামিন সমৃদ্ধ ফসল</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ফসল কর্তন পরবর্তী মান উন্নয়ন
ফলের পরিপক্বতা বিলম্বিতকরণ
পুষ্প সংরক্ষণকাল বিলম্বিতকরণ
উদ্ভিদের পুষ্পের জীবনকাল বৃদ্ধি
উচ্চ স্টার্চসমৃদ্ধ গোলআলু মিষ্টতাসম্পন্ন সবজি</td><td>আনবিক ফার্মিং

তেল
স্টার্চ
প্লাস্টিক</td><td>

ভেকসিন
এন্টিবডি
এনজাইম</td></tr>
<tr><td colspan="2">দূষিত মাটি নির্বিষকরণ</td></tr>
</table>

উদ্ভিদের অনেক বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত ক্রিয়ার ফলাফল হলো ফসলের ফলন। এর পেছনে জড়িত রয়েছে বহুসংখ্যক জিন। এসব জিন আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা ক্রোমোজোমে। ফলে একটি বা দুটি জিন ফসলে সংযোজন করে সরাসরি ফসলের ফলন বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা কম । সে কারণেই অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে সেসব বৈশিষ্ট্য যাদের জন্য ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে। ফসলের ফলন কম হবার কারণগুলো খুঁজে বের করা হয়েছে। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের ফলন হ্রাস করার জন্য দায়ী জীবীয় ও অজীবীয় কারণগুলো দূর করা গেলে কোনো ফসলের ফলন দেয়ার যে কৌলিক (genetic) ক্ষমতা রয়েছে তার সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ কোনো ফসলের ফলন দেয়ার যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে তা অর্জনকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন জিন প্রযুক্তিবিদগণ।

ফসলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবার প্রধান অন্তরায় হলো ফসলের মাঠে আগাছার প্রভাব, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের আক্রমণের ফলে নানারকম রোগ সৃষ্টি; কীটপতঙ্গের আক্রমণ এবং অন্যান্য প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- শীত, খরা, বন্যা, অধিক উচ্চতাপ, লবণাক্ততা, ভারি ধাতব পদার্থ ইত্যাদি জনিত প্রভাব। ফসলভেদে এসব সমস্যার যেটি অধিকতর প্রবল সেটি প্রথম দূর করাই হলো মূল কাজ। এ কারণে জীবীয় (biotic) এবং অজীবীয় (abiotic) পরিবেশ প্রতিকূলতা দূর করার জন্য গবেষণা

চলছে পৃথিবীর নানা ল্যাবে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে অনেকগুলো ফসলের ট্রান্সজেনিক জাত (সারণি ১.৩)। এর কোনো কোনোটি ইতোমধ্যেই কৃষকদের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কোনো কোনোটি বা রয়ে গেছে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাঁচ ঘরে কিংবা মাঠে।

সারণি ১.৩ : বাণিজ্যিকভাবে আবাদকৃত জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

	বৈশিষ্ট্য	জিএম ফসল
১.	আগাছানাশক প্রতিরোধিতা	তুলা, সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা
২.	কীট প্রতিরোধিতা	গোলআলু, ভুট্টা, তুলা
৩.	ভাইরাস প্রতিরোধিতা	পেঁপে, স্কোয়াশ, গোলআলু
৪.	বিলম্বিত ফল পাকা স্বভাব	টমেটো
৫.	তেলের গুণমান বৃদ্ধি	ক্যানোলা, সয়াবিন

৫.১. আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল

আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের আবাদের ফলে এখন ফসল ফলানোর পূর্বে যেমন তেমনি ফসল ফলানোর সময়ও নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যাচ্ছে আগাছানাশক। এতে আগাছা মরে যাচ্ছে বটে তবে অক্ষত থেকে যাচ্ছে ফসল। অতি সহজেই ফসলের মাঠে আগাছা দমন করা সম্ভব হচ্ছে।

৫.২. কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ফসল

কীটনাশকের বিষক্রিয়ার হাত থেকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট কীটপতঙ্গ দমনের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক কীট প্রতিরোধী গোলআলু, ভূট্টা আর তুলার জাত। দিন দিন এগুলোর আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের গবেষণা চলছে জিএম বেগুন, টমেটো, মিষ্টিআলু, বাঁধাকপি, ব্রোকোলি, আপেল, ক্যানোলা আর আঙ্গুর নিয়ে। এসব ফসলের প্রধান প্রধান কীটপতঙ্গের বিপক্ষে তৈরি করা হয়েছে প্রতিরোধী জাত।

৫.৩. ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল

রোগজীবাণুর মধ্যে ভাইরাস মাঠ পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফসলের ক্ষতি করে। বিশেষ করে সবজি এবং ফলের ক্ষেত্রে ভাইরাসের আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে। একবার ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে গেলে একে দমন করার কোনো উপায় নেই বলে ভাইরাস প্রতিরোধী জিএম ফসল তৈরি করার বিষয়টি বরাবরই খুব গুরুত্ব দিচ্ছে বিজ্ঞানীগণ। ইতোমধ্যে পেঁপে আর স্কোয়াশের জিএম জাতের আবাদ শুরু হয়ে গেছে আমেরিকাসহ দু'একটি দেশে। আমাদের দেশে জিএম পেঁপে আবাদের বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। জিএম ভাইরাস প্রতিরোধী ফসলের জাত নির্মাণ করা হয়েছে আরও কিছু সবজিতে। এসব জিএম ফসলের জাত আগামী দিনগুলোতে পৌঁছে যাবে কৃষকের কাছে। অবমুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে যেসব জিএম সবজি এগুলোর মধ্যে রয়েছে শসা, লেট্যুস, বাঙি, তরমুজ এবং পাম।

৫.৪. ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ফসল

ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএম ফসলও তৈরি করা হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী আপেল, শসা, লেট্যুস, বাঙি, গোলআলু, স্কোয়াশ, তামাক আর টমেটোরও শেষ হয়েছে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৫.৫. ফসলের গুণমান বৃদ্ধি

প্রতিকূল পরিবেশ পীড়ন সহিষ্ণুতা ছাড়াও জিএম ফসল সৃষ্টির আরও অনেক রকম লক্ষ্য রয়েছে। এতদিন প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফসলের গুণে মনে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা সম্ভব হলেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয়নি। জিন প্রযুক্তির সুবাদে কেবল ফসলে জিন সংযোজন করা নয় বরং ফসলের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটানো যেতে পারে ফসলের কোনো কোনো জিন সরিয়ে দিয়ে বা কোনো কোনো জিনের ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে। টমেটোর ধীরে ফল পাকার স্বভাবটি অর্জিত হয়েছে টমেটোতে একটি জিন ঢুকিয়ে দিয়ে, ইথিলিন উৎপাদন করার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে। ইথিলিন ফল পাকার একটি অন্যতম উপাদান। তাই একে দমন করে তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর প্রথম জিএম ফসল Favr Savr নামক টমেটোর জাত।

অন্যান্য ফসলের গুণমান বৃদ্ধির লক্ষ্যেও তৈরি করা হয়েছে কিছু কিছু জিএম ফসল। সয়াবিনে পাওয়া গেছে উচ্চ মাত্রার ওলিয়েক এসিড। এটি অসম্পৃক্ত প্রকৃতির চর্বি হওয়ায় এ সয়াবিন সাধারণ সয়াবিন অপেক্ষা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তেল নিষ্কাশনের জন্য কোনো বাড়তি ঝামেলাও নেই। প্রচলিত সয়াবিনে যেখানে ওলিয়েক এসিডের শতকরা পরিমাণ ২৮ ভাগ সেখানে জিএম সয়াবিনে এর পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগের বেশি। ক্যানোলাতে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া গেছে উচ্চমাত্রার লরেট। খাদ্য শিল্পে লরেটসমৃদ্ধ ক্যানোলার এখন বেশ চাহিদা। চকলেটের বাইরে আবরণী দেয়া, কফিকে সাদা করা এমনি আরও কতরকম প্রয়োজনে লাগছে এ ফসল। ক্যানোলাতে সৃষ্টি করা হয়েছে অধিক ওলিয়েক এসিড সম্পন্ন জিএম জাত। স্বাস্থ্য ঝুঁকি কম বলে এর এখন ভীষণ কদর বাজারে। অধিক সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন আপেল, কলা, বাঁধাকপি, মরিচ আর স্ট্রবেরির জিএম ফসল কিছু দিনের মধ্যে কৃষকের হাতে আসবে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল উদ্ভাবন

১. জিন

জিএম ফসল মানে কোনো ফসলের সব জিনের সাথে সেই ফসল প্রজাতির গণ্ডির বাইরে থেকে সংগৃহিত একটি বা দুটি বাড়তি জিন জুড়ে দিয়ে পাওয়া ফসল । অল্প দু' একটি বাড়তি জিনের জন্য যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার জন্য তার নাম জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল। সুতরাং জিন এখানে একটি প্রধান বিষয়। কাজেই জিন কি বা জিন দেখতে কেমন সেটি আমাদের প্রথমে জানা দরকার। একটি জিনের প্রধান দুটি অংশ থাকে। একটি অংশ হলো জিনের তথ্য প্রদ্বানকারী অংশ যা জিনের মূল কাঠামো গঠন করে। এ অংশটিকে বলা হয় স্ট্রাকচারাল জিন (structural gene) বা সংকেত প্রদানকারী সিকুয়েন্স (coding sequence)। কোনো জীবের প্রোটিন তৈরি হয় এ অংশের তথ্যানুযায়ী। জিনের এই অংশটুকুর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উচ্চতর উদ্ভিদ বা প্রাণীতে একটি জিনের সম্পূর্ণ তথ্যাবলির মাঝে মাঝে কিছু কিছু আন্তঃজিনীয় ডিএনএ (Intergenomic DNA) এর মাধ্যমে জিনের মধ্যে বিরতি প্রদান করা হয়। যেসব ডিএনএ খণ্ডে জিনের তথ্যাবলি বিচ্ছিন্ন হয়ে বিন্যস্ত থাকে ডিএনএ- এর সেসব খণ্ডকে বলা হয় এক্সোন (exon)। আর তথ্যহীন যেসব ডিএনএ সিকুয়েন্স এক্সোনগুলোকে পৃথক করে রাখে তাদেরকে বলা হয় ইন্ট্রোন (intron)। এ ধরনের জিন থেকে বার্তাবাহক আরএনএ (m-RNA) তৈরি হলে এর প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ইন্ট্রোনগুলোকে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে বাইরে ঠেলে দেয় এবং জিনের অনিবার্য অংশ এক্সোনগুলো সুশৃঙ্খলভাবে জোড়া লেগে সম্পূর্ণ একত্রে জিনরূপে সন্নিবেশিত হয়। জিন হলো ডিএনএ-এর একটি অংশ (চিত্র ২.১)। ডিএনএ-এর যেটুকুই অংশ মিলে একটি তথ্য বহন করতে সক্ষম সেটুকুই হলো এক একটি জিন।

১.১ জিনের কাজ

জিনের কাজ হলো নানারকম আরএনএ তৈরি করা। সেটি হতে পারে বার্তাবাহক আরএনএ (m RNA), ট্রান্সফার আরএনএ (t RNA) বা রাইবোজোমীয় আরএনএ (r RNA)। তবে উদ্দেশ্য যদি হয় প্রোটিন বা এনজাইম তৈরি করা তবে তাকে প্রথমেই তৈরি করতে হবে বার্তাবাহক আরএনএ। জিনের প্রোটিন তথা এনজাইম তৈরির কাজ শুরু করতে হলে জিনটিকে বার্তাবাহক আরএনএ (m-RNA) তে রূপান্তরিত হতে হয়। এর জন্য জিনের রয়েছে অনুলিপন শুরু করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল যাকে অনুলিপন প্রারম্ভিক অঞ্চল (transcription start site) বলা হয়। জিন যেখানে শেষ সেখানে রয়েছে অনেক অনেকগুলো এডিনিন (A) ক্ষারক যাকে পলি A সংকেত (poly - A signal) বলা হয়। এ সংকেতের পর পরই জিনের রয়েছে অনুলিপন সমাপ্তকরণ

অঞ্চল (transcription termination site)। এখানে এলেই জিনের তথ্য প্রদান বন্ধ হয়ে যায় (চিত্র ২.২ ও ২.৩)।

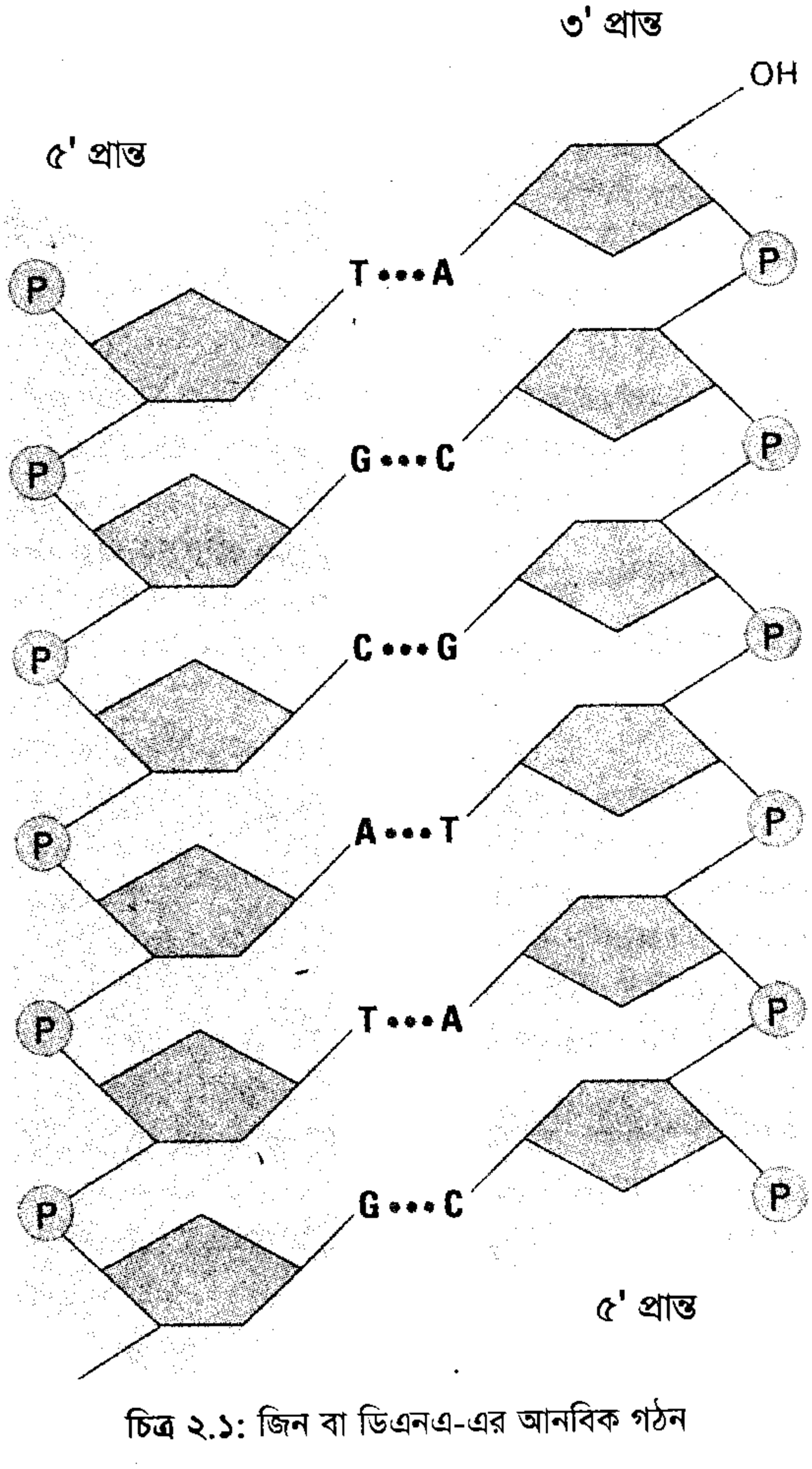

চিত্র ২.১: জিন বা ডিএনএ-এর আনবিক গঠন

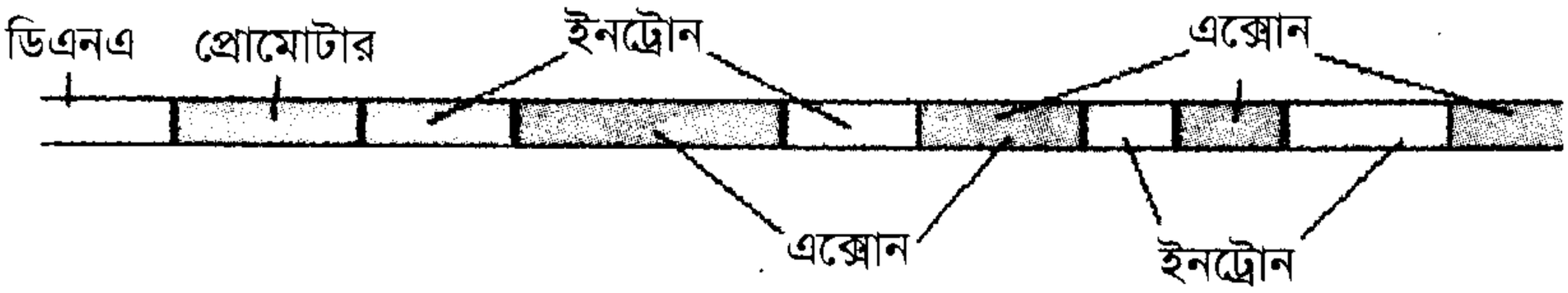

চিত্র ২.২: একটি জিনের সাধারণ গঠন

জিনের মধ্যে যেসব তথ্যাবলি থাকে তার বহিঃপ্রকাশ সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো জীবের কোষের মধ্যে যত DNA থাকে তাদের দিয়ে গঠিত সব জিনের কেবল

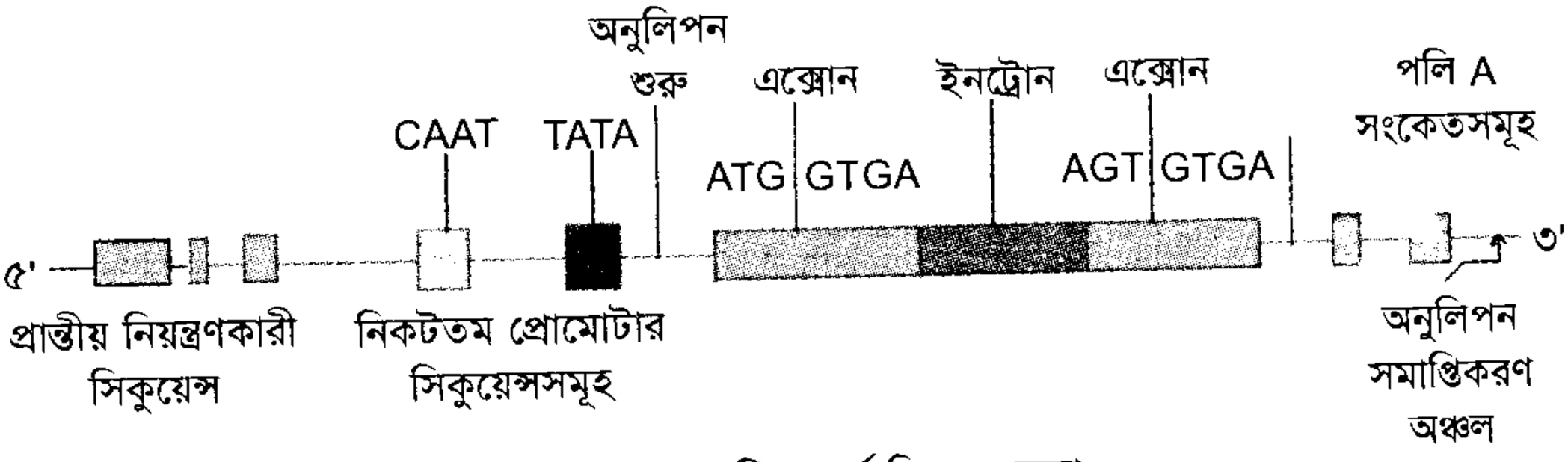

চিত্র ২.৩: একটি আদর্শ জিনের নমুনা

একটি অংশের মাত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোনো জীবের সকল কোষের সব জিনের বহিঃপ্রকাশ কখনো একই সাথে ঘটে না। কোন কোষের কোন জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তা স্ট্রাকচারাল জিনের বা সংকেত প্রদানকারী সিকুয়েন্সের বাম দিকে অবস্থিত থেকে DNA-এর যেসব সিকুয়েন্স তা নিয়ন্ত্রণ করছে এগুলোকে বলা হয় প্রমোটার। এখানেই রয়েছে জিনের অনুলিপন শুরু করার বিভিন্ন ফ্যাক্টর। এখানেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ জিন এর অনুলিপন যেখান থেকে শুরু হয় এর প্রায় ২৫ bp বামদিকে অবস্থিত TATA সিকুয়েন্সে (চিত্র ২.৩) এসে যুক্ত হয় আরএনএ পলিমারেজ এনজাইম। এ এনজাইমটি জিনের অনুলিপন শুরু করে। তবে অনুলিপন শুরু করার পূর্বে প্রোমোটারে অনেকগুলো অনুলিপন ফ্যাক্টর সংযুক্ত হতে হয়। কোনো জিন কত পরিমাণ প্রোটিন তৈরি করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে প্রোমোটার এবং এর সাথে সংযুক্ত হওয়া অনুলিপন ফ্যাক্টরগুলো। আজকাল জিনের দুর্বল প্রোমোটার বদলে দিয়ে জিনের সাথে জুড়ে দেয়া যায় শক্তিশালী কার্যকর প্রোমোটার। এরকম একটি প্রোমোটার হলো ফুলকপি মোজাইক ভাইরাসের 35s প্রোমোটার, যাকে বলা হয় CaMV35s প্রোমোটার। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদের শুধু নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম তেমন প্রমোটারও খুঁজে পেয়েছেন। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গে জিনের প্রকাশ ঘটানো এখন আর অসম্ভব নয়।

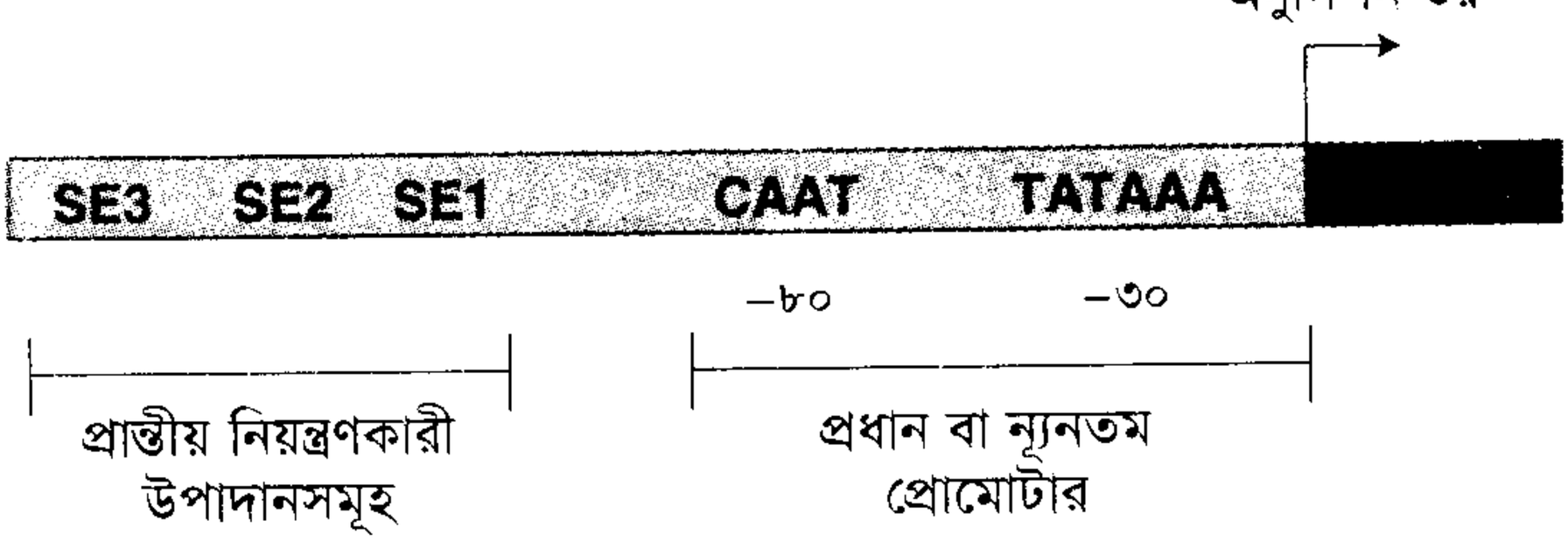

চিত্র ২.৪: প্রকৃত কোষীয় প্রোটিনের জন্য সংকেত প্রদানকারী একটি জিনের প্রোমোটারের সরল চিত্র

জিন প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে জিনই হলো মূল বিষয়। একেই কর্তন করে নিতে হয় কোনো জীব থেকে, আর একেই সংযোজন করতে হয় অন্য কোনো জীবে। জিনের কার্যকারিতা ধরে রাখার জন্য জিনকে কেটে নিতে হলে প্রোমোটারসহই কিন্তু সম্পূর্ণ স্ট্রাকচারাল জিনটিকে বা সংকেত প্রদানকারী সিকুয়েন্সকে আলাদা করে নিতে হয়; অথবা স্ট্রাকচারাল জিনের সাথে জুড়ে দিতে হয় অন্য কোনো প্রোমোটার।

২. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল উদ্ভাবনের কৌশল

জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে জিন দেয়া নেয়া করার জন্য প্রয়োজন আরো কিছু মৌলিক বিষয় জানা। জিনকে আলাদা করে নিতে হলে প্রয়োজন জিনটিকে ডিএনএ থেকে কেটে ছেঁটে পৃথক করে নেওয়া। এ কাজটি যাদের দিয়ে সম্পন্ন করা হয় এগুলো আসলে এনজাইম। নানারকম ব্যাকটেরিয়া থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। এসব এনজাইম জিনের নির্দিষ্ট অংশে কর্তন করতে সক্ষম। তাই বলা হয় রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (restriction endonuclease) এনজাইম। আর কর্তিত জিন যথাস্থানে সংযোজন করার জন্যও প্রয়োজন হয় এনজাইমের। এগুলোকে বলা হয় ডিএনএ লাইগেজ (DNA ligase) ।

কর্তিত জিন সঠিক স্থানে পৌছানোর জন্য বাহকের প্রয়োজন হয়। জীবিত কোষের মধ্যে জিনকে পৌছে দেয়ার জন্য আমাদের সাহায্য নিতে হয় নানারকম অণুজীব (microorganism) অথবা এগুলোর কোনো অংশ বিশেষের। জিনের বাহক হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে বিদ্যমান গোলাকার একটি ডিএনএ বস্তু যাকে প্লাজমিড (plasmid) বলা হয় (চিত্র ২.৫)। ব্যাকটেরিয়ার কোষস্থ অসংগঠিত ক্রোমোজোমের বাইরে বেশ সুসংগঠিত এক বা একাধিক প্লাজমিড দেখতে পাওয়া যায়। প্লাজমিডের মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে জিন স্থানান্তরের কাজ ঘটছে প্রকৃতিতে সেই কবে থেকেই। এ কাজে সর্বাধিক পারঙ্গম একটি ব্যাকটেরিয়া হলো *Agrobacterium tumefaciens*। উদ্ভিদে জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় জিন ঢুকিয়ে দিতে পারে এ ব্যাকটেরিয়াটি সহজেই। একে তাই 'প্রকৃতির নিজস্ব জিন প্রকৌশলী' বলা হয়। এ ব্যাকটেরিয়াটি গাছের মধ্যে ঢুকে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এর ফলে গাছের কাণ্ডে একটি গল (gall) তৈরি হয় যাকে ক্রাউন (crown gall) বলা হয়। সাধারণত ঠিক মাটির উপর গাছের কাণ্ডে এরকম গল (gall) তৈরি হয়। আসলে এ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান প্লাজমিড সহজেই কোষের ক্রোমোজোমে স্থানান্তর করে দেয় তার নিজস্ব ডিএনএ- এর একটি অংশ। প্লাজমিড এর ডিএনএ-এর যে অংশটি উদ্ভিদ কোষে দিয়ে দিতে পারে অবলীলায় সে অংশটিকে বলা হয় t-DNA (transfer DNA)। এ t- DNA তে রয়েছে উদ্ভিদ কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দায়ী হরমোন জীবসংশ্লেষণক্ষম প্রোটিন তৈরির জিন, ওপাইন (opine) সংশ্লেষণ এবং টিউমার আকৃতি নির্ধারণী জিনসমূহ। প্লাজমিডের এ ডিএনএ অংশটির প্রভাবেই তৈরি হয় উদ্ভিদে টিউমার এবং উদ্ভিদের পরিপাকে ঘটে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন (চিত্র ২.৬ ও ২.৭)। উদ্ভিদ কোষের ক্রোমোজোমের সাথে t-DNA টাকে সংযুক্ত করে দেয়ার কাজ সমন্বয় করে Ti প্লাজমিডে (টিউমার প্রভাবকারী প্লাজমিডকে Ti প্লাজমিড বলা হয়)

অবস্থিত ভিরুলেন্স (virulence) জিন যেগুলোকে সংক্ষেপে vir জিন বলা হয়। t-DNA এর সাথে প্রাকৃতিকভাবেই সংযুক্ত রয়েছে কতগুলো জিন যারা t-DNA উদ্ভিদ কোষস্থ ক্রোমোজোমে অন্বিষ্ট হবার পর কোষে অক্সিন এবং সাইটোকাইনিন নামক হরমোন জৈব সংশ্লেষণ শুরু করে এবং ফলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষ বিভাজন শুরু হয় এবং গাছে ক্রাউন গল (crown gall) বা টিউমার দেখা দেয়।

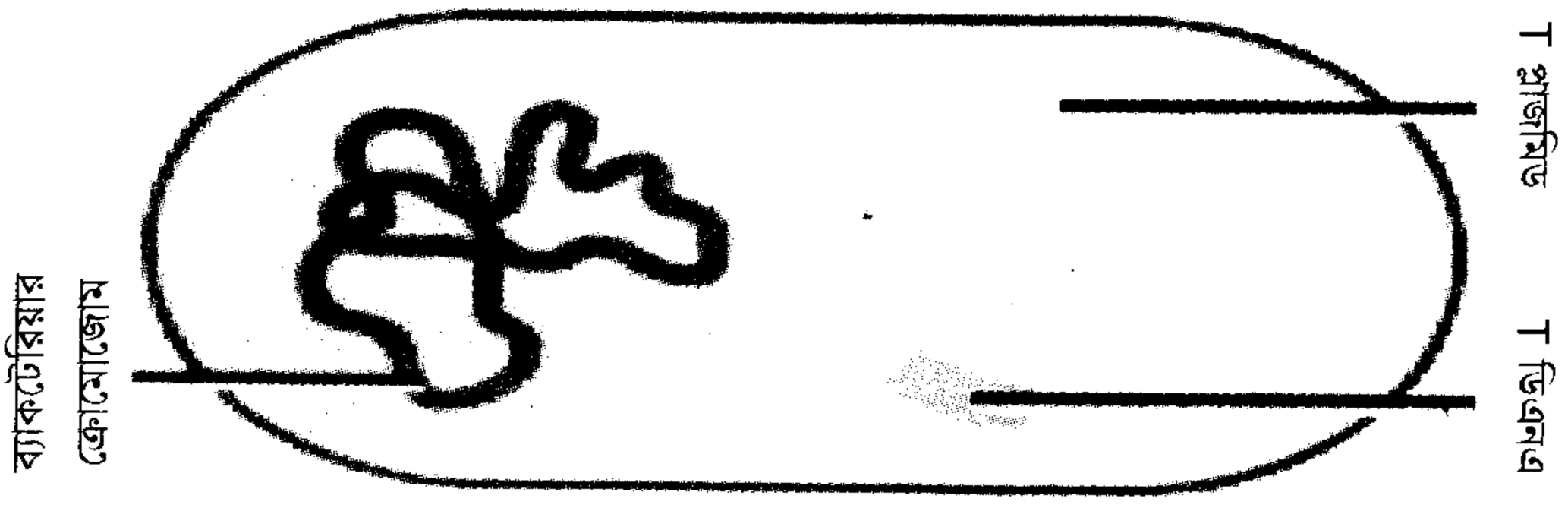

চিত্র ২.৫: ব্যাকটেরিয়া কোষে প্লাজমিড নামক স্বাধীন সত্তার কৌলিক উপাদান

চিত্র ২.৬: ব্যাকটেরিয়ার একটি প্লাজমিড

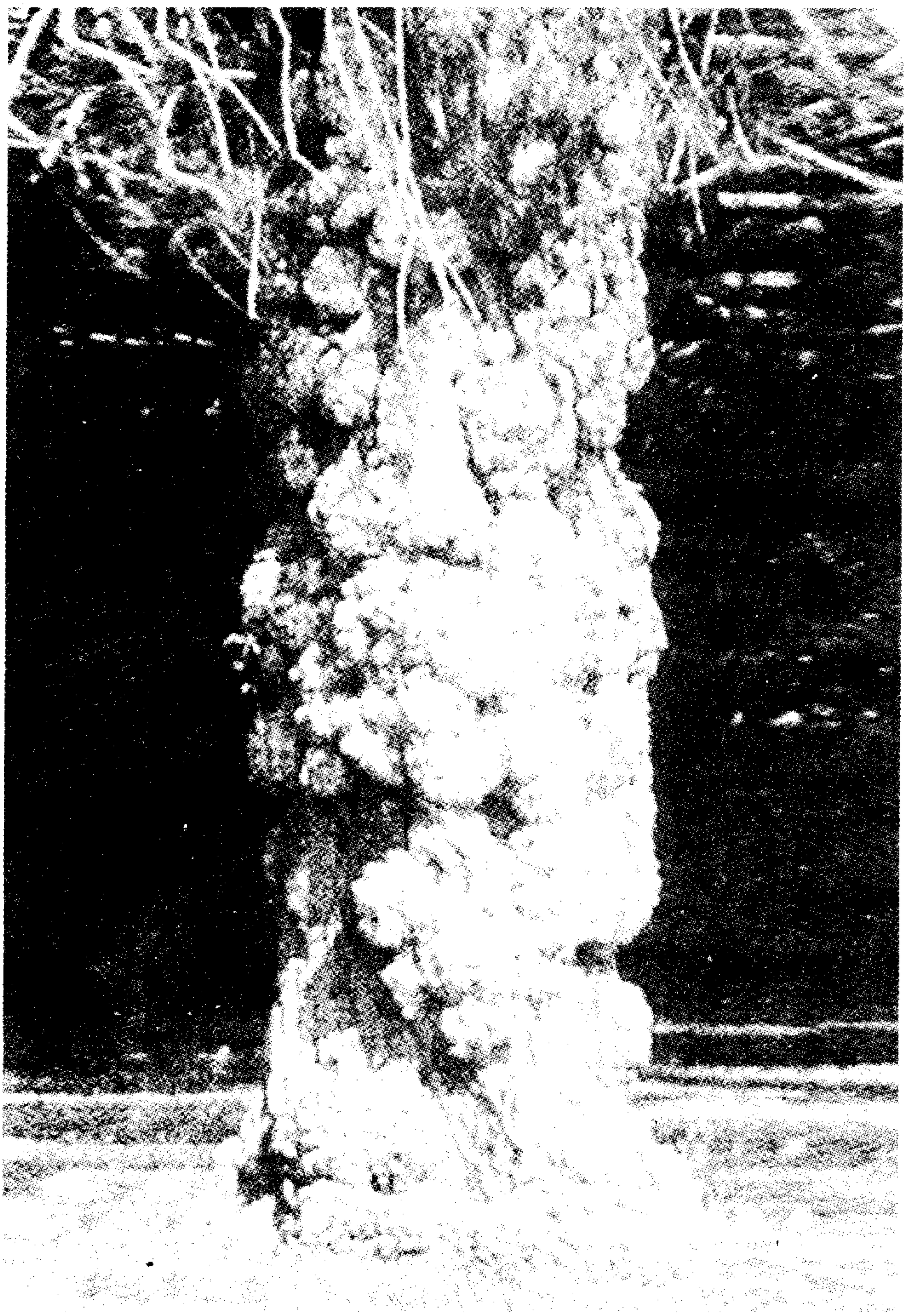

চিত্র ২.৭: *Agrobacterium* সৃষ্ট গল (gall) দিয়ে আক্রান্ত একটি গাছ

জিএম উদ্ভিদ তৈরির জন্য *Agrobacterium tumefaciens* এর যে প্লাজমিড বাহক হিসেবে ব্যাবহার করা হয় এর T-DNA থেকে টিউমার উৎপাদনকারী জিনগুলোকে অপসারণ করা হয় এবং তৎস্থলে কাঙ্খিত DNA খণ্ড জুড়ে দেয়া হয়। এরকম প্লাজমিডকে ব্যবহার করা হয় উদ্ভিদ কোষে জিন স্থানান্তরের জন্য। এ রকম প্লাজমিড শুধু কাঙ্খিত জিনকে উদ্ভিদে পৌঁছে দিতে পারে কিন্তু কোনো টিউমার তৈরি করতে এরা অক্ষম।

একটি উপযুক্ত জিন বাহকের জন্য কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত অপরিহার্য। এর নিজে নিজে সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকতে হবে। রেসট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দিয়ে এর নির্দিষ্ট স্থানে যেন কর্তন করা যায় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। মার্কার জিন দিয়ে বাহকটিকে সহজে শনাক্ত করা যাবে বলে প্লাজমিডে সংযোজন করা নির্দিষ্ট মার্কার জিন। বাহককে হতে হবে স্থায়ী, রোগ সৃষ্টিতে অক্ষম আর কোনোরকম পীড়ন ঘটাতে অক্ষম। বাহিত জিনকে দক্ষতার সাথে উদ্ভিদ কোষে পৌঁছাতে এবং জিনটিকে উদ্ভিদ ক্রোমোজোমে স্থানান্তর করার ক্ষমতাও এর থাকতে হবে। এ সব ক'টি গুণই রয়েছে *Agrobacterium tumefaciens* এর প্লাজমিডের। সেজন্য এটি হলো জিএম ফসল উৎপাদনের একটি সফল জিনের বাহক।

A. tumefaciens ছাড়াও কোনো কাঙ্খিত জিন সরাসরি কোষস্থ জেনোমে প্রবেশ করে দেয়ার জন্য রয়েছে বেশ ক'টি কৌশল। এসব কৌশলের মধ্যে জিন বন্দুক (gene gun) ব্যবহার, পলিইথালিন গ্লাইকল (polyethylene glycol) ব্যবহার, ইলেক্ট্রোপোরেশন (electroporation), মাইক্রোইঞ্জেকশক (microinjection), লিপোফেকশন (lipofection), সিলিকন কার্বাইড ফাইবার (silicon carbide fibre) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব সরাসরি জিন স্থানান্তর কৌশলের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো জিন বন্দুকের ব্যবহার। একে অবশ্য পার্টিক্যাল বোম্বার্ডমেন্ট (particle bombardment) বা বায়োলিস্টিক (biolistics) রূপান্তরণও বলা হয়। এ কৌশলে ০.২ - ০.৩ গ্রাম স্বর্ণ বা টাংস্টেন (tungsten) বলের বাইরে DNA এর প্রলেপ দিয়ে সজোরে বলটিকে পৌঁছে দেয়া হয় উদ্ভিদের টিস্যুর ভেতর। কোষের ভেতরে DNA টি বল থেকে অবমুক্ত হয়ে জেনোমের সাথে তা সংযোজিত হয়ে যায়। একবীজপত্রী বা দ্বিবীজপত্রী যে কোনো উদ্ভিদ প্রজাতির যে কোনো টিস্যুতে কাঙ্খিত জিন এ পদ্ধতিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়।

উদ্ভিদ প্রোটোপ্লাস্টের DNA কে কোনো নির্দিষ্ট বাফারে রেখে পলিইথিলিন গ্লাইকল নামক রাসায়নিক পদার্থ এতে প্রয়োগ করেও সরাসরি জিন বা DNA কে উদ্ভিদ কোষে পৌঁছে দেয়া যায়। এজন্য সাধারণত ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। পলিইথিলিন গ্লাইকল আর ক্যাটায়ন (cation) মিলে প্রোটোপ্লাস্টের প্লাজমামেমব্রেনকে অস্থিতিশীল করে তুলে এবং এর নানা স্থানে ভাঙ্গন তৈরি হয়। প্লাজমামেমব্রেনের সেসব ফাঁক ফোকড় গলিয়ে অতঃপর ভিতরে স্থান করে নেয় জিন বা DNA।

ইলেক্ট্রোপোরেশন পদ্ধতিতেও সূক্ষ্ম সুনিয়ন্ত্রিভাবে অতি স্বল্পকালীন উচ্চমাত্রার বৈদ্যুতিক প্রবাহ (short high intensity electric pulse) ঘটিয়ে উদ্ভিদ কোষ বা

প্রোটোপ্লাস্টে ডিএনএ প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়। ডিএনএ বা জিন বহনকারী ভেক্টর (vector) উদ্ভিদ কোষ বা প্রোটোপ্লাস্টের সাথে নির্দিষ্ট বাফার দ্রবণে রেখে উচ্চ মাত্রায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ ঘটালে প্লাজমামেমব্রেনে ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র তৈরি হয়। এসব ছিদ্রপথে কোষাভ্যন্তরে ঢুকে যায় নির্দিষ্ট জিন বা DNA। মুখ্য দানাশস্য ধান, গম এবং ভূট্টাতে এভাবেই কৌলিক রূপান্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

মাইক্রোইঞ্জেকশন একটি সরাসরি যান্ত্রিক জিন স্থানান্তর কৌশল। এখানে অতি সূক্ষ্ম ক্যাপিলারি সূচ (capillary needle) ব্যবহার করে সুনির্দিষ্টভাবে DNA কে ভ্রূণ, ডিম্বক, মেরিস্টেম, প্রোটোপ্লাস্ট বা কোষে পৌঁছে দেয়া হয়। যে কোনো প্রজাতির উদ্ভিদ কোষেই এ কৌশল প্রয়োগ করা যায়। লিপোফেকশন পদ্ধতিতে DNA বা RNA আবৃত লিপোজোমকে প্রোটোপ্লাস্টে দু'ভাবে স্থানান্তর করা যায়। লিপোজোমকে নগ্ন প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সরাসরি সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে অথবা লিপোজোমের এন্ডোসাইটোসিস (endocytosis) এর মাধ্যমে।

বর্তমানে DNA বা জিন স্থানান্তরের জন্য বিশেষায়িত যন্ত্র যেমন–সিলিকন কার্বাইড তন্তু (silicon carbide fibre) ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট বাফার দ্রবণে DNA এবং সিলিকন কার্বাইড তন্তু মিশ্রিত করে ঘূর্ণাবর্ত (vortexed) সৃষ্টি করলে ০.৩ - ০.৬ mm ব্যাসের তন্তুগুলো কোষ প্রাচীর এবং প্লাজমামেমব্রেন ভেদ করে DNA কে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পথ সৃষ্টি করে দেয়।

৩. উদ্ভিদ রূপান্তরণের ধাপ

এবার আলোচনা করা যায় কিভাবে উদ্ভিদে রূপান্তরণ (plant transformation) ঘটানো যায় এবং জিএম ফসল সৃষ্টি করা হয় সে বিষয়টি। জিন প্রকৌশল কৌশল হিসেবে আসলে বেশ জটিল। বাস্তবে এ কাজটি করতে গেলে বহু রকম প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটাতে হয়। এর জন্য জানার প্রয়োজন হয় জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণের উপায় এবং জিন ও তার উৎপাদিত বস্তুর (product) নিরাপত্তাসহ অনেক কিছু। তবে সহজভাবে বিষয়টি বোঝার জন্য জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়াটিকে পাঁচটি ধাপে ভাগ করা যায়।

ধাপ ১ : নিউক্লিক এসিড (DNA/RNA) পৃথককরণ

যে জীব থেকে জিন আলাদা করে নিয়ে উদ্ভিদ কোষে সংযোজন করতে হবে তা থেকে DNA বা RNA কে বের করে আনাই হলো প্রথম কাজ। জীবের কোষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে DNA বা RNA। সেটি হতে পারে কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কোষ, উদ্ভিদ কোষ বা অন্য কোনো প্রাণী কোষ। একটি কোষের প্রাচীর ছাড়াও কোষের ভেতর রয়েছে বহু অঙ্গাণু (organelles), রয়েছে কত রকম ধাত্র পদার্থ (matriex)। উদ্ভিদ কোষে রয়েছে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজসহ আরও কত কি। এসব কিছু থেকে ক্রোমোজোমকে আলাদা করে নিয়ে তা থেকে পৃথক করে নিতে হয় DNA বা RNA কে পর্যায়ক্রমিকভাবে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে। এ জন্য প্রয়োজন হয় নানা রকম রাসায়নিক ও প্রাণ রাসায়নিক ধাপ অতিক্রম করা। শেষ পর্যায়ে এসে আলাদাভাবে পাওয়া সম্ভব হয় কাঙ্ক্ষিত নিউক্লিক এসিড।

ধাপ ২ : জিন ক্লোনিং

এটি নিজেই একটি বহু উপ-ধাপ বিশিষ্ট ধাপ। জীব থেকে আলাদা করে নেয়া DNA কে অনেক খণ্ডে বিভক্ত করা, এসব DNA খণ্ড থেকে কাঙ্খিত জিন বা DNA খণ্ডকে আলাদা করে নেওয়া, কাঙ্খিত জিন বা DNA খণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং জিনটিকে শনাক্ত করে নেওয়া ইত্যাদি বহু উপধাপ রয়েছে এ ধাপে। কোনো জীবের অনেকগুলো DNA খণ্ড থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে বের করে নেবার পূর্বে নির্দিষ্ট রেসট্রিকশন এনজাইম (restriction enzyme) দিয়ে DNA কে খণ্ড খণ্ড করে কর্তন করে নিতে হয়। এরপর শুরু হয় নির্দিষ্ট জিন শনাক্ত করে নেবার কাজ। নির্দিষ্ট জিনকে চিনে নেবার জন্য আজকাল অনেকগুলো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জিন তার কার্যাবলি শুরু করার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে যে বার্তাবাহক RNA (m-RNA) তৈরি করে তা থেকে জানা সম্ভব ঐ জিনটির গঠন কাঠামো অর্থাৎ নাইট্রোজেন ক্ষারকের সিকুয়েন্স (nitrogen base sequence)।

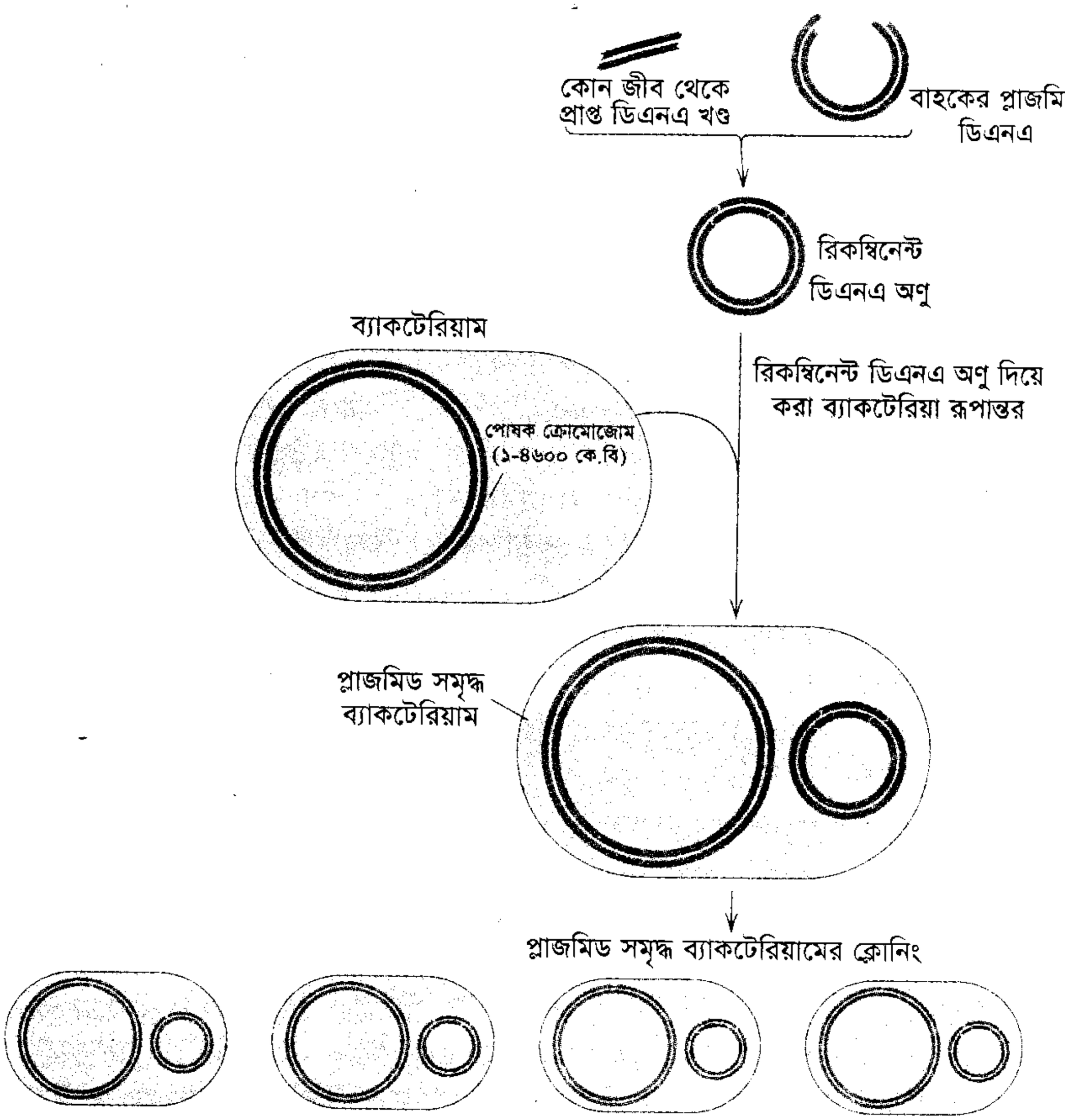

চিত্র ২.৮: জিন ক্লোনিং-এর পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ

আর তা থেকে শনাক্ত করা সম্ভব কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে। এছাড়াও ক্রোমোজোম ভ্রমণ পদ্ধতি (chromosome walking method) বা উদ্ভিদের কোষে অবস্থিত সঞ্চারণশীল বস্তু (mobile element) ব্যবহার করেও শনাক্ত করা সম্ভব নির্দিষ্ট জিনগুলোকে। এনজাইম দিয়ে কর্তন করে নেয়া কাঙ্ক্ষিত জিনটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো এবারকার কাজ। আলাদা করে নেয়া কাঙ্ক্ষিত জিনটির হুবহু কপি করা জিন ক্লোনিং এর মূল কাজ।

এ কাজে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়া ও এর প্লাজমিডকে। এর জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়া হলো *Escherichia coli* নামক ব্যাকটেরিয়া। *E. coli*-এর প্লাজমিড আলাদা করে নিয়ে একটি রেসট্রিকশন এনজাইম দিয়ে প্লাজমিডের একটি নির্দিষ্ট অংশ কর্তন করে ফেলে দিয়ে সে স্থলে লাইগেজ এনজাইম দিয়ে জুড়ে দেয়া হয় কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড বা জিনটিকে। এভাবে তৈরি হয় পুনঃ সংযোজিত DNA (recominant DNA)। এবার DNA খণ্ড বা জিনসহ প্লাজমিডকে *E. coli* এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় (চিত্র ২.৮)। আবাদ মাধ্যমে *E. coli*-এর বংশবৃদ্ধি করা হলে বৃদ্ধি পায় ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা, পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় এর মধ্যে বাহিত প্লাজমিডের সংখ্যা এবং অত্যাবশ্যকভাবে সংযোজিত DNA খণ্ড বা জিনের সংখ্যাও। হুবহু জিনের বহু কপি তৈরি করার এ পদ্ধতিকে বলা হয় জিন ক্লোনিং (gene cloning)। এবার DNA খণ্ডবাহী প্লাজমিডকে অন্যান্য প্লাজমিড থেকে আলাদা করে নিতে হয়।

ধাপ ৩ : জিন ডিজাইন এবং প্যাকেজকরণ

কাঙ্ক্ষিত জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পর এবার সে জিনের সাথে জুড়ে দিতে হয় কোষস্থ ক্রোমোজোমে জিনটি সংযোজিত হবার পর যেন এর প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় সেজন্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA খণ্ড। এসব DNA খণ্ডসমূহ জিনের কাজ শুরু করতে এবং এর কাজ বন্ধ করতে সাহায্য করে। এগুলোকে বলা হয় প্রোমোটার (promoter)। জিন ডিজাইনকরণ বা প্যাকেজকরণ (designing or packaging) বলতে জিনের সাথে বিদ্যমান প্রোমোটারকে পাল্টিয়ে নতুন অধিক কার্যকর নতুন প্রোমোটার সংযোজন এবং জিনটিকে নির্বাচন বা শনাক্ত করতে সক্ষম এক বা একাধিক মার্কার জিনও (selectable marker gene) এর সাথে সংযোজন করে দেওয়া বোঝায়।

প্রোমোটার জিনের ভিন্ন রকম প্রকাশ ঘটাতে পারে। কিছু কিছু প্রোমোটার রয়েছে যারা সংযুক্ত জিনের প্রকাশ ঘটায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা বিকাশের সব পর্যায়ে। অন্য কোনো কোনো প্রোমোটার আবার জিনের প্রকাশ ঘটায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে কেবল। কোনো কোনো প্রোমোটার আবার জিনের প্রকাশ ঘটায় নির্দিষ্ট টিস্যুতে শুধু, অন্যত্র নয়। আবার কোনো কোনো প্রোমোটারের ক্রিয়া নির্ভর করে বহিস্থ পরিবেশীয় কোনো নির্দিষ্ট সংকেতের উপর। কতটা জিনের প্রোডাক্ট উৎপন্ন হবে তাও নির্ভর করে প্রোমোটারের উপরই। কোনো কোনো প্রোমোটার খুব দুর্বল, আবার কোনো কোন প্রোমোটার বেশ শক্তিশালী। জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি বলে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড বা জিনের সাথে নতুন প্রোমোটার জুড়ে দেওয়া প্রায়শই অতি আবশ্যক বলে

বিবেচিত হয়। উদ্ভিদে জিনের সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রায়শই কাঙ্ক্ষিত জিন বা DNA খণ্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া প্রোমোটার হলে CaMV35s প্রমোটার।

নির্বাচনক্ষম মার্কার জিনও জুড়ে দিতে হয় কাঙ্খিত জিনটির সাথে যেন জিনটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ কোষে বা টিস্যুতে সংযোজনের পর একে সহজেই শনাক্ত করা যায়। মার্কার জিনের উপস্থিতি জিনটিকে খুঁজে বের করার কাজটিকে বেশ সহজ করে দেয়। এতদিন অবশ্য এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনকে মার্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ইদানিংকালে নির্দিষ্ট বর্ণ দিতে সক্ষম পদ্ধতিসহ অনেক বিকল্প পদ্ধতিও ব্যবহার করা হচ্ছে জিনকে শনাক্ত করার জন্য।

প্রোমোটার এবং মার্কার জিন কাঙ্খিত জিনের সাথে জুড়ে দেয়ার পর একে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অবস্থিত প্লাজমিডে সংযুক্ত করে দিলে আবার শুরু হয় এর হুবহু হাজারো কপি উৎপাদন। অতঃপর এরকম জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয় উদ্ভিদের কোষে।

ধাপ ৪ : উদ্ভিদ রূপান্তরকরণ

প্যাকেজ করা জিনটিকে উদ্ভিদের কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যে রূপান্তর ঘটানো হয় একে উদ্ভিদ রূপান্তরকরণ বা উদ্ভিদে জিন অন্তর্ভুক্তকরণ (plant transformation) বলা হয়। দু'ভাবে জিনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যেতে পারে। একটি হলো *Agrobacterium* কে বাহক হিসেবে অবলম্বন করে আর অন্যটি হলো জিন বন্দুক (gene gun) বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ জিন সংযোজন পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রথমটি হলো পরোক্ষভাবে জিন সংযোজন আর শেষোক্তটি হলো সরাসরি জিন সংযোজন। জিন সংযোজনের পর কোষটি যেন বেঁচে থাকে এবং তা থেকে যেন উদ্ভিদ জন্মায় এবং পুনরুৎপাদিত (regenerated) উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে যেন সে জিনটি বাহিত হয় এবং প্রয়োজনের সময় যেন এর প্রকাশ ঘটে এ বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি দেওয়া খুবই জরুরি।

A. tumefaciens সাধারণত উদ্ভিদের ক্ষতস্থান দিয়ে উদ্ভিদের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। নির্দিষ্ট জিন সম্পন্ন প্লাজমিডধারী ব্যাকটেরিয়াকে সহ-আবাদ (co-cultivation) করতে হয় কর্তিত উদ্ভিদ টিস্যুর সঙ্গে। সাধারণত খণ্ডিত পাতা, প্রোটোপ্লাস্ট, ক্যালাস এবং অপরিপক্ব ভ্রূণের সাথে কাঙ্ক্ষিত জিনবাহী ব্যাকটেরিয়াকে একত্রে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করা হয়। দুই থেকে তিন দিন এরকম সহ আবাদ (co cultivation) করার পর এদেরকে বিশেষ নির্বাচনক্ষম মিডিয়াতে (selective media) স্থানান্তর করা হয়। এ মিডিয়াতে থাকে নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক যা কেবল নির্দিষ্ট জিনবাহী কোষ বা টিস্যুকে বাঁচিয়ে রেখে অবশিষ্ট কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এভাবে আলাদা করে নেওয়া হয় জিনবাহী উদ্ভিদ কোষ বা টিস্যুকে। এরপর এগুলোর উপ-আবাদ করতে হয় অন্য আর আরেক রকম মিডিয়াতে যেখানে কোষ বা টিস্যুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত অনুপাতে হরমোন রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় পুনরুৎপাদনক্ষম মিডিয়া (regeneration media)। অতঃপর এ থেকে অঙ্গোৎপাদন (organogenesis) বা অঙ্গজ ভ্রূণ বিকাশের (somatic embryo genesis) মাধ্যমে পাওয়া যায় জিএম বা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টে জিন সংযোজন করতে হলে প্রথমে উদ্ভিদ কোষের ভেতরে জিন স্থানান্তরের জন্য প্রধান প্রতিবন্ধক যে কোষপ্রাচীর তাকে অপসারণ করে নিতে হয়। নির্দিষ্ট এনজাইম সহযোগে কোষপ্রাচীরকে ভেঙে পাওয়া যায় কোষ ঝিল্লিসমৃদ্ধ কোষ যাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাস্ট (protoplast)। এবার উপযুক্ত মাধ্যমে কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টসমূহকে আবাদ করা হয়। একটি জিন-বন্দুক যার মধ্যে নির্দিষ্ট জিন বা DNA কে প্রলেপ দিয়ে দেয়া হয় ক্ষুদ্রাকার স্বর্ণের বা টাংস্টেন বলের চারদিকে এবং এগুলোর রাখা হয় সোজাসুজি আবাদ করা কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টের উপর। জিন বন্দুকের উপরের দিকে রয়েছে আবদ্ধ গ্যাস বা বন্দুকের পাউডার যা ক্ষুদ্রাকার বলগুলোকে অতি বেগে প্রবেশ করিয়ে দেয় কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টের ভেতরে। এসব বল থেকে DNA খণ্ড বা জিন অতঃপর সংযুক্ত হয়ে যায় কোষস্থ ক্রোমোজোমের ভেতরে। এসব জিন বা DNA খণ্ডের সাথেও জুড়ে দেয়া থাকে প্রোমোটার আর মার্কার জিন। নির্দিষ্ট নির্বাচনক্ষম আবাদ মাধ্যমে প্রোটোপ্লাস্টকে উপ-আবাদ (sub-culturing) করে বাছাই করে নেয়া হয় নির্দিষ্ট জিন সম্পন্ন কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টকে। এ কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টগুলোকে উপযুক্ত মাধ্যমে আবাদ করে পাওয়া সম্ভব কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ।

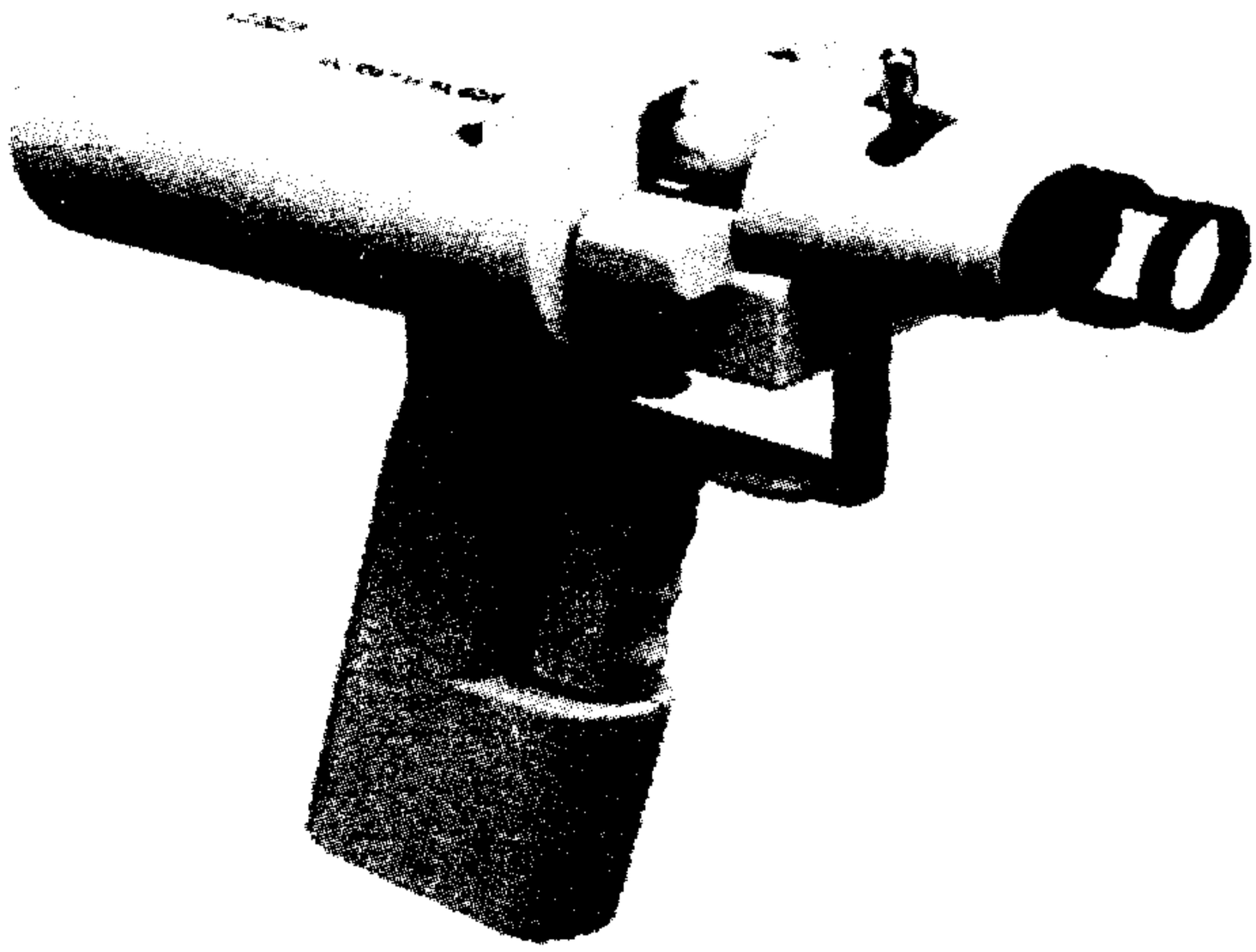

চিত্র ২.৯: জিন বন্দুক-যা ব্যবহার করে কোষ, ক্যালাস বা প্রোটোপ্লাস্টে জিন সংযোজন করা হয়

এ উদ্ভিদে জিনটি রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করারও ব্যবস্থা রয়েছে। অতঃপর জিনটি উদ্ভিদে রয়েছে এটি সংশয় মুক্ত হবার পর শুরু হয় পরবর্তী ধাপ।

ধাপ ৫ : ব্যাকক্রস প্রজনন

জিএম ফসল তৈরির শেষ ধাপ হলো ব্যাকক্রস প্রজনন (backcross breeding)। এটি উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির একটি কৌশল। সাধারণত জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট জিন উদ্ভিদে সংযোজন করার পর যে গাছ পাওয়া যায় সরাসরি তা ফসল হিসেবে ততটা সফল হয় না। সেজন্য সরাসরি এগুলো ফসল হিসেবে ব্যবহার না করে এগুলোর মধ্যে সংযোজিত জিন ফসলের উত্তম জাতগুলোতে স্থানান্তরের জন্য ক্রসিং এবং ব্যাকক্রসিং করা হয়। ব্যাকক্রসিংয়ের উদ্দেশ্য হলো উত্তম জাতের সব গুণাগুণ অক্ষত রেখে জিএম উদ্ভিদ থেকে শুধু কাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট জিনটিকে উত্তম জাতে নিয়ে নেওয়া। জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদের সাথে উত্তম জাতের ক্রস করা হলে সংকর উদ্ভিদে উভয় প্যারেন্ট থেকে পাওয়া যায় ৫০% করে জিন। এরপর শুরু হয় সংকর উদ্ভিদকে বার বার উত্তম জাতের সাথে ব্যাকক্রস করা। উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হয় শুধু নির্দিষ্ট জিনটি রয়েছে কিনা তা জানার জন্য। এভাবে একসময় তৈরি হয় হুবহু উত্তম জাতের মতো একটি জাত যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জিনটি সংযোজিত হয়েছে। অতঃপর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলটি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ প্রমাণিত হলে আর সেই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটলে তা আবাদের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল

১. আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবনের পটভূমি

আগাছা ফসলের একটি প্রধান শত্রু। শত চেষ্টা করেও আগাছাবিহীন ফসলের আবাদ করার কোনো সুযোগ প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে নেই। ফসলের সাথে আগাছার সম্পর্কটা নিবিড়। সুদূর অতীতে কোনো কোনো ফসল আর কোনো কোনো আগাছার পূর্বপুরুষ অর্থাৎ উৎস একই ছিল। ফলে একই সাথে মাঠে ফসল ও আগাছা জন্মানোর ও বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি অতি প্রাচীন। কিন্তু আগাছা যেহেতু ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে এবং ফসলের ফলন কমিয়ে দেয়, ফলে কৃষককে মাঠ থেকে আগাছাকে নির্মূল করতেই হয়। ফসল আর আগাছার প্রতিযোগিতা যে কত ধরনের বিষয় নিয়ে তা ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগিতা পানি নিয়ে, খাদ্য নিয়ে, সূর্যের আলো এবং স্থান নিয়ে। আগাছাতে আশ্রয় নেয়া অনেক কীটপতঙ্গ আর রোগজীবাণু ফসলের ক্ষতির কারণ হয়। সেচ ও নিকাশের নালায় পানির প্রবাহ ব্যাহত হয় আগাছার কারণে। এর ফলে ফসলের গুণ ও মান হ্রাস পায়। ফসলের বীজের সাথে মিশে যায় আগাছার বীজ।

২. আগাছা ও আগাছা দমন

আগাছার রয়েছে নানা রকম বুনো স্বভাব। অযত্ন অবহেলায় সহজে এগুলো টিকে থাকতে পারে। বীজ, মূল, কন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে এরা বংশ বিস্তার ঘটায়। বীজ মাটিতে ঝরিয়ে দিয়ে উপযুক্ত সময়ের জন্য এরা অপেক্ষা করতে পারে। এগুলোর বৃদ্ধি ঘটে বেশ দ্রুত। ফলে আগাছা ফসলের খুব শক্ত প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। ফসলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে তাই আগাছা নির্মূল করার কোনো বিকল্প নেই । সময় মতো আগাছা দমন উপযুক্ত ফলন পাওয়ার একটি পূর্বশর্ত। আগাছা দমনের অনেকগুলো উপায় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি দুটি হলো– যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং রাসায়নিক পদ্ধতি।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে শ্রমিকের অভাব নেই এবং শ্রমের মূল্যও তুলনামূলকভাবে কম সেসব দেশে যান্ত্রিক উপায়ে আগাছা দমন প্রধানতম উপায়। সনাতন হাত নিড়ানি বা আধুনিক হাতে ঠেলার নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করে আমাদের দেশে কৃষক-শ্রমিক আগাছা দমন করে থাকে। এসব দেশগুলোর কোনো কোনোটিতে রাসায়নিক আগাছানাশক অল্প স্বল্প ব্যবহার করা শুরু হয়েছে আবার কোনো কোনো দেশে আগাছানাশক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে কৃষিতে শ্রমিক অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় শ্রমিক নির্ভর যান্ত্রিক আগাছা দমন ওসব দেশে সম্ভব নয়, তবে যন্ত্র-নির্ভর যান্ত্রিক আগাছা দমন

করার সুযোগ তাদের রয়েছে। কিন্তু যন্ত্র-নির্ভর আগাছা দমন ততটা কার্যকর নয় বিধায় সেগুলো নির্ভর করতে হয় আগাছানাশকের উপর।

৩. আগাছানাশক

উন্নত বিশ্বে অনেক দিন ধরে রাসায়নিক আগাছানাশকের ব্যবহার শুরু হয়েছে । জমি তৈরি করার সময় আগাছানাশক দ্রব্য ছিটিয়ে দিয়ে আগাছা মেরে ফেলা হয় ফসলের বীজ বা কন্দ বপন বা রোপণ করার পূর্বেই। তাতেই শেষ রক্ষা হয় না। ফসল বড় হতে হতে গজিয়ে যায় কিছু আগাছা। ফলে ফসলের সাথে শুরু হয় এগুলোর প্রতিযোগিতা। ফসলের মাঠে যান্ত্রিক উপায়ে এগুলো দমন করা তখন কষ্টকর হয়ে পড়ে। যান্ত্রিক উপায়ে ফসলের গাছের সাথে লেপ্টে থাকা আগাছা কিছুতেই নির্মূল করা যায় না। তাই আগাছানাশকের ব্যবহার শেষরক্ষা করতে পারে না ফসলকে। এ সমস্যাকে সামনে রেখে শুরু হয় আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবনের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ চায় এমন ফসল নির্মাণ করতে যে ফসলের মাঠে আগাছানাশক প্রয়োগ করলেও ফসল অক্ষত থেকে যাবে অথচ আগাছানাশকের প্রতিক্রিয়ায় আগাছা মরে যাবে। ফলে ফসলের বীজ বপন করার পূর্বেও যেমন আগাছা দমন সম্ভব হবে, তেমনি ফসলের মাঠে আগাছানাশক ছিটিয়ে দিয়েও সম্ভব হবে আগাছা দমন ।

৩.১ আগাছানাশকের বিষক্রিয়া

আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল তৈরি করার পূর্বে দুটি জিনিস জানতে হলো বিজ্ঞানীদের। একটি হলো আগাছানাশক কোন প্রক্রিয়ায় আগাছা বা গাছগাছালিকে নির্মূল করে তা। আর অন্যটি হলো আগাছানাশকের বিষক্রিয়া নষ্ট করার উপায় কি তা। আগাছানাশকের বিষক্রিয়ার ধরন বিবেচনা করে তবেই তাকে নিষ্ক্রিয় করতে হয়। সব আগাছানাশকের ক্রিয়া পদ্ধতি কিন্তু একরকম নয় যদিও সব আগাছানাশকের কাজই হচ্ছে ফসল ছাড়া অন্যান্য গাছগাছালির মৃত্যু ঘটানো। কোনো কোনো আগাছানাশক কোনো একটি নির্দিষ্ট এমাইনো এসিডের উপর কাজ করে তাকে নষ্ট করে দেয়। কোনো আগাছানাশক আবার উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়ার কোনো একটি এনজাইমকে নষ্ট করে দেয়। গ্লাইফোসেট (glyphosate) আগাছানাশক এরোমেটিক অ্যামাইনো এসিডের জৈব সংশ্লেষণ বাঁধাগ্রস্ত করে। সালফোনিল ইউরিয়া (Sulphonyl urea) আর ইমাডাজোলিনোনস্ (imadazolinones) প্রতিহত করে শাখান্বিত অ্যামাইনো এসিডকে। ফসফিনোথ্রাইসিন (phosphinothrycin) আগাছা-নাশক নষ্ট করে দেয় গ্লুটামিনকে। ব্রোমোক্সজাইলিন (bromoxylene) বাঁধাগ্রস্ত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে। ফটোসিস্টেম-২কে নষ্ট করে দেয় এট্রাজিন (atrazine) নামক আগাছানাশক।

৩.২ আগাছানাশক প্রতিরোধক্ষমতা

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে কিছু কিছু উদ্ভিদ চমৎকারভাবে সইতে পারে আগাছানাশকের বিষক্রিয়া। কোনো কোনো অণুজীব বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া

আগাছানাশকের বিপক্ষে চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এগুলোর প্রতিরোধিতার কারণ খুঁজে বের করার কাজে লেগে গেল বিজ্ঞানীরা। খুঁজতে খুঁজতে কারণ উদ্ঘাটিত হয়ে গেলো। আগাছানাশক প্রতিরোধী গাছপালা বা ব্যাকটেরিয়া এমন সব এনজাইম তৈরি করছে যা আগাছানাশককে নির্বিষ করে দিতে সক্ষম। ফলে এসব গাছপালা এবং ব্যাকটেরিয়ার কোনো ক্ষতিই করতে পারছে না আগাছানাশক। এসব জীবের এনজাইম উৎপাদনকারী জিনগুলোকে আলাদা করে নিয়ে ক্লোনিং করে জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে জিনগুলোকে ফসলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই শুরু হবে এতো দিনকার স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

আগাছানাশককে ঠেকানোর ভিন্নতর কৌশলও লক্ষ্য করা গেছে কোনো কোনো উদ্ভিদ বা ব্যাকটেরিয়াতে। এসব জাতের আগাছানাশক প্রতিরোধিতার কারণ এগুলো জিনে ঘটে যাওয়া আকস্মিক পরিবর্তন (mutation) তৈরি করেছে ভিন্নতর এক এনজাইম যাকে নষ্ট করতে পারছে না আগাছানাশক। এনজাইমের গঠনে সৃষ্ট পার্থক্যের কারণে এগুলো বেঁচে যাচ্ছে আগাছানাশকের হাত থেকে। এরকম জিন ফসলে সংযোজন করা গেলে পাওয়া সম্ভব আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল।

৪. আগাছানাশক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

জিন প্রকৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব জিন ফসলে ঢুকিয়ে দিয়ে আগাছানাশক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে এসব জিএমফসলের কোনো কোনেটির আবাদ শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীর অনেক দেশে। জিন ক্রিয়ার ধরনের উপর নির্ভর করে এসব প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের দুটি ধারা রয়েছে। একটি ধারা হলো-আগাছানাশক গাছের যে এনজাইমকে আক্রমণ করে গাছের মৃত্যু ঘটায় সে এনজাইমটি যেন এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যেন এটি আগাছানাশক অসংবেদী হয়ে উঠে আথবা আগাছানাশক যে এনজাইমের উপর ক্রিয়া করে এনজাইমকে নষ্ট করে দেয় সে এনজাইমটি এতোটা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যেন গাছের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ এনজাইম নষ্ট হওয়ার পরও থেকে যায়। আর দ্বিতীয় ধারাটি এই যে, আগাছানাশক গাছের উপর এর বিষক্রিয়া শুরু করার পূর্বেই আগাছানাশককে নির্বিষ করে দেয় গাছে সংযোজিত জিন থেকে উৎপাদিত এনজাইমটি। এ দুটি ধারাকেই কাজে লাগানো হয়েছে জিএমফসল উৎপাদনের জন্য (সারণি ৩.১)।

প্রথম ধারাটি অবলম্বন করে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএমফসল তৈরি করা হয়েছে আগাছানাশক-গ্লাইফোসেট, এট্রাজিন এবং সালফোনিলইউরিয়ার বিপক্ষে। গ্লাইফোসেট বিস্তৃত সংখ্যক আগাছার উপর ক্রিয়াশীল একটি আগাছানাশক। দ্বিবীজপত্রী এবং একবীজপত্রী উভয় প্রকার আগাছার উপর এটি ক্রিয়াশীল। প্রাণীদের উপর এর বিষাক্ততার প্রভাব নিম্নমাত্রার। এ আগাছানাশকটিকে সহজেই ভেঙে দিতে পারে নানা রকম অণুজীব। এই আগাছানাশকটি ৫-এনোল পাইরুভিল সিকিমিক এসিড-৩ ফসফেট সিনথেজ(5-enol-pyruvyl shikimic acid-3-phosphate synthase) বা E P S P S এনজাইমকে নষ্ট করে দেয়। এই এনজাইমটি এরোমাটিক

অ্যামাইনো এসিড জৈব সংশ্লেষণের সাথে জড়িত। *Salmonella typhimurium* ব্যাকটেরিয়াতে পাওয়া গেছে। E P S P সিনথেজ এনজাইম তৈরির সংকেত প্রদানকারী মিউট্যান্ট একটি জিন। ব্যাকটেরিয়া থেকে এ জিনটিকে কর্তন করে নিয়ে ফসলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে । এখন এ জিন থেকে যে মিউট্যান্ট এনজাইম তৈরি হচ্ছে তা গ্লাইফোসেট আগাছানাশকের প্রতি থেকে যাচ্ছে সম্পূর্ণ সংবেদনহীন আর নির্বিঘ্নে তৈরি করছে এরোমেটিক অ্যামাইনো এসিড। একইভাবে ফসলে প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করা হয়েছে সালফোনিল ইউরিয়া আগাছানাশকের বিপক্ষেও। এখানে ফসলে সংযোজন করা হয়েছে মিউটেন্ট এসিটো ল্যাকটেট সিনথেজ (acetolactate synthase) জিন। তামাক ফসলে আগাছানাশক প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করা হয়েছে *E P S P S* জিনের সাথে CaMV 35 s নামক একটি শক্তিশালী প্রেমোটার যুক্ত করে দিয়ে। এতে ফসলের প্রতিরোধিতা কার্যকরভাবে কাজ করে থাকে।

আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসল তৈরির দ্বিতীয় ধারাটি হলো ফসলে তেমন ব্যাকটেরিয়ার জিন সংযোজন করা যা আগাছানাশককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আগাছানাশককে নিষ্ক্রিয় করতে পারে তেমন জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে অন্য কিছু উদ্ভিদ প্রজাতিতেও।

সারণি ৩.১ : আগাছানাশকের ক্রিয়ার ধারা ও জেনেটিক্যালি মোডিফাইড তৈরির উপায়

কাজের ধরন	যে পথক্রমকে দমন করে	টার্গেট	প্রয়োগ	ব্যবহৃত কৌশল
অ্যামাইনো এসিড জীব সংশ্লেষণ প্রতিরোধক				
গ্লাইফোসেট	এরোমাটিক অ্যামাইনো এসিড জীব সংশ্লেষণ	E P S P S	বহু ফসল	ব্যাকটেরিয়ার *aro A* জিন ব্যবহার করে *E P S P S* জিনের অধিকতর বহি: প্রকাশ
সালফোনিল ইউরিয়া এবং ইমিডাজুলিনুনস্	শাখান্বিত শৃঙ্খলযুক্ত অ্যামাইনো এসিড	A L S	নির্বাচিত ফসল	মিউট্যান্ট *A L S* জিন
ফসফিনোথ্রাইসিন	গ্লুটামিন	G S	বহু ফসল	জিন বিবর্ধন, *bar* জিন, নির্বিষকরণ
সালোকসংশ্লেষণ প্রতিবন্ধক				
এট্রাজিন	ফটোসিস্টেম II	Qb	নির্বাচিত ফসল	মিউট্যান্ট *psb A* এবং *GST* জিন, নির্বিষকরণ
ব্রোমোক্সজাইলিন	সালোকসংশ্লেষণ		নির্বাচিত ফসল	*Bxn* জিন নির্বিষকরণ

E P S P S - 5- enol- pyruvyl shikimate -3- phosphate synthase
A L S - acetolactate synthase
G S - glutamine synthase
Qb - 32 KD protein

ভবিষ্যতে এসব জিন ফসলে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে প্রতিরোধিতা পাওয়া সম্ভব হবে। ফসফিনোথ্রাইসিন আগাছানাশকটি গ্লুটামিনসিনথেজকে সফলভাবে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। এই এনজাইমটিকে প্রতিহত করা হলে দ্রুত কোষে জমা হতে থাকে অ্যামোনিয়া এবং মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে গাছ। *Streptomyces hygroscopius* নামক ব্যাকটেরিয়াতে *bar* জিন নামক একটি জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ফসফিনোথ্রাইসিন এসিটাইল ট্রান্সফারেজ (phosphinothrycin acetyl transferase) নামক একটি এনজাইম তৈরি করে। এ এনজাইমটি আগাছানাশকটিকে রূপান্তরিত করে দিয়ে এর নাশক ক্রিয়া নষ্ট করে দেয় বলে ফসল থেকে যায় অক্ষত। ব্যাকটেরিয়া থেকে এ জিনটি সংযোজন করে জিএম তামাক, টমেটো, গোলআলু এবং তেল বীজ রেপ তৈরি করা হয়েছে।

ভুট্টাতে পাওয়া গেছে গ্লুটাথিওন -S- ট্রান্সফারেজ (*GST*) জিন যা আগাছানাশক এট্রাজিনকে নির্বিষ করে দেয়। অন্য একটি ব্যাকটেরিয়া *Klebsiella pneumonial* তে পাওয়া গেছে *Bxn* নামক জিন যা ফসলে তৈরি করে নাইট্রিলেজ (nitrilase) নামক এনজাইম। এটি সহজেই ভেঙে দেয় আগাছানাশক ব্রোমোক্সজাইলিনকে। এ ধরনের জিন সংযোজন করে তৈরি করা হয়েছে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড তুলা, ভুট্টা , টমেটো আর সুগার বিট।

৪. আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের অসুবিধা

আগাছানাশক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে বটে কিন্তু পাশাপাশি এর ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন করে হুমকিও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রথমত, এ ধরনের জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ অধিক পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। বাস্তবে ঘটছেও তাই। প্রশ্ন উঠেছে আগাছানাশকের জন্যে যেসব জিন ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানুষের জন্য বিষাক্ত কিনা এবং এসব খাদ্য মানুষের এলার্জি সমস্যা সৃষ্টি করে কি-না। আসলে জীবনিরাপত্তাজনিত গাইড লাইন অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে নিরাপদ মনে হলেই কেবল এসব ফসল বাণিজ্যিক আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, আগাছানাশক প্রতিরোধিতার জন্য ফসলে যেসব জিন সংযোজন করা হয় ফসলের উপর এগুলোর প্রতিক্রিয়া কি এমন প্রশ্ন চলে আসে মাঝে মাঝে। আসলে অতিরিক্ত একটি দুটি জিন ফসলের ফলনকে ব্যাহত করে না। অতিরিক্ত একটি এনজাইম তৈরি করা ছাড়া এগুলোর আর কোনো বাড়তি কাজ নেই।

তৃতীয়ত, ফসলের প্রতিটি গাছেরই আগাছানাশক প্রতিরোধিতা থাকায় এসব গাছ নিজেই এক সময় শক্ত আগাছা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেহেতু নির্দিষ্ট একটি আগাছানাশক এসব গাছের কোনো ক্ষতি করতে পারে না ফলে এসব গাছ মাঠে কিংবা বুনো পরিবেশে আগাছা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। তবে আবাদী ফসলের বুনো পরিবেশে টিকে থাকার অন্যান্য গুণাগুণ না থাকায় শুধু আগাছানাশক প্রতিরোধিতার কারণে বুনো পরিবেশে আগাছা হিসেবে টিকে থাকা অনেকটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তবে ফসলের মাঠে টিকে থাকা দু'চারটি গাছ আগাছা হিসেবে টিকে থাকতে পারে যখন মাঠে অন্য ফসল ফলানো হয় তখন।

চতুর্থত, ফসলের মধ্যে সংযোজিত আগাছানাশক জিন পর-পরাগায়নের মাধ্যমে যদি আগাছার মধ্যে চলে যেতে পারে তাহলে আগাছা আগাছানাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। স্ব-পরাগী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল থেকে পরাগরেণু মুক্তভাবে উড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। তাছাড়া আগাছার সাথে ফসলের পরাগায়ন এমনিতেই সহজে হবার কথা নয়। এগুলোর প্রজাতি ভিন্ন, কোনো কেনোটার গণও ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে এগুলোর মধ্যে ক্রসিং সম্পন্ন হবার কথা নয়। তবে কোনো আগাছার সাথে জিএমফসলের ক্রসিং ঘটে গেলে কিংবা ফসলের কোনো বুনো আত্মীয়ের সাথে ক্রসিং সম্পন্ন হলে প্রতিরোধী জিনটি আগাছা বা বুনো আত্মীয়ের মধ্যে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আগাছা বা ফসলের আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে আরও শক্ত আগাছা।

পৃথিবীর যে কয়টি দেশে এখন জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ হচ্ছে তার একটি বড় অংশ জুড়ে আবাদ করা হচ্ছে আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল। ২০০৩ সনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, মোট ৬৭.৭ মিলিয়ন হেক্টর জিএম ফসলের মধ্যে ৪৯.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আবাদ হচ্ছে এসব ফসল। প্রধান আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের মধ্যে রয়েছে সয়াবিন, তুলা, ভুট্টা, ধান এবং আর্জেন্টাইন ক্যানোলা। যে সয়াবিন তেল নিয়মিত খাওয়া হয় তারও একটা বড় অংশ আসে আমাদের অজান্তেই এসব আগাছানাশক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড সয়াবিন থেকেই।

চতুর্থ অধ্যায়

কীট প্রতিরোধী ফসল

১. কীট প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবনের পটভূমি

কীটপতঙ্গ যেমন ফসলের বন্ধু তেমনি আবার শত্রুও। কোনো কোনো কীটপতঙ্গ ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে বলে এগুলো ফসলের বন্ধু। কোনো কোনো কীটপতঙ্গ আবার ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলে বলে ফসলকে এসব কীটপতঙ্গের কবল থেকে রক্ষা করে। তাই এগুলো ফসলের বন্ধু। তবে ফসলের কচি দশা থেকে ফসল পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত কতরকমের কীটপতঙ্গ যে ফসলের ক্ষতিসাধন করে তার ইয়ত্তা নেই। এসব ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের কবল থেকে ফসলকে রক্ষা করা খুব সহজ কাজ নয়। এসব ক্ষতিকর পোকামাকড় কৃষককে মহাবিপদের দিকে ঠেলে দেয়। এগুলোর আক্রমণে হ্রাস পায় ফসলের ফলন এবং উৎপাদিত ফসলের গুণমান।

ফসলের কোনো অঙ্গই রেহায় পায় না কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে। ফসলের মূল-কাণ্ড-পাতা-ফুল-ফল-বীজ সব অঙ্গেই আক্রমণ করতে পারে কোনো না কোনো কীটপতঙ্গ। তবে একই কীটপতঙ্গ গাছের সকল অংশে সমান ক্ষতি করে তা কিন্তু নয়। কোনো কোনোটা মূলে অধিক ক্ষতি করে, কোনোটা আবার কাণ্ডে। পাতায় কোনোটা ভীষণ ক্ষতি করে, কোনো কোনোটা আবার ফুল, ফল, বীজে। ফসল যখন মাঠে থাকে তখন যেমন কিছু কীটপতঙ্গ অধিক ক্ষতির কারণ হয়, ফল বা বীজ যখন ঘরে সংরক্ষিত থাকে তখন অন্য আরো কিছু কীটপতঙ্গ অধিক ক্ষতির কারণ হয়। মাঠে বা সংরক্ষণাগারে কোথাও কীটপতঙ্গের কবল থেকে কৃষকের নিস্তার নেই ।

২. কীটনাশক প্রয়োগ

ফসলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কোনো উপায় থাকে না। ক্ষেত্র বিশেষে আলোর ফাঁদ, আগাছা দমন, উত্তম ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃফসল পরিচর্যা কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও বিস্তারের মাত্রা কিছুটা হ্রাস করে বটে তবে সারা পৃথিবী জুড়ে কীট দমনের জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা। কীট প্রতিরোধ করার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে কীটপতঙ্গের আক্রমণের কারণে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগ ফলন কম হয়। অন্যদিকে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার বিনষ্ট করছে পরিবেশ আর হুমকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য।

কীটনাশক ব্যবহারের আপাতত কিছু সুবিধা লক্ষ্য গেলেও এর অনেকগুলো অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো হলো-

১. এগুলোর মূল্য অধিক হওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।

২. কীটনাশক নির্বিচারে উপকারী ও অপকারী দু'রকম কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলে বলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৩. ফসলে এগুলোর কার্যকারিতা স্থায়ী নয়। বারবার ফসলের নানা বৃদ্ধি পর্যায়ে এগুলোর স্প্রে করতে হয়। তাছাড়া বৃষ্টি বাদল এদের ধুইয়ে নেয় বলে বর্ষার সময় কার্যকরভাবে এগুলো প্রয়োগ করা যায় না।

৪. এগুলো বাতাসকে বিষাক্ত করে ফেলে।

৫. এগুলোর পানিতে মিশে মাছ ও জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়।

৬. কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কীটপতঙ্গের উপর যে নির্বাচন চাপ পড়ে তার ফলে তুলনামূলকভাবে দ্রুত মিউটেশনের মাধ্যমে কীটপতঙ্গে কীটনাশক প্রতিরোধিতা সৃষ্টি হয়।

কীট প্রতিরোধী ফসলের জাত সৃষ্টি তাই বরাবরই বিজ্ঞানীদের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম লক্ষ্য। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক ফসলে কীট প্রতিরোধী জাতও তৈরি করা হয়েছে । এক জাত থেকে অন্য জাতে, এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতেও রোগ প্রতিরোধী জিন স্থানান্তর করেছে বিজ্ঞানীরা। সমস্যা হয়েছে তখনই যখন প্রতিরোধী জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে ফসলের অন্য কোনো গণে কিংবা অনাত্মীয় কোনো গাছগাছালিতে। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করে অন্য প্রজাতি, অন্য গণ বা দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদকুল থেকে ফসলে এসব জিন স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই। ফলে বিকল্প কোনো কৌশলে এসব কাঙ্ক্ষিত জিন ফসলে নিয়ে নেয়ার বিষয় মানুষ ভেবেছে সেই কবে থেকে। জিন প্রকৌশল মানুষের সে ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

৩. বিটি ফসল

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে যে বহু অণুজীবে এবং কিছু কিছু উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন রয়েছে যেগুলোতে ফসলের ক্ষতিকারক অনেক কীটপতঙ্গের উপর বিষক্রিয়া করে থাকে। এসব একাধিক উৎস থেকে জিন কর্তন করে নিয়ে সংযোজন করা হয়েছে এখন বেশ কিছু ফসলে। তৈরি করা হয়েছে কীট প্রতিরোধী জিএম ফসল। এসব ফসলের কোনো কোনটা ইতোমধ্যে চলে গেছে কৃষকের মাঠে। কোনো কোনোটা আবার অপেক্ষা করছে কৃষকের মাঠে প্রবেশের ছাড়পত্রের জন্য। কীট বিনাশী প্রোটিনের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রোটিন হলো *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়ার ক্রিস্টাল প্রোটিন (crystal protein) যাকে সংক্ষেপে cry প্রোটিন বলা হয়। একে কীটবিনাশী ক্রিস্টাল প্রোটিনও (insecticidal crystal protein, ICP) বলা হয়। *Bacillus thuringiensis* ব্যাকটেরিয়ার যে জিনটি এ প্রোটিন সৃষ্টি করে নামের আদ্যাক্ষার অনুযায়ী সে জিনটিকে সংক্ষেপে Bt জিন বলা হয়। এটি একটি মৃত্তিকাস্থ সাধারণ অণুজীব। এটি গ্রাম পজেটিভ স্পোর উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রধান অংশ হলো এ ক্রিস্টাল প্রোটিন যা মোট ভরের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। এ প্রোটিন Lepidoptera বর্গের অধিকাংশ কীটপতঙ্গ, Coleoptera এবং Diptera বর্গের কিছু কীট পতঙ্গের

উপর ক্রিয়াশীল। Bt জিনের উৎপাদ (product) যে প্রোটিন এর আণবিক ওজন প্রায় ১৩০ কিলো ডাল্টন। এগুলেকে ডেলটা এন্ডোটক্সিন বলা হয়। অক্ষত অবস্থায় এ প্রোটিনটি বিষাক্ত নয়। এ প্রোটিন কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করার পর এটি দ্রবীভূত হয়ে কীটপতঙ্গের মধ্য-অন্ত্রে (midgut) ভেঙে ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করে। এদের ভাঙা অংশের আকৃতি যখন ৬০-৬৫ কিলোডাল্টন হয় তখন এগুলো বিষাক্ত হয় এবং কীটপতঙ্গে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে।

কীটপতঙ্গের মধ্য- অন্ত্রের ক্ষারীয় পরিবেশে ক্রিস্টাল আমিষের ভাঙন শুরু হয়। কার্যকর ভঙ্গুর প্রোটিন মধ্য অন্ত্রের পার্শ্বদেশীয় কোষে অবস্থিত রিসেপ্টরের (receptor) সাথে বাঁধা পড়ে এবং এর বিষক্রিয়া কীটের কোষ পর্দায় (cell membrane) অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র তৈরি হয়। এতে পার্শ্বদেশীয় কোষসমূহ ভেঙে যায় এবং কীটপতঙ্গ খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই কীটপতঙ্গ মারা যায়।

বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়া থেকে এ বিষাক্ত প্রোটিন উৎপাদনকারী জিনটিকে আলাদা করে নিয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফসলে সংযোজন করে কীট-প্রতিরোধী ফসল সৃষ্টির প্রয়াস নিল। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এ কাজে সফল হলো বিজ্ঞানীরা। কীট-প্রতিরোধী জিএম ফসল উদ্ভাবনের ফলে অনেকগুলো সুবিধা সৃষ্টি হলো। বারবার কীটনাশক স্প্রে করার ঝামেলা কমে গেল। কোষের মধ্যে প্রোটিনটি তৈরি হচ্ছে বলে ঝড় বৃষ্টিতে এটি ধুয়ে যাবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকলো না। এটি সমগ্র ফসল কাল ধরে ফসলকে কীটের বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষম করে তুললো। বংশ-পরম্পরায় ফসল ফলাবার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা ফসলে পাবার জন্য আর কোনো ঝামেলা থাকলো না। ফসলকে ভক্ষণ করতে আসছে যেসব কীটপতঙ্গ এগুলো কেবল এতে আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে যাচ্ছে অক্ষত।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে Bt এর অনেকগুলো স্ট্রেইন এবং আইসোলেট সনাক্ত করেছে। এসব বিভিন্ন ধরনের *cry* জিন বিভিন্ন রকম এন্ডোটক্সিন উৎপাদন করে যেগুলো ২২টি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এসব শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে *cry* জিনের নতুন নামকরণ করা হচ্ছে যথা *cry 1 Ab, cry 1 Ac, cry 3B* ইত্যাদি। এসব *cry* জিনকে কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড তামাক, গোলআলু, টমেটো, ভুট্টা , তুলা, বেগুন, ধান, ক্যানোলা, ব্রোকোলি, সয়াবিন, বাঁধাকপি, আঙ্গুর, আপেল, মটর ও মিষ্টি আলু (সারণি ৪.১)।

স্বাভাবিক Bt জিনের পাশাপাশি আজকাল রূপান্তরিত এবং কৃত্রিম Bt জিনও ফসলে সংযোজন করা হচ্ছে। রূপান্তরিত বা কৃত্রিম Bt জিন সৃষ্টির কারণ এগুলো স্বাভাবিক জিন অপেক্ষা অধিক কার্যকর। ১৯৮৭ সালে প্রথম Bt জিন সংযোজন করে তৈরি করা হয় কীট-প্রতিরোধী তামাক ও টমেটো গাছ। কিন্তু এগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা এতোটা উচ্চ মানের ছিল না। পরবর্তীতে কৃত্রিম *cry* জিন তৈরি করে Cauliflower Mosaic Virus এর প্রোমোটার, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় CaMV 35s promoter, জিনের সাথে অঙ্গিভূত করে জিনটিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অধিক মাত্রায় প্রতিরোধিতা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সারণি ৪.১ : Bt জিন সম্বলিত ট্রান্সজেনিক ফসল

Bt জিন	ফসল
১. -	তুলা
২. -	ভুট্টা
৩. *Cry 1 Ab* এবং *Cry 3 Aa*	গোলআলু
৪. *Cry 1 Ab*	গোলআলু, টমেটো, বেগুন, ক্যানোলা
৫. *Cry 1 B*	বেগুন
৬. *Cry 1 Ac*	ব্রকোলি, সয়াবিন, বাঁধাকপি, টমেটো, আঙুর, আপেল
৭. *Cry 3 Aa*	বেগুন, গোলআলু
৮. *Cry 3B*	বেগুন

গোলআলুতে কোলারাডো পটেটো বিটল (Colarado potato beetle) রোগ দমনের জন্য Bt জিন সংযোজন করে মনসান্টো বীজ কোম্পানি তৈরি করে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড গোলআলু জাত যার নাম দেওয়া হয় নতুন পাতা (New leaf)। সিবা বীজ কোম্পানি তৈরি করে ম্যাক্সিমাইজার (Maximizer) নামক জেনেটিক্যালি মোডিফাইড গোলআলু জাত। মনসান্টো আবার তৈরি করে আর একটি জিএম জাত (Yield Guard)। তুলাতে মনসান্টোর জাতটির নাম দেওয়া হয় Bollgard। এসব ফসল এখন আবাদ করা হচ্ছে আমেরিকাতে। চীনের আবাদী তামাকের একটি বড় অংশও জিএম তামাক।

সারণি ৪.২ : কীট-প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ফসল

উদ্ভিজ্জ কীট-প্রতিরোধী জিন	ফসল
প্রোটিনেজ ইনহিবিটর (Proteinase inhibitor)	
১. সয়াবিন সেরিন-প্রোটিনেজ ইনহিবিটর	গোলআলু
২. গোশীম ট্রিপসিন ইনহিবিটর	গোলআলু, মিষ্টিআলু, টমেটো, লেট্যুস, আপেল, স্ট্রাবেরি
৩. টমেটো প্রোটিনেজ ইনহিবিটর-১	টমেটো
৪. টমেটো প্রোটিনেজ ইনহিবিটর-২	টমেটো
এমাইলেজ ইনহিবিটর (Amylase inhibitor)	
১. সাধারণ শীমের এমাইলেজ ইনহিবিটর	মটর, গোলআলু
লেকটিন (lactin)	
১. স্নোড্রপ লেকটিন	গোলআলু, মিষ্টিআলু, টমেটো
২. মটর লেকটিন	গোলআলু
অন্যান্য	
১. শিম কাইটিনেজ	গোলআলু
২. তামাক এ্যানআয়োনিক পারঅক্সিডেজ	টমেটো

বেগুনের একটি অন্যতম ক্ষতিকর কীট হচ্ছে কুঁড়ি এবং ফল ভক্ষণকারী কীট (Shoot and fruit borer)। Bt জিন সংযোজন করে বেগুনে এখন তৈরি করা হয়েছে Bt বেগুন। এরকম বেগুনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে সংরক্ষিত কাঁচ ঘরে। টমেটোতে Bt জিন সংযোজন করা হয়েছে টমেটো ফল ভক্ষণকারী কীট টমেটো ফ্রুট বোরার (Tomato fruit borer)-এর আক্রমণ প্রতিহত করতে।

ইদানিংকালে *Bacillus thuringiensis* এর কোনো কোনো স্ট্রেইন বা উপজাতে ক্রিস্টাল প্রোটিনের পাশাপাশি পাওয়া গেছে অন্য আরেক রকম প্রোটিন। ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গজ বৃদ্ধির পর্যায়ে এ প্রোটিনটি তৈরি হয় বলে একে বলা হয় অঙ্গজ কীটবিনাশী প্রোটিন (Vegetative insecticidal protein, VIP)। এ ধরনের প্রোটিনের আণবিক ওজন প্রায় ৮৮ কিলোডাল্টন। অনেক রকম কীটপতঙ্গের বিপক্ষে এ প্রোটিনটিকে কার্যকর দেখা গেছে। আগামী দিনের জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলে এ জিনও সংযোজন করা হবে কীটপতঙ্গ দমনের জন্য এমনটি অনুমান করা যায়। *****

৪. উদ্ভিজ্জ কীট-প্রতিরোধী জিন

অনেক উদ্ভিদেও রয়েছে কীটবিনাশী প্রোটিন তৈরির ক্ষমতা। কীটপতঙ্গের বিপক্ষে নিজের আত্মরক্ষার স্বার্থে এগুলোর কোষে রয়েছে এসব প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন। ইদানীংকালে এরকম দুই শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ জিন আলাদা করে ফসলে ব্যবহার করা হচ্ছে কীট প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড তৈরির ফসল লক্ষ্যে। এই দুই শ্রেণীর জিন হলো– (১) কীটপতঙ্গের পরিপাক এনজাইম যথা– প্রোটিনেজ এবং এমাইলেজ ইনহিবিটর এবং (২) লেকটিন।

কীটপতঙ্গের বিদ্যমান প্রোটিনেজগুলো হলো সেরিন, সিটিন, অ্যাসপারটিক এসিড এবং কিছু ধাতব- প্রোটিনেজ যা খাদ্যের প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো এসিড অবমুক্তকরণকে ত্বরান্বিত করে। এসব প্রোটিনেজ তাই কীটপতঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করে। সেরিন এবং প্রোটিনেজ ইনহিবিটর অনেক রকম কীটপতঙ্গের উপর ক্রিয়াশীল। তবে প্রথমোক্ত ইনহিবিটরটি Lepidoptera গোত্রের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনহিবিটরটি Coleoptera গোত্রের কীটপতঙ্গের উপর অধিক ক্রিয়াশীল।

এ যাবৎ ১৪টি বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনেজ ইনহিবিটর জিন ফসলের উদ্ভিদে সংযোজন করা হয়েছে। এদের মাঝে সর্বাধিক কার্যকর ইনহিবিটর হলো গোশীম (cowpea) ট্রিপসিন ইনহিবিটর সংক্ষেপে যাকে CpTi বলা হয়। এ ইনহিবিটরটি দশটি ভিন্ন ফসল প্রজাতিতে সংযোজন করা হয়েছে। আলফা এমাইলেজ ইনহিবিটর হলো দ্বিতীয় প্রকৃতির এনজাইম ইনহিবিটর যেগুলোর ব্যবহার করা হয়েছে ফসলের উদ্ভিদ রূপান্তরণে। ল্যাকটিন হলো শ্বেতসার সংবন্ধনশীল প্রোটিন।

অনেক রকম ল্যাকটিন পাওয়া গেছে উদ্ভিদে যা হোমোপটেরা (Homoptera), কলিওপটেরা (Coleoptera), লেপিডপটেরা (Lepidoptera) এবং ডিপটেরা

পতঙ্গের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে হলে কিছু কিছু কীটনাশক দু'একবার ফসলে ছিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

সবচেয়ে ভালো হয় যদি সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কীট-প্রতিরোধী ফসলের আবাদ উল্লেখযোগ্যভাবে কীটনাশক প্রয়োগ কমিয়ে আনে। ফলে রক্ষা পায় পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হওয়া থেকে রক্ষা পায় আর ফসলের আবাদ করতে খরচ অনেক কমে যায়। ফলে কৃষি অধিকতর লাভজনক হয়ে ওঠে এবং দূষণের হাত থেকে পরিবেশ রক্ষা পায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল

১. ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবনের গুরুত্ব

ফসলের অনেক রকমের শত্রু রয়েছে। এর মধ্যে নানারকম রোগজীবাণু অন্যতম। রোগজীবাণুর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফসলের ক্ষতি করে যে রোগজীবাণু তা হলো ভাইরাস। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় ভাইরাসের আক্রমণে ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট ব্যাহত হয়। ভাইরাস মূলত পাতায় তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ফলে ভাইরাসের লক্ষণ পাতা দেখে সহজেই সনাক্ত করা যায়। কোনো গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়, কোনো গাছের পাতা আবার বেশ কুঁচকে যায়। বহু বর্ণিল পাতা বা পাতার বিবর্ণতাও ভাইরাস আক্রমণের সাক্ষ্য বহন করে। ফসলে ভাইরাসের আক্রমণ ভীষণ রকম কমিয়ে দেয় সালোকসংশ্লেষণ এবং পরিণামে কমে যায় ফসলের ফলন।

২. ভাইরাস ও ভাইরাসমুক্ত ফসল

ভাইরাসের আক্রমণ একবার ফসলে ঘটে গেলে তা থেকে নির্দিষ্ট গাছকে বাঁচানো একেবারেই অসম্ভব। কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই সরাসরি ভাইরাসের বিপক্ষে। কোনো রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগও অকার্যকর ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে। ভাইরাসের মাত্রা যাতে না বাড়ে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার জন্য অবশ্য দুটি ভিন্নরকম উপায় রয়েছে। অধিকাংশ ভাইরাসের বিস্তার ঘটে আবপোকার (aphid) মাধ্যমে। অন্যান্য কিছু পোকার মাধ্যমেও ভাইরাস ছড়ায়। এগুলো আসলে ভাইরাসের বাহক। রাসায়নিক কীটনাশক ছড়িয়ে বাহক পোকা দমন করতে পারলে ভাইরাসের বিস্তার রোধ হয় । কিন্তু এর জন্য ছিটিয়ে দিতে হয় বিষাক্ত কীটনাশক– যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ ঘটায়। ভাইরাসের বিস্তার রোধের আরেকটি উপায় হলো যে বীজে ভাইরাসের অণু রয়েছে এদের কীটনাশক পদার্থ দিয়ে মিশ্রিত করে দেয়া যেন কীটপতঙ্গের আক্রমণ না ঘটে মাঠে। ভাইরাসের বিস্তার রোধ করার বিকল্প একটি উপায় হলো ভাইরাস আক্রান্ত বা ভাইরাসমুক্ত জনন একক (propagules) থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত জনন একক উদ্ভাবন। বহু অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তারক্ষম ফসলে (vegetatively propagated crops) উদ্ভিদের মেরিস্টেম (meristem) কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জন্মানোর মাধ্যমে ভাইরাস মুক্ত জনন একক পাওয়া সম্ভব। আমাদের দেশেও গোলআলুর রোগমুক্ত জনন এককের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে রোগজীবাণু বা ভাইরাসমুক্ত জনন একক উৎপাদনকে মাইক্রোপ্রোপাগেশন (micropropagation) বলা হয়।

৩. জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল সৃষ্টি

ভাইরাস প্রতিরোধ জিএম ফসল সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানীরা এখন নানারকম কৌশল অবলম্বন করছে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কৌশল আলোচনা করা হলো

৩.১. আবরণী প্রোটিন জিন

বিংশ শতাব্দীতে বংশগতিবিদ্যার সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে ফসল উন্নয়নে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রোগ প্রতিরোধক্ষম ফসলের জাত সৃষ্টিতে প্রচলিত পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে তুলনায় ভাইরাস প্রতিরোধী জাত সৃষ্টিতে সাফল্য খুব একটা নেই বললেই চলে। এ কারণেই ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম ফসলের জাত সৃষ্টির জন্য জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ অনেকটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ফসল প্রজাতির বাইরে বিভিন্ন উৎসে ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম জিন বিদ্যমান থাকায় প্রচলিত পদ্ধতিতে তা ফসলে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় জিন প্রযুক্তি একমাত্র কার্যকর বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উদ্ভিদে ভাইরাস প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টির জন্য পোষক উদ্ভিদ দেহে নির্দিষ্ট ভাইরাসের কিছু জিন প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারলেই চলে। ভাইরাসের এসব জিনের মধ্যে রয়েছে ভাইরাসের আবরণী প্রোটিন জিন (virus coat protein gene), স্যাটেলাইট RNA (satellite RNA) এবং রেপ্লিকেজ জিন (replicase gene)। এসব জিনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং সর্বাধিক কার্যকর জিন হলো আবরণী প্রোটিন (coat protein) জিন।

উদ্ভিদে আবরণী প্রোটিন জিন সংযোজন করে দিলে যদি জিনটির প্রকাশ ঘটে তবে উদ্ভিদে ভাইরাস প্রতিরোধী ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়। আবরণী প্রোটিনের জন্য দায়ী জিন ফসলে ঢুকিয়ে দিলে দু'ভাবে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়।

কোষের মধ্যে আবরণী প্রোটিন থাকায় আক্রমণকারী ভাইরাসের আবরণীটি তৈরি হতে পারে না বলে ভাইরাস কণিকা (virus particle) অনাবৃত থেকে যায়। অথবা এতো দ্রুত ভাইরাসের আবরণীটি তৈরি হয় যে, কোষের মধ্যে প্রবেশ করা ভাইরাস নিওক্লিক এসিডের অনুলিপন (replication) এবং বহিঃপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এ কৌশল অবলম্বন করে Powell-Abel এবং তাঁর সহযোগিরা ১৯৮৬ সালে টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের আবরণী প্রোটিন জিন তামাক গাছে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযোজন করে দিয়ে জিএম তামাক তৈরি করেন।

এর ফলে ভাইরাস রোগ সংক্রমণের মাত্রা কমে আসে অনেকাংশে। এ কৌশল ব্যবহার করে পরবর্তীতে জিএম ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল তৈরি করা হয় টমেটো, গোলআলু, শসা, স্কোয়াশ, তরমুজ, প্লাম ইত্যাদি ফসলে (সারণি ৫.১)। আবরণী জিন কেবল যে ভাইরাস থেকে জিনটি নেয়া হয় তার বিপক্ষেই প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাই নয় বরং অন্যান্য কিছু ভাইরাসের বিপক্ষেও প্রতিরোধক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ৫.১ : ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

ফসল	জিন	ভাইরাস
শসা	আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic
শসা	আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic, Water melon Mosaic, Zucchini yellow Mosaic
গ্ল্যাডিওলাস	আবরণী প্রোটিন	Beam yellow Mosaic
লেট্যুস	নিউক্লিও ক্যাপসিড	Tomato spotted wilt
বাঙি	এন্টিসেন্স আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic, Papaya ringspot, Watermelon Mosaic-2, Zucchini yellow Mosaic
তরমুজ	আবরণী প্রোটিন	Watermelon Mosaic-2, Zucchini yellow Mosaic
পেপে	আবরণী প্রোটিন	Papaya ringspot
গোলআলু	এন্টিসেন্স আবরণী প্রোটিন	Potato Virus Y
গোলআলু	আবরণী প্রোটিন	Potato Leaf roll
গোলআলু	আবরণী প্রোটিন	Potato Virus X
গোলআলু	আবরণী প্রোটিন	Potato Virus Y
গোলআলু	এন্টিসেন্স আবরণী প্রোটিন	Potato Leaf roll
গোলআলু	এন্টিসেন্স আবরণী প্রোটিন	Tobacco Mosaic Mottling
গোলআলু	আবরণী প্রোটিন	Barley yellow dwarf
গোলআলু	রেপ্লিকেজ	Potato Leaf roll
গোলআলু	প্রোটিয়েজ	Potato Leaf roll
প্লাম	আবরণী প্রোটিন	Papaya ring spot
স্কোয়াশ	আবরণী প্রোটিন	Papaya ring spot
স্কোয়াশ	আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic
স্কোয়াশ	আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic, Papaya ring spot
স্কোয়াশ	আবরণী প্রোটিন	Watermelon Mosaic-2, Zucchini yellow Mosaic
স্কোয়াশ	আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic, Papaya ring spot, Watermelon Mosaic-2, Zucchini yellow Mosaic
টমেটো	নিউক্লিও ক্যাপসিড	Tomato spotted wilt

ফসল	জিন	ভাইরাস
টমেটো	আবরণী প্রোটিন	Tobacco yellow leaf curl
টমেটো	আবরণী প্রোটিন	Tobacco Mosaic
টমেটো	আবরণী প্রোটিন	Cucumber Mosaic
টমেটো	রেপ্লিকেজ	Tobacco Mosaic
তরমুজ	আবরণী প্রোটিন	Watermelon Mosaic-2, Zucchini yellow Mosaic

তিন রকমের ভাইরাস গোলআলুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস রোগ ঘটায় । এসব ভাইরাস হলো– Potato Virus X (PVX), Potato Virus Y(PVY) এবং Potato leaf roll Virus। নেদারল্যান্ডের Mogen International–এর বিজ্ঞানীরা গোলআলুর কোষে Potato Virus X–এর আবরণী প্রোটিন সৃষ্টিকারী জিন ঢুকিয়ে দেন। জিএম গোলআলু গাছের মধ্যে থেকে অতঃপর পাওয়া যায় PVX প্রতিরোধী জিএম গোলআলু ফসল। একই ভাবে পাওয়া গেছে PVY এবং Potato leaf roll–এর বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষমতা।

পেঁপের একটি প্রধান ভাইরাস রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের নাম হলো Papaya ring spot virus (PRSV)। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হাওয়াই প্রদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ পেঁপের চাষ হতো ১৯৯২ সালে পুনাতে। ১৯৯৮ সালে সেখানে উৎপাদন হ্রাস পেয়ে তা নেমে আসে শতকরা ৫০ ভাগে PRSV আক্রমণের কারণে। আবরণী প্রোটিন জিন পেঁপেতে সংযোজন ঘটিয়ে সেখানে পাওয়া গেছে ভাইরাস প্রতিরোধী জাত।

৩.২. রেপ্লিকেজ জিন (Replicase gene) **ও নিউক্লিও ক্যাপসিড** (Nucleo-capsid)

অন্যান্য উপায়েও ভাইরাস প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করা যায় ফসলে। রেপ্লিকেজ জিন ফসলে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পাওয়া যায় ফসলে ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা। টমেটো এবং লেট্যুসের জিএমফসল তৈরি করা হয়েছে নিউক্লিও ক্যাপসিড (N) কে কাজে লাগিয়ে। Tomato spotted wilt ভাইরাসে জেনোমিক আরএনএ শক্ত করে সংযুক্ত রয়েছে নিউক্লিও ক্যাপসিড প্রোটিনের সঙ্গে। এ প্রোটিনটির কাজ হলো (১) ভাইরাসের RNA কে জড়িয়ে নিতে সাহায্য করা এবং (২) কোনো জীবকে আক্রমণের পর RNA এর অনুলিপনে সাহায্য করা। জিএম উদ্ভিদ তৈরি করার জন্য N জিনকে আলাদা করে নিয়ে এর সাথে জুড়ে দেয়া হয় Ca MV 35s প্রোমোটার এবং জিনটিকে কোষের মধ্যে পৌছে দেয়া হয়। ফলে পাওয়া যায় ভাইরাস প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল।

৩.৩. এন্টিসেন্স আবরণী প্রোটিন

এন্টিসেন্স আবরণী প্রোটিনকে কাজে লাগিয়ে ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় বাঙি এবং গোলআলুতে। বাঙিতে চারটি ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় এ কৌশলে (সারণি ৫.১)। আর গোলআলুতে ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে তিনটি ভাইরাসের বিপক্ষে। এ কৌশলে উদ্ভিদ কোষে এমন RNA কে ঢুকিয়ে দেয়া হয় যা CMV আবরণী প্রোটিন উৎপাদনের জন্য জিন থেকে তৈরি হওয়া

বার্তাবাহক RNA কে সম্পূরক ক্ষারক জোড়ায়নের (complementary base sequence) মাধ্যমে বেঁধে ফেলে। অর্থাৎ আবরণী প্রোটিন তৈরির বার্তাবাহক RNA মুক্ত অবস্থায় না থাকায় কোনো ভাইরাস আবরণী প্রোটিন উদ্ভিদ কোষে তৈরি করতে পারে না। ফলে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি রহিত হয়ে যায় এবং পরিণামে উদ্ভিদ ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

৩.৪. প্রোটিয়েজ জিন

গোলআলুতে প্রোটিয়েজ জিনকে কাজে লাগিয়ে ভাইরাস প্রতিরোধিতা তৈরি করা হয়েছে। এ কৌশলে গোলআলুর পাতা মোড়ানো (potato leaf roll) ভাইরাসকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে । এক্ষেত্রে উদ্ভিদে প্রোটিয়েজ জিন ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট ভাইরাস গাছটিকে আক্রমণ করলে জিনটি তৈরি করে প্রোটিয়েজ এনজাইম। আর এ এনজাইমটি ভেঙে দেয় সকল প্রকার কোষীয় প্রোটিনকে এবং ভাইরাসের বংশবিস্তার রোধ করে। ফলে গোলআলু ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম হয়ে পড়ে ।

জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে বিভিন্ন ফসলে ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির কাজ এগুচ্ছে জোরে-সোরে। এখন পৃথিবীর অনেক দেশে ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম ফসল নিয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা চলছে । অনেক ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম জিএম ফসল আবাদের জন্য কৃষকের মাঠে ঠাঁই করে নিতে পারে আগামী কিছু দিনের মধ্যেই।

ভাইরাস প্রোতিরোধক্ষম ফসল নিয়ে মানুষের আশংকা সবচেয়ে কম। কারণ ভাইরাসের একটি অংশ ফসলে ঢুকিয়ে এ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। ভাইরাস আক্রান্ত ফসলের ফল বা ভাইরাস আক্রান্ত সবজি এদেশে নিয়মিত ভক্ষণ করা হয়। ফলে ভাইরাসের আবরণী প্রোটিন বা অন্য কোনো জিন সবজির মধ্যে ঢুকিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হলে সে ফসল বা ফসলের অংশবিশেষ ভক্ষণ করলে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না বলেই মনে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ফসল

১. ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ফসলের গুরুত্ব

ফসলের রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ। কোনো কোনো ফসলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ এতোটা মারাত্মক হতে পারে যে সম্পূর্ণ ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে ফসলের ব্যাকটেরিয়াজনিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ রয়েছে। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে উদ্ভিদ প্যাথোজেনের (plant pathogen) প্রধান গ্রুপের সদস্যগণ *Agrobacterium*– গণের অন্তর্ভুক্ত। পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া সহজে গাছে ঢুকে যেতে পারে, যদিও ক্ষত দিয়ে উদ্ভিদে ঢুকে পড়তে ভীষণ দক্ষ *Agrobacterium*। ব্যাকটেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী অন্যান্য গণগুলো হলো– *Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas* এবং *Streptomyces*। অনেক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার রোগের লক্ষণগুলো প্রায় একই রকম। নানা রকম দাগ, gall, পচন, ধ্বসা, soft rot, wilt দেখা দেয় এগুলোর আক্রমণে। এগুলোর আক্রমণ সবজি বা ফলের মান কমিয়ে দেয় এবং ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস করে।

২. উদ্ভিদের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধক্ষমতা

যে কোনো রোগজীবাণু উদ্ভিদকে আক্রমণ করা মাত্র উদ্ভিদে এক ধরনের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সব ধরনের উদ্ভিদে কোনো বিশেষ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিবর্তে অধিকতর সাধারণ প্রতিরোধক্ষমতা কৌশল লক্ষ্য করা যায়। রোগজীবাণুর আক্রমণের কারণে উদ্ভিদে চার পর্যায়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

ক. শারীর গঠনজনিত প্রতিরক্ষা (anatomical defense)

উদ্ভিদের ক্ষতস্থান দিয়ে অধিকাংশ রোগজীবাণু উদ্ভিদ দেহে ঢুকে পড়ে। কারণ উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থানিক ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্য এমন যেন রোগের পাথজেন (pathogen) সহজে জীবন্ত কোষে ঢুকে যাওয়ার সুযোগ পায় না। উদ্ভিদের শক্ত আবরণী, মোম, রোম ইত্যাদির উপস্থিতি রোগজীবাণুর বিপক্ষে একটি ন্যূনতম প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে।

খ. উদ্ভিদে বিদ্যমান প্রোটিন এবং রাসায়নিক প্রতিরক্ষা

উদ্ভিদে দ্বিতীয় পর্যায়ের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক অণুজীব রোধক প্রোটিনের উপস্থিতির কারণে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের নানা পর্যায়ে এ

ধরনের প্রোটিন উদ্ভিদে উৎপন্ন হয়। এগুলো ডিফেনসিন (defensin) এবং ডিফেনসিন সদৃশ প্রোটিন।

গ. উদ্ভূত প্রতিরক্ষা পদ্ধতি (inducible defense system)

উদ্ভিদের তৃতীয় পর্যায়ের প্রতিরক্ষা কৌশল সৃষ্টি হয় রোগজীবাণু কর্তৃক আক্রমিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট আমিষের কারণে। যখন কোনো রোগ জীবাণু উদ্ভিদে প্রবেশ করে তখন উদ্ভিদে এর প্রতি এক ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। রোগজীবাণুর প্রতি তিনভাবে উদ্ভিদে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, রোগজীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট অণুর সাথে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট অণুর আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, রোগ জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট নির্দিষ্ট প্রোটিনের সাথে উদ্ভিদ কর্তৃক সৃষ্ট নির্দিষ্ট প্রোটিনের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে। এ ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশলকে শনাক্তকরণ নির্ভর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (recognition-dependent disease resistance) বলা হয়। আর তৃতীয়ত, উদ্ভিদে বিদ্যমান এক ধরনের অন্তর্গত প্রতিরোধ ক্ষমতা (systemic resistance) প্রদর্শনের মাধ্যমে।

ঘ. দেহভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা (systemic responses)

রোগজীবাণুর আক্রমণের ফলে উদ্ভিদে যে স্থানিক প্রতিরক্ষা কৌশলসমূহ সৃষ্টি হয় (local defense pathways) তার মাধ্যমে আন্তঃকোষীয় সংকেত প্রদান করে যে দেহভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা (systemic responses) তৈরি হয়– একে দেহভ্যন্তরীণ অর্জিত প্রতিরক্ষা (systemic acquired resistance, SAR) বলা হয়। এ ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতার দুটি ধাপ রয়েছে যথা– প্রারম্ভিক ধাপ (initiation phase) ও রক্ষণাবেক্ষণ ধাপ (maintenance phase)। প্রারম্ভিক ধাপে রোগাক্রান্ত কোষ থেকে যে সংকেত প্রদায়ী অণু (signal molecule) যথা– স্যালিসাইলিক এসিড তৈরি হয় তা ফ্লোয়েমে চলে যায়। এসব অণু অতঃপর উদ্ভিদের অন্য অংশের টার্গেট কোষে চলে যায় যেখানে SAR জিনসমূহ প্রকাশিত হয় এবং উদ্ভিদ কিছু মাত্রায় প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

৩. ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবন

ব্যাকটেরিয়া জীবাণু কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের রোগ দমনের জন্য জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমনেরর জন্য একাধিক কৌশল ব্যবহার করেছে বিজ্ঞানীরা। নিচে সংক্ষেপে বিভিন্ন কৌশল আলোচনা করা হলো।

৩.১. প্যাথোজেনেসিস সম্পর্কিত প্রোটিন (Pathogenesis related protein)

প্যাথোজেনেসিস সম্পর্কিত প্রোটিন (PR) নিম্ন আণবিক ওজোনসম্পন্ন প্রোটিন যা রোগজীবাণু আক্রান্ত উদ্ভিদ টিস্যুতে অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। এসব PR প্রোটিনের প্রধান শ্রেণীসমূহ হলো– PR-১, PR-২, β-১-৩ গ্লুকানেজ, PR-৩ (কাইটিনেজসমূহ), PR- ৪ (হেভেইন), PR-৫ (থমাটিন) ও ওসমোটিন (Osmotin) ইত্যাদি। তামাক গাছে ব্যাকটেরিয়ার কাইটিনেজ জিন সংযোজন করে তামাকে এ জিন সংযোজিত

হওয়ায় জিনটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। শিম (*Phaseoles vlgaris*) এর কাইটিনেজ জিন তামাক ও নেপাস সরিষার গাছে সংযোজন করে পাওয়া গেছে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভিদ প্রতিরক্ষা। এক্ষেত্রে প্রোমোটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে CaMV 35s কে।

৩.২. অণুজীবরোধী প্রোটিন (Anti-microbial protein)

উদ্ভিদে কিছু কিছু অণুজীবরোধী প্রোটিন তৈরি হয় যেগুলো উপস্থিতিতে কোনো কোনো রোগ জীবাণুর বিপক্ষে উদ্ভিদ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এগুলো হলো রাইবোজোম নিষ্ক্রিয়করণক্ষম প্রোটিন (ribosome inactivating proteins, RIPs), সিস্টিইন সমৃদ্ধ প্রোটিন (cysteine rich proteins) যথা: লেকটিন, ডিফেনসিন (defensin), থায়োনিন (thionin), লাইসোজাইম (lysozyme), পলিগেলাকটো-ইউরোনেজ ইনহিবিটর (polygalacturonase inhibitors) ইত্যাদি। বেশ কিছু ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ প্রজাতিতে প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়া গেছে অণুজীবরোধী প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন উদ্ভিদে ঢুকিয়ে দিয়ে। তামাকে বার্লি-থিয়োনিন জিন (barley-thionin gene) স্থানান্তর করে *Pseudomonas syringae pv tabaci* এবং *P. syringae pv Syringae* এর বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে। উদ্ভিজ্জ উৎসের বাইরে ব্যাকটেরিয়ারোধী প্রোটিনগুলো হলো লাইটিক পেপটাইড (lytic peptides), লাইমোজাইম এবং আয়রন সেকুইটেরিং গ্লাইকোপ্রোটিন (iron secuestering glycoproteins) লাইটিক পেপটাইড যথা– সেকরোপিন (cecropin) এটাসিন (attacin) ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়ার পর্দায় তৈরি করে ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র। গোলআলু আর তামাকে সেকরোপিন এবং আপেলে এটাসিন প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। যখন তামাকে সেকরোপিন জিন স্থানান্তর করা হলো তখন তামাকে *P. syringae* এবং অন্যান্য ব্যাকরেরিয়াজনিত রোগের বিপক্ষে পাওয়া গেল প্রতিরোধ ক্ষমতা। ব্যকটেরিওপসিন (bacteriopsin, bo) জিন তামাকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে তামাকে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডসহ (H_2O_2) কিছু কিছু সক্রিয় অক্সিজেন প্রজাতি (active oxygen species, AOS) এর ও প্রতিরক্ষা কৌশল রয়েছে। জিএমগোলআলু গাছে H_2O_2 উৎপাদনক্ষম ছত্রাকের গ্লুকোজ অক্সিডেজ জিন সংযোজন করে *P. syringae* এর বিপক্ষে উদ্ভিদে পাওয়া গেছে অধিক মাত্রায় ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা। Molina এবং তার সহযোগীরা ১৯৯৭ সালে বার্লি থেকে লিপিড ট্রান্সফার প্রাটিন–২ তামাকে সংযোজন করে এর বিপক্ষে অধিক প্রতিরোধক্ষমতা লক্ষ্য করে।

৩.৩. টক্সিন সংবেদনহীনতার জন্য জিন সংযোজন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ভিদ কোষে কোনো প্যাথোজেন (psathogen) প্রবেশ করার সাথে সাথে সেখানে প্যাথোজেন নির্দিষ্ট বিষাক্ত পদার্থ তথা টক্সিন উৎপাদন হয়। এসব বিষাক্ত পদার্থকে নির্বিষ করে দেয়ার মতো এনজাইমও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছে এবং এসব এনজাইম উৎপাদনকারী জিন উদ্ভিদে সংযোজন করে পাওয়া সম্ভব হয়েছে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা।

এজন্য ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএমফসল তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীরা এমন একটি কৌশল নির্ধারণ করল যাতে ফসলে নির্দিষ্ট কিছু জিন সংযোজন করে দেওয়া হয় যা থেকে উৎপাদিত প্রোটিন বা এনজাইম সরাসরি ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত পদার্থকে নির্বিষ করে দেয়। এভাবে তৈরি করা হয়েছে তামাকের মধ্যে বনজ্বলা (wildfire) রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাধিজ *Pseudomonas syringae*.....এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধিতা। তামাক গাছে এ প্যাথজেন তৈরি করে ট্যাবটক্সিন (tabtoxin) নামক বিষাক্ত পদার্থ। তামাকের মধ্যে ট্যাবটক্সিন প্রতিরোধী জিন (ttr) সংযোজন করে দিয়ে পাওয়া গেছে এ রোগের বিপক্ষে প্রতিরোধিতা। ১৯৯৬ সালে একইরকম কৌশল অবলম্বন করে বিজ্ঞানী Hernera - Estrella এবং তার সহযোগীরা। তারা একটি উদ্ভিদে একটি ব্যাকটেরিয়ার জিন স্থানান্তর করে দেয় যা একটি বিষাক্ত পদার্থ সংবেদনহীন এনজাইম উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে অরনিথিন কার্বামোয়িল ট্রান্সফারেজ (ornithine carbamoyl transferase) উদ্ভিদের প্লাস্টিডে উৎপাদন করা হয় যা ট্রান্সজেনিক গাছকে *P. syringae* var. *phaseolocola* এর বিষাক্ত পদার্থ ফ্যাজিওলোটক্সিন (phaseolotoxin) –এর বিষ প্রতিক্রিয়া রোধে সহায়তা করে।

ইদানীংকালে আখের leaf scald রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, *Xanthomonas albilineans*–এর বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়া গেছে। এ ব্যাকটেরিয়াটি উদ্ভিদের জাইলেমে অবস্থান করে নানারকম নিম্ন আণবিক ওজোনের টক্সিন যেমন এলবিসিডিন (albicidin)) তৈরি করে যা ক্লোরোপ্লাস্ট উৎপাদন বন্ধ করে দেয় বলে উদ্ভিদে ক্লোরোফিলহীনতা দেখা দেয়। এলবিসিডিন নির্বিষ করতে সক্ষম তেমন একটি এনজাইম উৎপাদনকারী জিনের (albicidin detoxifying gene, alb) সন্ধান পাওয়া গেছে *Pantoea dispersa* নামক একটি ব্যাকটেরিয়াতে। এ জিনটি ইক্ষুতে সংযোজন করে পাওয়া জেনেটিক্যালি মোডিফাইড আখে পাতার স্কোল্ড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে।

৩.৪. রোগ প্রতিরোধী জিন সংযোজন

গত কয়েক বছর ধরে ম্যাপভিত্তিক ক্লোনিং এবং জিন ট্যাগিং কৌশলসমূহ অবলম্বন করে রোগ প্রতিরোধী জিন (resistance gene. R) ফসলে সংযোজন করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হয়েছে। টমেটো গাছে Pto প্রতিরোধক্ষম জিন সংযোজন করে *P. syringae pv tomato* এর বিপক্ষে পাওয়া গেছে প্রতিরোধ ক্ষমতা। তামাক গাছেও একই জিন সংযোজন করে পাওয়া গেছে *P. syringae pv tabaci* এর বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষমতা। ধানের Xa21 জিন সংযোজন ধানের পাতা ঝলসানো (leaf blight) রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, *Xanthomonas oryzae* pv *oryzae*–এর ৩০টি ভিন্ন স্ট্রেইন-এর বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

৩.৫. ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টি

উদ্ভিদে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করার আর একটি চমৎকার কৌশল হলো উদ্ভিদে তেমন কিছু উদ্ভিজ্জ জিন সংযোজন করে দেয়া যা থেকে এনজাইম তৈরি হয়ে

তা ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরকে সহজেই ভেঙে দেয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরকে ভেঙে ফেলা। ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের গঠন উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের গঠন অপেক্ষা ভিন্নতর। ফলে এসব এনজাইম সহজেই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরকে নষ্ট করে দিতে সক্ষম হলেও এটি উদ্ভিদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

সারাণি ৬.১ : ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএম উদ্ভিদ ও ফসল

ফসল	রোগজীবাণু	জিন	জিনের উৎস
আপেল	*Erwinia amylovora*	এট্রাসিন লাইসোজাইম সেসরোপিন D	*Hyalophora cecropia* নামের মুরগি *H. cecropia*
গোলআলু	*Corynebacterium sepedonicum* *E. caratovora* নরম পচা এবং বৃত্তকার দাগ (soft rot and ring spot)	সেসরোপিন B লাইসোজাইম লাইসোজাইম	*H. cecropia* *H. cecropia* মুরগি

ব্যাকটেরিয়া কোষপ্রাচীর পেপটিডোগ্লাইকানস (peptidoglycans) নামক পলিমার দিয়ে তৈরি। এ পলিমারে রয়েছে আমিষ এবং শ্বেতসার উপাদান যা লাইসোজাইম (lysozyme) নামক এনজাইম দিয়ে হজম করে ফেলা যায় (সারণি ৬.১)। মুরগির ডিমে প্রচুর পরিমাণ লাইসোজাইম পাওয়া যায়। এ লাইসোজাইম এনজাইম উৎপাদনকারী জিন ফসলে কোনো ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করলে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি রহিত হয়ে যায়। মুরগির ডিমের সাদা অংশ থেকে লাইসোজাইম জিন ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তামাক আর গোলআলু ফসলে। ফসলে *Erwinia carotovora* sp. *atroseptica* আক্রমণ ঘটলে তামাক ও গোলআলুতে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়। আপেলে একই জিন সংযোজন করে প্রতিরোধিতা পাওয়া গেছে *Erwinia amylovora* ব্যাধিজ-এর বিপক্ষে।

ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএমফসল সৃষ্টির কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলেছে বেশ জোরে সোরে পৃথিবীর কোনো কোনো ল্যাবে। কোনো কোনো জিএম উদ্ভিদের সফলতা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএম ফসল সৃষ্টির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। দিন দিন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের প্রতিরক্ষা কৌশল এবং এদের জিনগত ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টতর হচ্ছে। ফলে এসব জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জিএম ফসল উৎপাদন আগামী দিনগুলোতে সহজতর হবে এমনটি আশা করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ছত্রাক প্রতিরোধী ফসল

১. ছত্রাক প্রতিরোধী ফসলের গুরুত্ব

ফসলের ফলন হ্রাস করে যেসব পরিবেশ প্রতিকূলতা তার মধ্যে অন্যতম হলো ফসলের নানা রকম রোগজীবাণুর আক্রমণ। ফসলের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর মধ্যে রয়েছে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, নেমাটোড ইত্যাদি। ফসলে রোগজীবাণুর আক্রমণ ফসলের জীবভর (biomass) হ্রাস করে ফেলে।

কখনও সম্পূর্ণ গাছটিই মরে যায়, কখনো এগুলো মেরে ফেলে কোনো শাখাকে, কখনো বা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ করে পাতা, ফুল, ফল বা বীজেরও। আক্রমণের মাত্রার উপর নির্ভর করে ফসলের ক্ষতির মাত্রাও। কখনও এমনও দেখা যায় যে কোনো ফসলই সংগ্রহ করা যায় না আক্রান্ত ফসল থেকে। পৃথিবী জুড়ে রোগের কারণে ফসলের ফলন হ্রাস পায় প্রায় শতকরা ২০-৩০ ভাগ।

২. ছত্রাক প্রতিরোধী জিন

নানা রকম ছত্রাক ফসলের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। অধিকাংশ ফসলের রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ছত্রাকের আক্রমণ। চিরাচরিত ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছত্রাক প্রতিরোধক জাত সৃষ্টি করা হয়েছে গত ৬০-৭০ বছর ধরে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ এ কাজে বেশ সফলতাও অর্জন করেছেন। প্রায় প্রতিটি ফসলে রোগ প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে যে, সেসব ফসলে যেখানে কোনো আবাদী জাতে প্রতিরোধী জিনের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কখনো কখনো নিকট সম্পর্কিত প্রজাতিতে প্রতিরোধী জিনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। দূর সম্পর্কিত প্রজাতি বা গণের উদ্ভিদে ছত্রাক প্রতিরোধী জিন পাওয়া গেলে নানা কৌশল অবলম্বন করে এসব জিন নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের ফসলে। ব্যাক ক্রসিং করে প্রায় সব ফসলে তৈরি করা হয়েছে রোগ প্রতিরোধী জাত।

৩. প্রচলিত পদ্ধতি

অনেক ছত্রাক প্রতিরোধী জিনের সন্ধান মেলে এমন সব ফসলে বা জীবে যা চিরায়ত ক্রসিং কর্মসূচির মাধ্যমে তা ফসলে আনা যায় না, কেননা এগুলোর সাথে ফসলের ক্রসিং হয় না। তাছাড়া সনাতন পদ্ধতিতে সৃষ্ট অনেক ফসলের জাত উচ্চ মাত্রায় প্রতিরোধ ক্ষমতা দিতে পারেনা ছত্রাকের বিরুদ্ধে। সে কারণে জিন প্রযুক্তিবিদগণ আর উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফসলে নানা উৎস থেকে প্রতিরোধী জিন স্থানান্তর করার প্রয়াস নিয়েছে।

কখনো আবার অন্য রকম কৌশল অবলম্বন করেও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে ফসলে। অনেক ক্ষেত্রে ফসলের সাথে সরাসরি ক্রস করে জিন, স্থানান্তর, সম্ভব হয় না সরাসরি হাইব্রিড বীজ তৈরি করা সম্ভব হয় না বলে। এরকম ক্ষেত্রে এক প্রজাতি থেকে প্রতিরোধী জিন স্থানান্তর করা হয়েছে অন্য এক প্রজাতিতে এবং তৃতীয় প্রজাতি থেকে জিনটি স্থানান্তর করা হয়েছে আবাদী প্রজাতিতে। প্রথম প্রজাতির সাথে আবাদী প্রজাতির সরাসরি ক্রস না হওয়ায় এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪. জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ

জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ফসলে ছত্রাক প্রতিরোধিতা সৃষ্টিকে আরও সহজ করে তুলেছে। ইতোমধ্যে ছত্রাক প্রতিরোধী জিএম উদ্ভিদ তৈরি করার জন্য নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

কোনো একটি গাছ ছত্রাক দিয়ে আক্রান্ত হলে এর প্রভাবে কোষে প্যাথোজেনেসিস সম্পর্কিত প্রোটিন (Pathogenesis related protein বা PR protein) তৈরি হয় যা কমপক্ষে নয়টি জিন পরিবার দিয়ে নির্দেশিত হয়ে থাকে। এসব জিন পরিবারে রয়েছে ক্ষারীয় এবং অম্লীয় কাইটিনেজ (kitinase), ১-৩ β-D গ্লুকানেজ (১-৩ β-D glucanase), হেভেইন (hevein), থমাটিন (thaumatin), অসমোটিন সদৃশ প্রোটিন (osmotin like protein) ইত্যাদি। ফসলে PR প্রোটিন সৃষ্টিকারী জিন স্থানান্তর করে প্রতিরোধিতা সৃষ্টি একটি অন্যতম কৌশল।

৪.১. কাইটিনেজ ও গ্লুকানেজ

কাইটিনেজ এবং গ্লুকানেজ এনজাইম ছত্রাকের কোষ প্রাচীরে বিদ্যমান গ্লুকান (glucan) এবং কাইটিন (kitine) কে ভেঙে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে ছত্রাকের বৃদ্ধি রহিত করে। গোড়ার দিকে আলাদাভাবে কোনো ফসলে কাইটিনেজ জিন ও কোনো কোনো ফসলে গ্লুকানেজ জিন ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝারি মাত্রায় প্রতিরোধক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে। গ্লুকানেজ এবং কাইটিনেজের পরস্পর সম্পর্কটা এমন যে কাইটিনেজের উপস্থিতিতে গ্লুকানেজের কর্মকাণ্ড তীব্রতর হয়।

ফসলে এ দুটি এনজাইম পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য উত্তম বলে বিবেচিত হয়। সে কারণে পর্যায়ক্রমিকভাবে কোষে কাইটিনেজ এবং গ্লুকানেজ সৃষ্টি করা গেলে তা হবে একটি উপযুক্ত ছত্রাক প্রতিরোধী কৌশল। কাইটিনেজ জিনকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। শসা, লেট্যুস, বাঙি ও স্কোয়াশে কাইটিনেজ জিন নেওয়া হয়েছে তামাক থেকে।

গোলআলুর একটি এবং টমেটোর ৫টি ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধিতার জন্য *Serratia marcescens* নামক প্রজাতি থেকে কাইটিনেজ জিন নেওয়া হয়েছে। শসা, লেট্যুস, বাঙি, গোলআলু আর স্কোয়াশে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর বিপক্ষে প্রতিরোধিতা পাবার জন্য তামাক থেকে গ্লুকানেজ জিনটি আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। (সারণি ৭.১)

সারণি ৭.১ : ছত্রাক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

ফসল	ছত্রাক	জিন	জিনের উৎস
শসা	*Phytophthora*	গ্লুকানেজ	তামাক
	Phytophthora	ওসমোটিন	তামাক
	Phytophthora এবং *Verticillium*	কাইটিনেজ	তামাক
লেটুস	ডাউনি মিল্ডিউ (Downy mildew)	ওসমোটিন	তামাক
		কাইটিনেজ	তামাক
		গ্লুকানেজ	তামাক
বাঙি	*Phytophthora*	কাইটিনেজ	তামাক
	Phytophthora	গ্লুকানেজ	তামাক
	Phytophthora	ওসমোটিন	তামাক
গোলআলু	*Rhizoctonia solani*	গ্লুকানেজ	তামাক
	R. solani	কাইটিনেজ	*Serratia marcescens*
	R. solani	গ্লুকানেজ	তামাক
	নরম পঁচা (Soft rot)	গ্লুকানেজ	তামাক
	Verticillium	*DRRG 49*	মটর
	Phytophthera infestans	*BR*	*Solanum bulbocastanum*
স্কোয়াশ	মিলডিউ (Mildew)	ওসমোটিন	তামাক
	মিলডিউ	কাইটিনেজ	তামাক
	মিলডিউ	গ্লুকানেজ	তামাক
টমেটো	ফসল সংগ্রহ পরবর্তী ছত্রাকের আক্রমণ	কাইটিনেজ	*Serratia marcescens*
	মুকুট পচা (crown rot)	কাইটিনেজ	*S. marcescens*
	নরম পচা (soft rot ছত্রাক)	পলিগ্যালাকটিউরোনজ	নাশপতি
	পাউডারি মিল্ডিউ (Powdery mildew)	কাইটিনেজ	*S. marcescens*
	Botrytis		
	Alternaria solani	কাইটিনেজ	*S. marcescens*
		কাইটিনেজ	তামাক

DRRG 49 - Disease resistance response gene 49

৪.২. ছত্রাক প্রাচীর বিধ্বংসী এনজাইম

একাধিক জিন একটি ফসলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে ছত্রাক প্রতিরোধক্ষমতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, কাইটিনেজ এবং গ্লুকানেজের মতো ছত্রাকের প্রাচীর বিধ্বংসী এনজাইমের জিনগুলোকে আন্তকোষীয় ফাঁকে পৌছানো গেলে রোগ জীবাণুকে আগে ভাগেই দুর্বল করা সম্ভব।

৪.৩. ছত্রাক দমনের অন্যান্য উপায়

কোনো ফসলকে কোনো প্যাথজেন (pathogen) আক্রমণ করলে আক্রান্ত এলাকার চারপাশে অণুজীব বিধ্বংসী যৌগ যেমন ফাইটোএলেক্সেন (phytoalexen) সংশ্লেষণ হয়ে থাকে। এসব ফাইটোএলেক্সেন সরাসরি সেই গাছে ছত্রাকের আক্রমণ ও পরবর্তী ক্ষতি রোধ করতে পারে না। তবে এক ফসলের ফাইটোএলেক্সেন জিন পৃথক করে নিয়ে অন্য ফসলে সংযোজন করলে সেই ফসলটিকে সেই ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যে সম্ভব এমন প্রমাণ মিলেছে। বাদাম ফসল থেকে স্টিবিন সিনথেজ (stebene synthase) উৎপাদনকারী জিন কর্তন করে নিয়ে তামাকে ঢুকিয়ে দেখা গেছে যে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ছত্রাক বিধ্বংসী রেসভেরাট্রল (resveratrol) সংশ্লেষণ করে। এ ফাইটোএলেক্সেনের বিপক্ষে *Botrytis* ছত্রাক আংশিক প্রতিরোধিতা প্রদর্শন করে। গোলআলুতে অন্য ফসল থেকে জিন এনে সংযোজন করার ফলে ছত্রাকের বিপক্ষে প্রতিরোধিতা দেখা দেয়। আগামী দিনে এ কৌশল ব্যবহার করে পাওয়া সম্ভব হবে ছত্রাক প্রতিরোধী জিএমফসল।

কোনো কোনো ফসলে পাওয়া গেছে আরও কিছু যৌগ উৎপাদনকারী জিন যেগুলোর ফসলে সংযোজন করা হলে অণুজীব বিধ্বংসী বলে মনে হয়। তামাক থেকে ওসমোটিন যৌগ উৎপাদনকারী জিন শসা, লেট্যুস, বাঙি এবং স্কোয়াশে সংযোজন করে দিয়ে বিভিন্ন রকম ছত্রাকের বিপক্ষে প্রতিরোধিতা পাওয়া গেছে । মিলডিউ ছত্রাক এবং *Phytophthera infestans* ছত্রাকটির বিপক্ষে প্রতিরোধিতা দিয়েছে ওসমোটিন যৌগটি।

গোলআলুতে মড়ক রোগের (late blight) জন্য প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করা হয়েছে গোলআলুর একটি বুনো প্রজাতির জিন আবাদি গোলআলুতে সংযুক্ত করে দিয়ে। গোলআলুর বুনো প্রজাতি *Solanum bulbocastanum* থেকে BR জিন পৃথক করে নিয়ে গোলআলুতে সংযুক্ত করে দিয়েছেন জিন বিজ্ঞানীরা। ফলে গোলআলু মড়ক রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।

এখন বেশ কিছু সংখ্যক ফসলে ছত্রাক প্রতিরোধী জিএম উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছে। এসব উদ্ভিদ কৃষিতাত্ত্বিক দিক থেকে সফল বলে প্রমাণিত হলে তা থেকে বাছাই করে নেয়া সম্ভব হবে জিএম ফসলের জাত। বর্তমানে বাণিজ্যিক আবাদী পর্যায়ে না থাকলেও খুব শীঘ্রই ছত্রাক প্রতিরোধী জিএম ফসল কৃষকের মাঠে চলে আসবে। বেশ ক'টি ছত্রাক প্রতিরোধী জিএমফসল নিয়ে শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বেশ জোরেসোরে।

অষ্টম অধ্যায়

অজীবীয় প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসল

১. অজীবীয় উপাদানের কারণে সৃষ্ট পীড়ন ও ফসল

মাঠে ফসলকে নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়। একদিকে রয়েছে আগাছা, কীটপতঙ্গ আর নানা রকম রোগজীবাণুর আক্রমণ, অন্য দিকে রয়েছে খরা, বন্যা, শৈত্য, লবণাক্ততা আর উষ্ণতাসহ নানারকম অজীবীয় প্রতিকূলতা। ফলে হরেক রকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। ফসলের অজীবীয় প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে বন্যা, খরা, শৈত্য, ফ্রিজিং, লবণাক্ততা, তাপ, ভারী ধাতু , ওজোন, অধিক তীব্র আলো ইত্যাদি (চিত্র ৮.১)। এগুলোর মধ্যে তাপ, শৈত্য, ফ্রিজিং, খরা ও লবণাক্ততার জন্য ফসলে পানি স্বল্পতা পীড়ন দেখা দেয়। তাপ, শৈত্য আর ফ্রিজিং–এর কারণে উষ্ণতাজনিত পীড়ন দেখা দেয়। অধিকাংশ জীবীয় ও অজীবীয় পীড়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্ত মূলক (free radical) এবং বিক্রিয়াশীল অক্সিজেন স্পেসিস (reactive oxygen species, ROS) উৎপাদন করে– যা অক্সিডেটিভ পীড়ন (oxidative stress) সৃষ্টি করে।

২. ফসলের উপর অজীবীয় পীড়নের প্রভাব

অজীবীয় পীড়নের ফলে ফসলের ফলনের উপর যে প্রভাব পড়ে এবং জীবীয় পীড়নের সাথে এর তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.১ -এ তুলে ধরা হয়েছে । প্রথমেই তা থেকে যে জিনিসটি নজরে আসে তা হলো ফসলের গড় ফলনের সাথে রেকর্ড ফলনের বিশাল ব্যবধান। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে রেকর্ড ফলন আর গড় ফলনের মধ্যকার পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হলো অজীবীয় পীড়ন। এক বছর থেকে অন্য বছরে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহের এমন ভিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে যে তাতে গমের গড় ফলন (উদাহরণস্বরূপ) সর্বোচ্চ ফলনের মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ হতে পারে। অজীবীয় পীড়ন– সহিষ্ণু ফসল সৃষ্টি তাই জিন প্রযুক্তিবিদদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য। এ ধরনের ফসল সৃষ্টির একটি বড় লক্ষ্য হলো যেন ফসল পীড়নের মধ্যে পড়ে গেলেও এর বৃদ্ধি ও বিকাশ ন্যূনতম প্রভাবিত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফলন দিতে সক্ষম হয়।

তবে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, দীর্ঘমেয়াদে ওজোন স্তরের ক্ষয় এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার ফলে অজীবীয় পীড়নের মাত্রা ফসলের উপর বেড়েই যাবে। কাজেই আগামী দিনে বাড়তি এ সমস্যাটিকে মাথায় নিয়ে অজীবীয় পীড়ন–সহিষ্ণু জিএম ফসল তৈরি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকছে না।

সারণি ৮.১ : কিছু প্রধান ফসলের গড় ও রেকর্ড ফলন

ফসল	রেকর্ড ফলন (কেজি/হেঃ)	গড় ফলন (কেজি/হেঃ)	গড় ফলন (রেকর্ড ফলনের %)	গড় ক্ষতি (রেকর্ড ফলনের %) জীবীয়	গড় ক্ষতি (রেকর্ড ফলনের %) অজীবীয়
গম	১৪৫০০	১৮৮০	১৩.০	৫.০	৮২.১
বার্লি	১১৪০০	২০৫০	১৮.০	৬.৭	৭৫.৪
সয়াবিন	৭৩৯০	১৬১০	২১.৮	৯.০	৬৯.৩
ভুট্টা	১৯৩০০	৪৬০০	২৩.৮	১০.১	৬৫.৮
গোল আলু	৯৪১০০	২৮৩০০	৩০.১	১৮.৯	৫৪.১
সুগার বিট	১২৯০০০	৪২৬০০	৩৫.২	১৪.১	৫০.৭

সূত্র : ব্রে ও অন্যান্য ২০০০

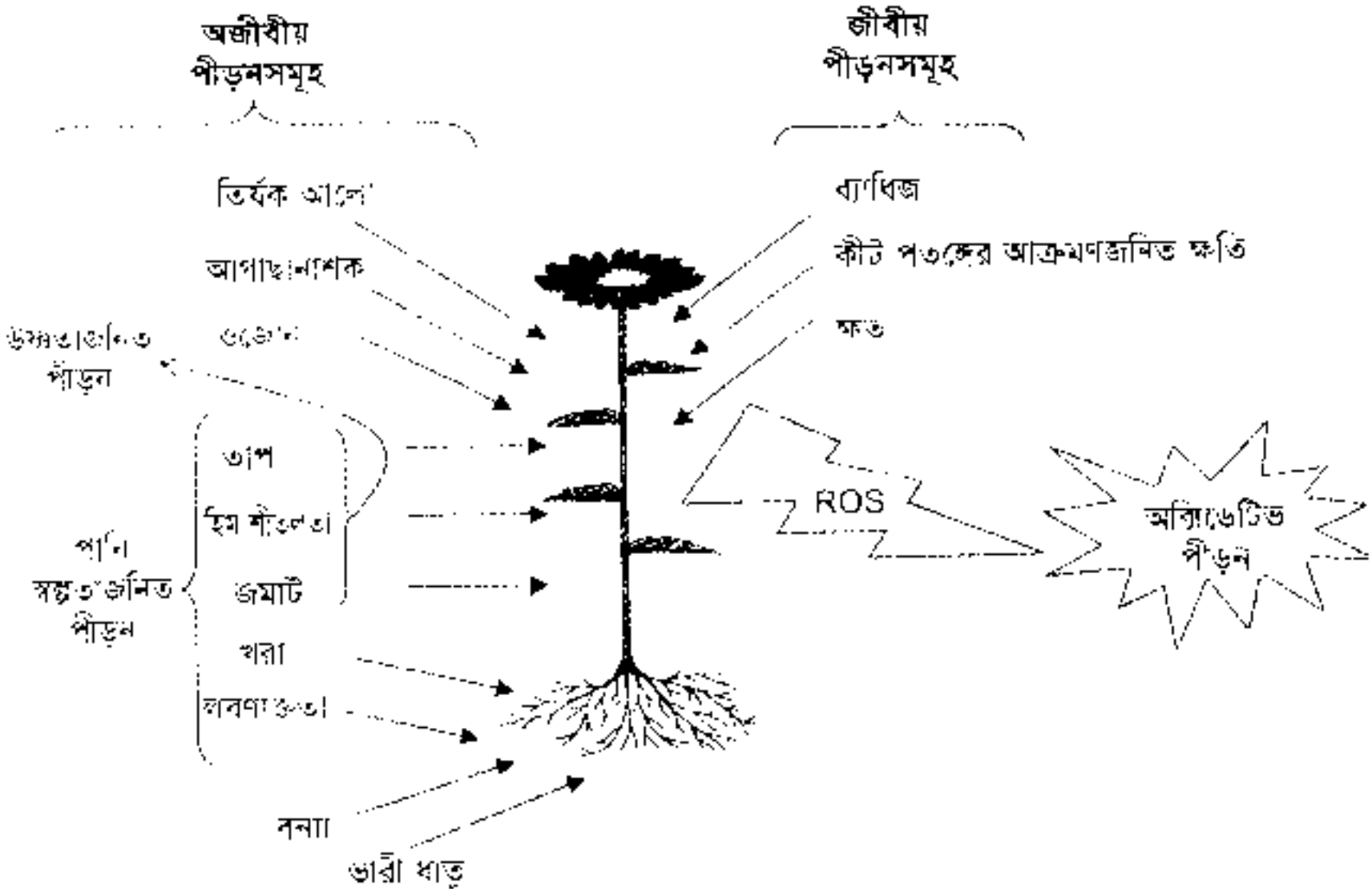

চিত্র ৮.১: বিভিন্ন ধরনের অজীবীয় পীড়ন

৩. অজীবীয় পীড়ন প্রতিক্রিয়া

অজীবীয় পীড়নের ফলে গাছে কিছু সাধারণ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পীড়নের ফলে উদ্ভিদের কোষে নিম্ন আণবিক ওজনের কিছু যৌগ তৈরি হয়। এগুলোর অসমোপ্রোটেক্টেন্ট (osmoprotectant) বা অসমোলাইটস্ (osmolytes) বলা হয়। এসব যৌগ উৎপাদিত হওয়ার জীবসংশ্লেষীয় পথক্রম (biosynthetic pathway) সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অবগত হবার চেষ্টা করছে। এসব জীবসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম উৎপাদনকারী জিন জিন-প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদে সংযোজন করে কোনো

কোনো অসমোলাইট উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এসব অসমোলাইটের মধ্যে রয়েছে সুগার, সুগার এলকোহল, গ্লাইসিন বিটেয়িন এবং প্রোলিন।

গ্লাইসিন বিটেয়িন একপ্রকার এমোনিয়াম যৌগ যা কমপক্ষে ১০টি পুষ্প পরিবার এবং সামুদ্রিক শৈবালে পাওয়া যায়। পানিগ্রাহী এবং পানিত্যাগী উভয় প্রকার অণুর সাথে এটি আন্তঃক্রিয়া করতে সক্ষম। গ্লাইসিন বিটেয়িন প্রোটিনকে এবং মেমব্রেনকে থিতু করে এ আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে। তাছাড়া এর কোষীয় অসমোলাইট হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে । *E. coli* এবং *Arthrobacter globiformis* অণুজীবে রয়েছে গ্লাইসিন বিটেয়িন জীবসংশ্লেষণ করার জিন। এ দুই উৎস থেকে জিন নিয়ে বেশ ক'টি ফসলের ক্ষেত্রেই খরা প্রতিরোধী জিএম ফসল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে (সারণি ৮.২)। *Arthrobacter* প্রজাতির কোলিন অক্সিডেজ (choline oxidase) জিন ফসলে সংযোজন করে উচ্চ মাত্রার গ্লাইসিন বিটেয়িন (glycine betaine) পাওয়া গেছে। *Arabidopsis* এবং ধানে এরকম প্রতিরোধিতা পাওয়া গেছে।

গ্লাইসিন বিটেয়িন ছাড়াও আরও অনেক রকম অসমোপ্রোটেকটেন্ট (osmoprotectant) জিন গাছে সংযোজন করে দিয়ে পাওয়া গেছে পীড়ন সহিষ্ণুতা (সারণি ৮.৩)। মনে করা হয় এসব যৌগের কোনো কোনটা যেমন ম্যানিটল, সার্বিটল এবং প্রোলিন বিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতিকে নষ্ট করে দেয় বলে দেখা দেয় পীড়ন প্রতিরোধিতা। গাছে সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় অর্নিথিন থেকে প্রোলিন তৈরি হয়। তবে পীড়ন অবস্থায় গ্লুটামেট থেকেও প্রোলিন তৈরি হতে পারে (চিত্র ৮.২)।

সারণি ৮.২ : ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে গ্লাইসিন বিটেয়িন উৎপাদন

ট্রান্সজিন	পোষক উদ্ভিদ	গ্লাইসিন বিটেয়িনের পরিমাণ	পীড়ন সহিষ্ণুতা
বার্লি *badh* (betaine aldehyde dehydrogenase)	তামাক পারঅক্সিজেজ	অপরীক্ষিত	অপরীক্ষিত
	তামাক ক্লোরোপ্লাস্ট	২০ μ mol g^{-1} FW	অপরীক্ষিত
	তামাক ক্লোরোপ্লাস্ট	< ০.০৫ μ mol g^{-1} FW	অপরীক্ষিত
E. coli bet A (choline dehydrogenase)	তামাক সাইটোসোল	-	লবণ
bet A / bet B	তামাক	০.০৩৫ μ mol g^{-1} FW	শৈত জনিত লবণ
bet B	ধান	৫.০ μ mol g^{-1} FW	খরা লবণ
A. globiformis (choline oxidase)	*Arabidopsis* ক্লোরোপ্লাস্ট	১.২ μ mol g^{-1} FW	লবণ, শৈত, ফ্রিজিং, তাপ, তীব্র আলো
cod A	ধান	৫.৩ μ mol g^{-1} FW	লবণ, শৈত্য
A. pascens cox (choline oxidase)	*Arabidopsis*	১৯ μ mol g^{-1} DW	ফ্রিজিং, লবণ
cox	*Brassica napus*	১৩ μ mol g^{-1} DW	খরা, লবণ
cox	তামাক	১৩ μ mol g^{-1} DW	লবণ

FW = তাজা ওজন, DW = শুষ্ক ওজন

গ্লুটামেট থেকে প্রোলিন তৈরির প্রথমে দুটি বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় একটি এনজাইম দিয়েই। সয়াবিন এবং মথবিন (mothbean) থেকে P5CS এবং P5CR এনজাইমের জন্য দায়ী জিন আলাদা করে নিয়ে তা তামাকে সংযোজন করা হয়েছে । এতে তামাকে পীড়ন সহিষ্ণুতা দেখা গেছে ।

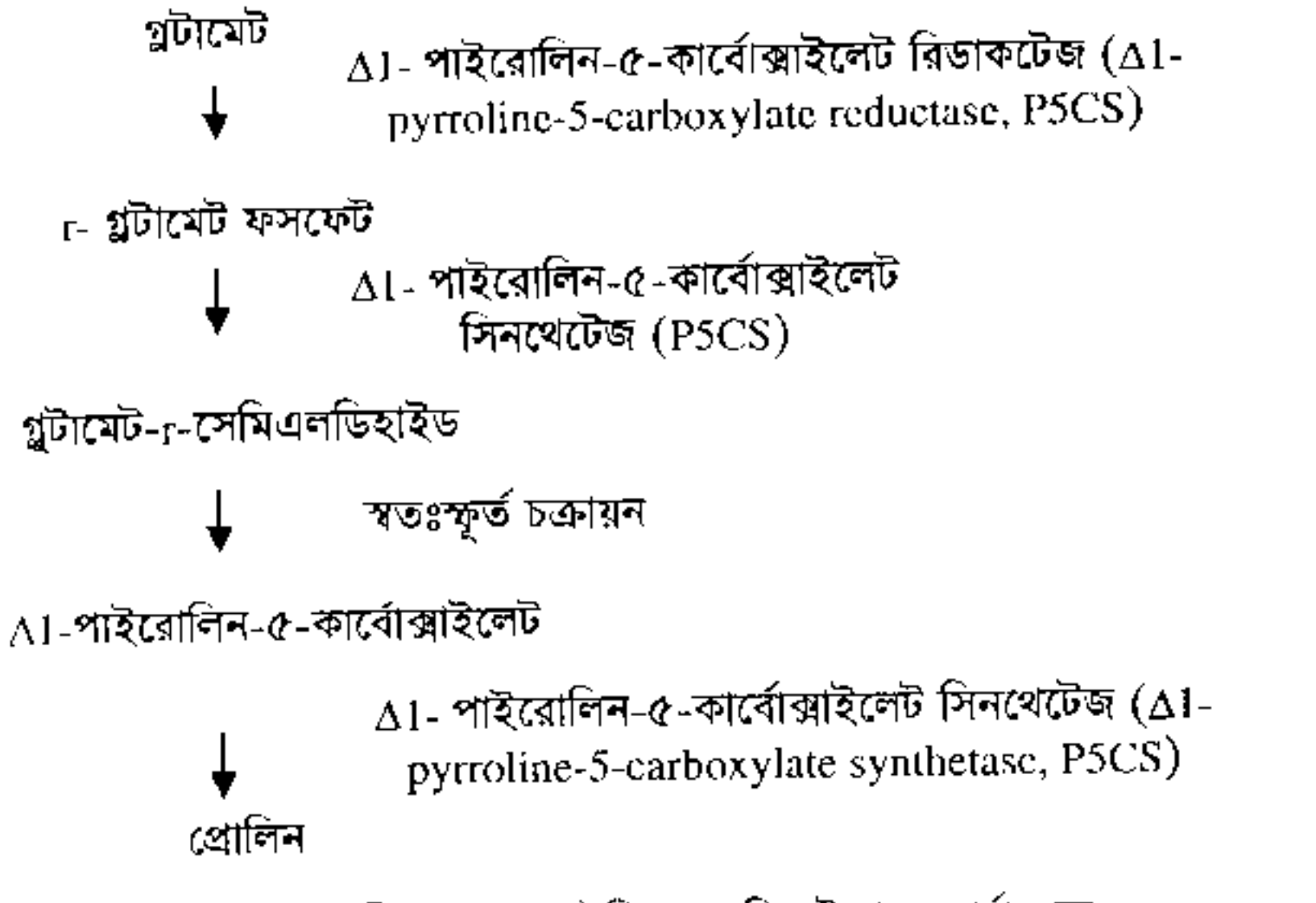

চিত্র- ৮.২ : পীড়ন অবস্থায় উদ্ভিদে প্রোলিন উৎপাদন পর্যায়ক্রম

ম্যানিটল উৎপাদন এবং একত্রিতকরণের মাধ্যমেও গাছে পীড়ন প্রতিরোধিতা পাওয়া যায়। *E. coli* থেকে জিন mtl 1D গাছে সংযোজন করে পাওয়া গেছে কিছু মাত্রায় পীড়ন সহিষ্ণুতা। ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন নিয়ে ধান গাছে সংযুক্ত করে দিয়ে পাওয়া গেছে খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু উদ্ভিদ। ট্রাইহালোজ উৎপাদন হয় বলে উদ্ভিদে দেখা দেয় প্রতিরোধিতা। ফ্রুকটান এবং অসমোটিন উৎপাদনের জন্য জিন অন্য উৎস থেকে ফসলে ঢুকিয়ে দিয়েও কোনো কোনো ফসলের উদ্ভিদে পীড়ন সহিষ্ণুতা পাওয়া গেছে ।

এটি অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা জেনে গেছে যে, তাপ পীড়নের ফলে বহু জীব তাপকম্প প্রোটিন (heat shock protein, HSP) উৎপন্ন করে। গাছে নানা উৎস থেকে জিন সংযোজন করে রূপান্তরিত গাছে বিভিন্ন প্রকার তাপকম্প প্রোটিন (HSP) উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে (সারণি ৮.৪)।

জীবীয় এবং অজীবীয় উভয় প্রকার পীড়নের ফলেই গাছে অক্সিডেটিভ পীড়ন লক্ষ্য করা যায়। ওজোন দূষণ বা বিকিরণের ফলেও অক্সিডেটিভ পীড়ন দেখা দিয়ে থাকে। কোষে মুক্ত মূলকের উৎপত্তি এবং এর ধারাবাহিকতায় অক্সিডেটিভ পীড়ন তৈরি হয় । কোষে বিক্রিয়াশীল অক্সিজেন স্পেসিস (ROS) তৈরি হওয়ায় অক্সিডেটিভ পীড়নের কারণে কোষের ক্ষতিসাধিত হয়। কোষীয় বৃহৎ অণুগুলোর সাথে ROS এর বিক্রিয়ার কারণে কোষের প্রোটিনগুলোও নষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৮.৩ : গ্লাইসিন বিটেয়িন ছাড়া অসমোপ্রোটেক্টেন্ট উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদ

অসমো প্রোটেক্টেন্ট	ট্রান্সজিন	ফসল	পরিমাণ	পীড়ন সহিষ্ণুতা
প্রোলিন	মথবিন *P5CS* (Pyrroline carboxylate synthetase)	তামাক ধান সয়াবিন		লবণ খরা, লবণ, অক্সিডেটিভ অসমোটিক, তাপ
	P5CS F127A (feedback inhibiton insensitive)	তামাক	8 mg g^{-1} FW	লবণ
	Anti- pro DH (proline dehydrogenase)	*Arabidopsis*	০.৬ mg g^{-1} FW	লবণ, ফ্রিজিং
ম্যানিটল	*E. coli mt 1D*	*Arabidopsis*	১০ µg g^{-1} FW	লবণ
	(mannitol-1-phosphate dihydrogenase)	তামাক	৬ µ mol g^{-1} FW	লবণ
সরবিটল	Apple *s 6 pdh* (sorbitol-6-phosphate dehydrgenase)	তামাক	৬১.৫ µ mol g^{-1} FW	অক্সিডেটিভ পীড়ন, লবণ
ট্রেহালোজ	yeast *tps 1* (trehalose-6-phosphate synthase, T-6-PS)	তামাক গোল আলু	৩.২ µg g^{-1} DW	খরা খরা
	E. coli ots A + ots B (T-B-PS and T-6-P phophatase)	তামাক	৯০ µg g^{-1} FW	খরা
D ওনোনিটল	*gce* plant *imtl* (Myo-inositolo-methyltransferase)	তামাক	৩৫ µg g^{-1} FW	খরা, লবণ
ফ্রুকটান্স	*B. subtilis sacB*	তামাক সুগারবিট	০.৩৫ mg g^{-1} FW ৫ mg g^{-1} DW	খরা খরা
গ্লুটামিন	*GS2* (ক্লোরোপ্লাস্টিক গ্লুটামিন সিনথেটেজ)	ধান		লবণ শৈত্য
অসমোটিন	*Osm1-Osm4* (protein accumulation)	তামাক		খরা লবণ

FW = তাজা ওজন, DW = শুষ্ক ওজন

নির্দিষ্ট অ্যামাইনো এসিডের রূপান্তর, পেপাটাইড চেইনের খণ্ডিতকরণ, পরিবর্তিত বৈদ্যুতিক চার্জ এবং প্রোটিন ভাঙার প্রতি অধিক সংবেদনশীল হবার কারণে কোষীয় প্রোটিন উপাদান নষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৮.৪ : তাপ সহিষ্ণুতার জন্য ব্যবহৃত ট্রান্সজিন

জিন	প্রোটিন	ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ
AtHSF1	Heat-shock transcription factor HSF1 GUS fusion	*Arabidopsis*
Hsp 101	HSP 100 class heat-shock protein	*Arabidopsis*
Hsp 70	HSP 70 class heat-shock protein	*Arabidopsis*
Hsp 17.7	SmHSP small heat-shock protein family	গাজর
TLHS1	Class I sm HSP	তামাক

৪. অজীবীয় পীড়ন সহিষ্ণুতা অর্জন

উদ্ভিদে নানা প্রকার এনজাইম রয়েছে যা বিক্রিয়াশীল অক্সিজেন স্পেসিসকে তুলনামূলকভাবে কম বিক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। কিন্তু এনজাইম যেমন- সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ (superoxide demutase), কেটালেজ (ketalase) এবং পারঅক্সিডেজ এসব স্পিসিসকে অক্ষতিকর করে তুলে। তিন ধরনের ভিটামিন β-ক্যারোটিন, অ্যাসকরবিক এসিড এবং α-টোকোফেরল এন্টিঅক্সিডেন্টের ভূমিকা পালন করে। অক্সিডেটিভ পীড়ন সইবার জন্য *Mn-SOD* জিন বেশ ক'টি উদ্ভিদে সংযোজন করা হয়েছে। এতে বেশ আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। ইদানিং কালে *Cu/Zn-SOD, Mn-SOD* এবং *Fe-SOD* জিন একত্রে আলফা আলফা গাছে ঢুকিয়ে দিয়ে শীত সহিষ্ণুতা পাওয়া গেছে।

ফসলের অক্সিডেটিভ পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্য বিকল্প পথও রয়েছে। Arabidopsis এবং তামাক গাছে অ্যাসকরবেট পারঅক্সিডেজ (ascorbate peroxidase), গ্লুটাথিয়ন পার অক্সিডেজ (glutathione per oxidase) এবং গ্লুটাথিয়ন রিডাকটেজ (glutathione reductase) জিন ঢুকিয়ে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার অজীবীয় পীড়নে কি অবস্থা দাঁড়ায় তা পরীক্ষা করা হয়েছে (সারণি ৮.৫)।

অজীবীয় পীড়ন সহিষ্ণু কোনো কোনো জিএম উদ্ভিদ এখন জিএম ফসলে রূপান্তরের পর্যায়ে। এদের নিয়ে মাঝারি পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আগামী পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে পীড়ন প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ মাঠ পর্যায়ে শুরু হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছে।

সারণি ৮.৫ : অক্সিডেটিভ পীড়ন সহিষ্ণুতার জন্য ব্যবহৃত ট্রান্সজিন

জিন	পোষক	পীড়ন সহিষ্ণুতা
মাইটোকন্ড্রিয়াল *Mn-SOD* তামাক	আলফা-আলফা ক্লোরোপ্লাস্ট	বর্ধিত মাঠ পর্যায়ের খরা সহিষ্ণুতা
		বর্ধিত ফ্রিজিং সহিষ্ণুতা
মাইটোকন্ড্রিয়াল *Mn-SOD* তামাক	তামাক ক্লোরোপ্লাস্ট	বর্ধিত ওজোন সহিষ্ণুতা
মাইটোকন্ড্রিয়াল *Mn-SOD* তামাক	তামাক মাইটোকন্ড্রিয়া	ওজোন সহিষ্ণুতার উপর কোনো প্রভাব নেই
Mn SOD	ক্যানোলা	বর্ধিত এলুমিনিয়াম সহিষ্ণুতা
ক্লোরোপ্লাস্ট *Cu/Zn-SOD* মটর	তামাক ক্লোরোপ্লাস্ট	উচ্চ মাত্রার আলোক ও শীত সহনশীলতা প্রদর্শন
সাইটোসোলিক *Cu/Zn-SOD*	তামাক সাইটোসোল	ওজোন সহিষ্ণুতা

জিন	পোষক	পীড়ন সহিষ্ণুতা
Fe-SOD *Arabidopsis*	তামাক	ওজোনের ক্ষতির হাত থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করে
APX (ascorbate peroxidase)	তামাক	অক্সিডেটিভ পীড়নের বিপক্ষে বর্ধিত প্রতিরক্ষা
APX1	*Arabidopsis*	তাপ সহিষ্ণুতা
CST/GPX (glutathione s-transferase with glutathione peroxidase)	তামাক	বর্ধিত পীড়ন সহিষ্ণুতা
Nt 107 (ghutathione s-transferase)	তামাক	ঠাণ্ডা এবং লবণাক্ততা পীড়ন অবস্থায় বৃদ্ধি
Por B (ghutathione s-transferase)	*Arabidopsis*	এলুমিনিয়াম বিষক্ততা এবং অক্সিডেটিভ পীড়নকে প্রতিহত করে
Nt pox (ghutathione peroxidase	*Arabidopsis*	এলুমিনিয়াম বিষক্ততা এবং অক্সিডেটিভ পীড়নকে প্রতিহত করে
Glutathione reductase *E. coli*	তামাক ক্লোরোপ্লাস্ট	SO_2 এর বিপক্ষে অধিক সহিষ্ণুতা
Glutathione reductase *E. coli*	তামাক সাইটোসোল	বর্ধিত প্যারাকুয়াট (paraquat) সহিষ্ণুতা
Glutathione reductase *E. coli*	পপলার সাইটোসোল	Paraquat সহিষ্ণুতাজনিত কোনো প্রভাব নেই
MsFer Alfalfa ferritin	তামাক	অতিরিক্ত লোহার উপস্থিতিতে অক্সিডেটিভ ক্ষতির বিপক্ষে বর্ধিত সহিষ্ণুতা

SOD-superoxide dismutase, GST-glutathione S-transferase, GPX- glutathione peroxidase, GR-glutathione reductase, GS-glutathione synthetase, GSH-glutathione.

নবম অধ্যায়

ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান

১. ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবনের পটভূমি

আমাদের আজকের ফসল চাষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাজার বছরের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চাষযোগ্য হয়েছে। ফসলের মধ্যে সংঘটিত আকস্মিক স্বতঃস্ফূর্ত জেনেটিক পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক পর-পরাগায়ন ফসলের মধ্যে যে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে তার উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন আর মানুষের যাচাই-বাছাই সৃষ্টি করেছে নানারকম ফসল আর ফসলের নানা জাত। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে এসে বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র দুটি পুনরাবিষ্কার হবার পর শুরু হয় বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। ফসলে জেনেটিক পরিবর্তন আনার নানা কৌশল মানুষ উদ্ভাবন করেছে, উদ্ভাবন করেছে নানা রকম ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি। এরই ফলে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি (recombinant DNA technology) প্রয়োগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ফসলে কীট প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী ফসলের জাতও সৃষ্টি করা হয়েছে । কোনো কোনো ফসলে আগাছানাশক প্রতিরোধী ও ভাইরাস প্রতিরোধী জাতও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে । এসব সাফল্য ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে দেখে বিজ্ঞানীরা ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য এ প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় এন্টিসেন্স (antisense) জিন ব্যবহার করে টমেটোর পরিপক্বতা কালকে প্রলম্বিত করা সম্ভব হয়েছে। টমেটোর নরম হয়ে যাওয়া স্বভাব পাল্টিয়ে এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে । এসব সাফল্য গবেষকে আশাবাদী করে তোলে তেমন ধানের জাত সৃষ্টিতে যে ধান কেবল শর্করার উৎস নয় হবে ভিটামিন এ-এর ও উৎস।

২. ধান ও ভিটামিন - এ

ভিটামিন-এ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক একটি ভিটামিন। শিশু অবস্থায় এ ভিটামিনের অভাব হলে শিশুদের রাতকানা রোগ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, অন্ধত্ব বা অকাল মৃত্যুও ঘটে থাকে। প্রতিবছর পৃথিবীতে প্রায় ১০০-১৪০ মিলিয়ন শিশু ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত রোগে ভোগে। প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার শিশু চিরতরে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে এর অভাবে। মারা যায় প্রায় ১ মিলিয়ন শিশু। এ পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীদের ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান উৎপাদনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ফসল হিসেবে ধানকে বেছে নেবার একাধিক কারণও রয়েছে। প্রথমত, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা প্রতিদিন ভাত আহার করে বিধায় ভিটামিন-এ সম্পন্ন ভাত ব্যাপক জনসংখ্যার উপকারে আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, ধানে ভিটামিন-এ উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক পর্যায়ক্রমিক যে

ধাপগুলো অতিক্রম করার প্রয়োজন হয় তার অনেকগুলো প্রাথমিক ধাপ ধানের সস্যের (endosperm) মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু তিনটি ধাপ অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিন সংযোজন করে নিতে পারলে ভিটামিন-এ পাওয়া সম্ভব।

৩. ধানে ভিটামিন-এ জিন সংযোজন

উদ্ভিদে প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যারোটিনয়েডসহ নানারকম যৌগ তৈরি হয়। আমরা যে β-কেরোটিন থেকে ভিটামিন-এ পেয়ে থাকি তা এক ধরনের ক্যারেটিনয়েড। ক্যারোটিনয়েড হলো হলুদ, কমলা আর লাল রঙের রঞ্জক। উদ্ভিদের কোষস্থ প্লাস্টিডে সংঘটিত আইসোপ্রোনয়েড গতিপথের একটি সাধারণ যৌগ আইসোপেনটিনিল ডাইফসফেট (isopentynyl diphosphate, IPP) থেকে ক'টি ধাপ অতিক্রম করে তৈরি হয় ক্যারোটিনয়েড। অপরিপক্ব ধানের সস্যে ক্যারোটিনয়েড উৎপন্ন হয় না বটে তবে ক্যারোটিনয়েড উৎপন্ন হবার প্রয়োজনীয় প্রাকযৌগ (precursor) জেরানিল, জেরানিল ডাই-ফসফেট (geranyl geranyl di-phosphate, GGPP) তৈরি হয় (চিত্র ৯.১)।

আইসোপেন্টেনিল ডাই ফসফেট(আইপিপি)
(Isopentynyl di-phosphate)
↓
জেরানিল জেরানিল ডাই-ফসফেট (জিজিপিপি)
(Geranyl geranyl di-phosphate)
(ধানের সস্যে এ যৌগটি উৎপন্ন হয়)
↓ ফাইটোইন সিনথেজ (ধানে এ এনজাইমটি অনুপস্থিত)
(Phytoene synthase)
ড্যাফোডিল থেকে জিন সংযোজন করা হয়।
ফাইটোইন
↓ ফাইটোইন ডিসেচ্যুরেজ (ধানে এ এনজাইমটি অনুপস্থিত)
(Phytoene desaturase)
ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন সংযোজন করা হয়।
লাইকোপিন
↓ লাইকোপিন β- সাইক্লেজ (ধানে এ এনজাইমটিও অনুপস্থিত)
(Lycopene β -cyclase)
ড্যাফোডিল ফুল গাছ থেকে জিন সংযোজন করা হয়।
β -কেরোটিন (ভিটামিন-এ এর আঁধার)
(β - carotene)

চিত্র ৯.১ : সোনালি ধানে β- কেরোটিন তথা ভিটামিন-এ তৈরির ধাপ

জেরানিল জেরানিল ডাই-ফসফেট থেকে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াটি আর তিন ধাপ এগিয়ে গেলেই পাওয়া সম্ভব হতো β-কেরোটিন (β-carotene) যৌগটি। ধানের

সস্যের প্লাস্টিডে উৎপাদিত জেরানিল জেরানিল ডাইফসফেট ধানের ক্লোরোফিল, জিবেরেলিন, ভিটামিন-ই, টোকোফেরল ইত্যাদি নানা রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। এ জিজিপিপি-কে β-কেরোটিন পর্যন্ত নিতে যে যে অতিরিক্ত এনজাইম দরকার নিরন্তর দশ বছর গবেষণা করে সেসব এনজাইম সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনগুলোকে বিজ্ঞানী জুচং ই এবং তাঁর সহকর্মীরা ধানে সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। জিজিপিপি থেকে β-কেরোটিন তৈরির প্রথম ধাপ হলো জিজিপিপি থেকে ফাইটোইন (Phytoene) তৈরি করা। দুই অণু-জিজিপিপি-কে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ফাইটোইন পাওয়া সম্ভব– এর জন্য দরকার পরে ফাইটোইন সিনথেজ নামক একটি এনজাইম, যার জিন ধানে নেই। এ এনজাইম সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন যে জিন তার সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা ডেফোডিল ফুলগাছের ক্রোমোজোমে। ফাইটোইন যৌগ থেকে অন্য আর একটি এনজাইমের উপস্থিতিতে তৈরি হয় লাইকোপিন (Lycopene)। এর জন্য প্রয়োজন হয় যে এনজাইম তার নাম হলো ফাইটোইন ডিসেচ্যুরেজ। এ এনজাইম সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনও ধানে অনুপস্থিত ।

বিজ্ঞানীরা এই এনজাইমটির জিনের সন্ধান পেলেন (*Erwinia uredovora*) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াতে। লাইকোপিন যৌগ থেকে β-কেরোটিন পেতে হলে দরকার আর একটি এনজাইমের। এ এনজাইমটির নাম হলো লাইকোপিন β-সাইক্লেজ। ধানে এ এনজাইম তৈরির জিনও অনুপস্থিত বিধায় বিজ্ঞানীরা এ জিনটিও শনাক্ত করতে সক্ষম হন ডেফোডিল ফুল গাছের ক্রোমোজোমে। অতঃপর রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিয়েক্লিয়েজ নামক এনজাইম দিয়ে কর্তন করে নেয়া হয় সেই তিন তিনটি জিনকে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে। সরাসরি এসব জিন ধান গাছের মধ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর পরোক্ষভাবে ধানের ক্রোমোজোমে এ তিনটি জিন সংযোজন করা হয়। *Agrobacterium tumefaciens* নামক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অবস্থিত বৃত্তাকার DNA অণু প্লাজমিডকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ডেফোডিল থেকে প্রাপ্ত ফাইটোইন সিনথেজ জিন এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে কর্তিত ফাইটোইন ডিসচ্যুরেজ জিনকে একটি প্লাজমিডে সংযোজন করা হয়। ডেফোডিল থেকে প্রাপ্ত লাইকোপিন β-সাইক্লেজ জিনকে সংযোজন করা হয় অন্য একটি প্লাজমিডে। অতঃপর এ দুটি বাহক প্লাজমিডকে দুটি ভিন্ন *Agrobacterium* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়। পূর্বে কৃত্রিম মাধ্যমে আবাদকৃত ধানের ভ্রূণকে উক্ত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত করা হয়। ব্যাকটেরিয়া সহজেই ধানের ভ্রূণে ঢুকে পড়ে। প্লাজমিডে বহনকৃত কাঙ্ক্ষিত জিনসমূহ ধানের ক্রোমোজোমের মধ্যে সংস্থাপিত হয়। এসব জিন সত্যি সত্যি স্থানান্তরিত হয়েছে কি-না এটি জানার জন্য রূপান্তরিত গাছের DNA নিয়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা নিশ্চত হওয়া সম্ভব হয়।

তিনটি জিনই সংযোজিত হয়েছে এমন দশটি গাছকে বীজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গ্রিন হাউজে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জন্মানো হয়। এসব রূপান্তরিত উদ্ভিদ দেখতে বেশ স্বাভাবিক প্রকৃতির হয় এবং এগুলো উর্বর হয়। এগুলো বীজ তৈরি করে এবং বীজে যে β-কেরোটিন সৃষ্টি হয়েছে তা সরাসরি প্রমাণ এর সোনালি বর্ণ। ১৯৯৯ সালের ৩ শে মার্চ সোনালি বীজ আবিষ্কারের ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে চলে গেছে

আরও বেশ ক'টি বছর। উষ্ণমণ্ডলীয় এশিয়ার দেশগুলোতে *japonica* ধানের আবাদ হয় না বলে ইনগু পত্রিকাস এবং তার সহকর্মীদের জাপোনিকা ধানের ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ সোনালি ধান (golden rice) উদ্ভাবনের সাফল্য ধানের *indica* শ্রেণীর জাতে সোনালি ধান সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে। এরই ফলে ইরি (IRRI) তে গবেষক করবী দত্ত ও তাঁর সহকর্মীরা মিলে indica প্রজাতির ধানে সোনালি ধান তৈরির কাজে হাত দেন। বিজ্ঞানি পত্রিকাসের পথ অনুসরণ করে ইরি বিজ্ঞানীরা বেশ কটি জনপ্রিয় ধানের জাতে β-কেরোটিন জৈব সংশ্লেষণের জিনসমূহের সংযোজন ঘটিয়ে সোনালি ধানের জাত উদ্ভাবনের কর্মকাণ্ড শুরু করে। এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত IR64, বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত BR 29 এবং ভিয়েতনামের জনপ্রিয় দুটি জাত Mot Bui এবং Nang Hong Cho Dao জাতে বিটা-কেরোটিন সংশ্লেষণের জিনসমূহ সংযোজন করা হয়। বাংলাদেশে অতঃপর জিএম 'সোনালি ধান' BR 29 সরকারের যথাযথ অনুমোদন প্রাপ্তির পর আবদ্ধ কাঁচঘরে পরবর্তী গবেষণার জন্য নিয়ে আসা হয়। এখন রূপান্তরিত BR 29-এর ফলন নির্ধারিত পরিমাণে উন্নীত করার লক্ষ্যে BRRI তে গবেষণা চলছে। বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদে ভিটামিন 'এ' এর উপস্থিতির পরিমাণ নির্ণয়সহ নানা বিষয়ে গবেষণা চলছে।

সোনালি ধানের বীজ এখন একটু একটু করে চলে গেছে বিভিন্ন দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। এসব ধানের সাথে স্থানীয় বিভিন্ন উন্নত জাতের ধানের সংকরায়ন করানোর মধ্য দিয়ে তৈরি করা সম্ভব হবে বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া উপযোগী সোনালি ধান। ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত রোগ থেকে লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

দশম অধ্যায়

অধিক গুণবিশিষ্ট জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

১. অধিক গুণমানসমৃদ্ধ জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের গুরুত্ব

ফসলের মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন নির্দিষ্ট জাতের জেনেটিক ক্ষমতা যতটুকু ততটুকু কখনোই অর্জন করা সম্ভব হয় না। আগাছার উপস্থিতি, কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণুর আক্রমণ, খরা-শৈত্য-বন্যা-উষ্ণতা-লবণাক্ততা ইত্যাদি কোনো না কোনো অবস্থার কারণে ফসলের উৎপাদন অনেক কমে যায়। জিন প্রযুক্তিবিদগণ এবং ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ তাই উপরোক্ত উৎপাদন সমস্যা দূর করার দিকেই প্রথম মনযোগ দেয়। ফসলের জীবীয় (biotic) ও অজীবীয় (abiotic) এসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার জন্য জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ভাবিত কিছু কিছু জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যই মানুষের খাদ্যের প্রধানতম অংশ। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোতে গড়ে শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ ক্যালরি আসে উদ্ভিদ থেকে। এসব দেশগুলোতে আমিষেরও একটি বড় অংশ আসে উদ্ভিদ থেকেই যার শতকরা পরিমাণ ৭৫ ভাগের অধিক। আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোতেও চিত্রটি প্রায় একই রকম। ইউরোপের ক্যালরির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আসে উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে। উদ্ভিদ থেকে আমিষের সরবরাহ ইউরোপের দেশগুলোতে শতকরা ৫০ ভাগ। দক্ষিণ আমেরিকায় উদ্ভিদ উৎস থেকে ক্যালরি আর আমিষের সরবরাহ যথক্রমে শতকরা ৬৫ ও ৩০ ভাগ। এসব হিসাব থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির সুফল চলে যাবে বিশ্বের একটি বড় জনসংখ্যার নিকট। ফলে অধিক গুণমান সমৃদ্ধ জিএম ফসল উৎপাদন জিন প্রযুক্তিবিদদের একটি প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে উন্নত দেশগুলোতে জিএম ফসল উৎপাদনের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো অধিক গুণমান সমৃদ্ধ ফসল ঘরে তোলা। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে বেশ ক'টি জিএম ফসল তৈরি করা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো বিলম্বিত পরিপক্বতা (delayed ripening) গুণসম্পন্ন টমেটো এবং ফুল ফসল, অধিক সংরক্ষণকালসমৃদ্ধ সবজি ও ফুল, ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ধান, লোহাসমৃদ্ধ ধান ইত্যাদি।

২. দীর্ঘ পরিপক্বতা কাল সম্পন্নসবজি ও ফল

বয়োপ্রাপ্ত হওয়া জীবের একটি বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এই যে গাছের পাতা কেমন তরতাজা সবুজ সেও এক সময় কেমন মিইয়ে পড়ে এবং বিবর্ণ হতে হতে এক সময় ঝরে পড়ে। এই যে কত শাকসবজি কি রকম ফ্রেশ নিয়ে আসা হয় সুপার মার্কেটগুলোতে কিন্তু খুব দ্রুতই এরা বয়োপ্রাপ্ত হয় এবং বিবর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে

যায় একটু বিলম্ব ঘটলেই। কিংবা এই যে হৃদয়হরা মনলোভা ফুলরাজি নিয়ে পসরা সাজিয়ে ফুল ব্যবসায়ীরা বসে থাকে সেখানেও বিলম্ব হলে দ্রুত বয়োপ্রাপ্ত হয় এসব ফুলরাজি।

আমাদের প্রিয় ফলও বয়োপ্রাপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায় না । সবচেয়ে মজার কথা বয়োপ্রাপ্তি না হলে অনেক ফল মুখেই তোলা যায় না। ফলের বয়োপ্রাপ্তি মানে ফল পেকে যাওয়া। ফল পাকলে তবে তো খাবারের প্রশ্ন আসে। ফল পাকা মানেই ফলের মাংসল অংশটা নরম হয়ে আসা, এর মধ্যে জমা হয়ে থাকা শর্করা চিনিতে রূপান্তরিত হওয়া, ক্লোরোফিলের ক্ষয় প্রাপ্তি আর নানা রকম লাল রঞ্জক পদার্থ সংশেষণ এবং সংশেষণ ঘটা নানা রকম গন্ধ প্রদায়ী যৌগ। বয়োপ্রাপ্ত ফলে তৈরি হয় ইথিলিন নামক একটি যৌগ। ইথিলিন উৎপাদন শুরু হলে শুরু হয় ফল পাকার প্রক্রিয়াটাও।

কোনো কোনো ফলের ক্ষেত্রে ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় বেশ কাঁচা থাকতে। কারণ পাকা অবস্থায় এসব ফল দূর দূরান্তে পরিবহন করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া পাকা অবস্থায় এরা বেশি দিন ভালও থাকে না। সহজেই রোগজীবাণু এগুলোকে কাবু করে ফেলে। সেজন্য কলা আর আম কাঁচা অবস্থায়ই কর্তন করে গন্তব্যে চালান করে দেয়া হয়। গন্তব্যে পৌছার পর কলাকে জাগ দেওয়া হয় যেন এতে তৈরি হয় ইথিলিন। এর এ ভাবে দ্রুত পেকে যায় কলা। এমন কি আমের ঝুড়িতে সাজানো আমের নীচে দিয়ে দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড। এক সময় তা ইথিলিন উৎপাদনকে প্রভাবিত করে এবং ফলে পাকতে শুরু করে আম।

টমেটোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিন্তু কিছুটা ভিন্নরকম। কাঁচা টমেটো পরিবহনের জন্য সুবিধা বটে কিন্তু পাকলে তার আর সে রঙ, সে স্বাদ থাকে না। এমনকি ইথিলিন গ্যাস দিয়ে তাকে পাকালেও আসে না সে রঙ আর সে স্বাদ। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন যদি টমেটোর পাকাটাকে বিলম্বিত করা যায় তবে তা আরও কিছু বেশি দিন উদ্ভিদ লগ্নাবস্থায় সংরক্ষণ করা যেত। তাতে দামও পাওয়া যেত বেশি। সংরক্ষণ করবার ঝামেলাটাও পোহাতে হতো না।

ফলের মধ্যে মেথিওনিন নামক যৌগ থেকে ইথিলিন উৎপাদনের জন্য রয়েছে দুটি প্রধান ধাপ। এর একটি হলো ACC সিনথেজ (amino cyclopropane carboxylic acid synthase) নামক এনজাইম দিয়ে S-এডিনোসিল মেথিওনিন থেকে অ্যামাইনো সাইক্লোপ্রোপেন কার্বক্সাইলিক (ACC) তৈরি করা এবং অন্যটি হলো ACC থেকে ACC অক্সিডেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে ইথিলিন উৎপাদন করা। কোনোভাবে যদি এ দুটি এনজাইমের যে কোনো একটি বা উভয়টির উৎপাদন বন্ধ করা যায় তাহলে ফলের পেকে যাওয়াটা বিলম্বিত করা সম্ভব। অর্থাৎ জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ACC সিনথেজ বা ACC অক্সিডেজ এনজাইমকে অবদমন করাই হলো মূল কাজ।

এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট করা বা এনজাইম উৎপাদন বন্ধ করার নানা উপায় রয়েছে। টমেটো পেকে যাওয়া রোধ করার জন্য প্রথম যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়– একে বলা হয় এন্টিসেন্স প্রযুক্তি (antisense technology)। একটি জিন একটি

প্রোটিন তৈরির সংকেত ধারণ করে। আর এ জিনটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এর সাথে সংযুক্ত থাকে একটি নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চল যাকে প্রোমোটার (promoter) বলা হয়। একটি DNA অণুর যে অংশটি যখন প্রোটিন তৈরি করবার তথ্য সরবরাহ করে তখন সে অংশটাকে সেন্স জেনেটিক কন্সট্রাক্ট (sense genetic construct) বলা হয়। আর তা থেকে যে m-RNA তৈরি হয় তাকে বলা হয় সেন্স m-RNA। জিন প্রকৌশলীরা প্রোটিন তথা এনজাইমকে অবদমন করার জন্য এমন এক প্রকার জিন ব্যবহার করতে পারে যাকে বলা হয় এন্টিসেন্স জিন (antisense gene)। এটি এক ধরনের DNA উপাদান বা খণ্ড যার একটি নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চল রয়েছে এবং প্রোটিন নির্দেশ করার তথ্যাবলিও রয়েছে কিন্তু তা পূর্বেকার প্রোটিনের হুবহু উল্টো প্রতিকৃতি। এ ধরনের জিন বা DNA খণ্ড টমেটো গাছে ঢুকিয়ে দিলে তা থেকে যে m-RNA তৈরি হয় তাকে বলা হয় এন্টিসেন্স m-RNA। সেন্স m-RNA এবং এন্টিসেন্স m-RNA এর গঠন প্রকৃতি এমন যে দুটি একত্রে পাশাপাশি এলে একটি আর একটিকে বেঁধে ফেলে অবলীলায়। ফলে প্রোটিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং ফলে তৈরি হয় না এনজাইম। বন্ধ হয়ে যায় বিক্রিয়া আর বন্ধ হয় ইথিলিন উৎপাদন। অনির্বাযভাবে বিলম্বিত হয় টমেটো পেকে যাবার বিষয়টি। এরকম এন্টিসেন্স প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বন্ধ করা হয় ACC সিনথেজ এনজাইমকে। উদ্ভিদে ইথিলিন উৎপাদন পদ্ধতি এবং এন্টিসেস প্রযুক্তির মাধ্যমে ইথাইল উৎপাদন বন্ধা করার কৌশল যথাক্রমে চিত্র ১০.১ ও চিত্র ১০.২ এ দেওয়া হলো।

চিত্র ১০.১ : ফলের মধ্যে ইথিলিন তৈরির প্রক্রিয়া

ইথাইলিন উৎপাদন বন্ধ হয় বলে তৈরি হয় বিলম্বিত পরিপক্বতা স্বভাবের টমেটো। এরকম এন্টিসেন্স ট্রান্সজেনিক টমেটো ফল ২০°C তাপমাত্রায় রেখে দিলে দেখা যায় অনেক দিন লাল হয় না এবং নরমও হয় না কিন্তু এতে ধীরে ধীরে হলুদ বা কমলা রঙ দেখা দেয়।

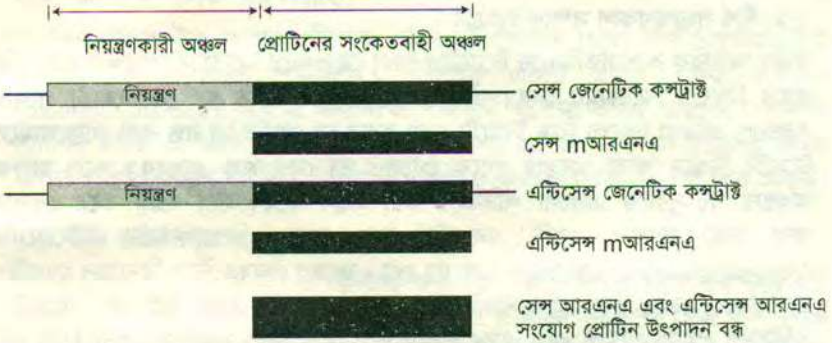

চিত্র ১০.২: এন্টিসেন্স প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ইথিলিন উৎপাদন বন্ধ করা

এমন কি গাছে রেখে দিলে ট্রান্সজেনিক টমেটো সহজে নরম হয় না এবং এর লাল বর্ণও তৈরি হয় না। অবশ্য বাইরে থেকে ইথিলিন প্রয়োগ করলে আবার ছয় দিনের মধ্যেই টমেটো ফল স্বাভাবিক রকমের পেকে যায়। এন্টিসেন্স প্রযুক্তিতে সৃষ্ট ট্রান্সজেনিক টমেটো হলো পৃথিবীর প্রথম ট্রান্সেজেনিক বা জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল। আর সে টমেটোর নাম দেয়া হয় "ফেভার সেভার" (FAVR SAVR)। ১৯৯৪ সালে তৈরি হয় এ ফসলটি। ১৯৯৬ সালে শেষ হয় এর মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

কেবল যে ACC সিনথেজকে এন্টিসেন্স প্রযুক্তি দিয়ে অবদমন করা হয়েছে তাই নয় বরং এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে অবদমন করা হয়েছে ACC অক্সিডেজ এনজাইমকেও। আর এ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ হয়েছে কেবল টমেটোতে তা কিন্তু নয়। আপেল, কলা, বাধাঁকপি, বাঙিতেও এর সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

সারণি ১০.১ : টমেটোতে পরিপক্বতা বিলম্বিতকরণ ও দীর্ঘ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত জিন

ফসল	জিন
টমেটো	ACC ডিএমিনেজ, ACC অক্সিডেজ, ACC সিনথেজ, এসিটোলেকটেট সিনথেজ, গ্যালাকটোনেজ, পেকটিন ইস্টারেজ, পলিগ্যালাকটোইউরোনেজ সেমেজ (SAMase), SAM ট্রান্সফারেজ, ট্রান্সক্রিপশনাল একিটভেটর।

ইথিলিন উৎপাদন কমিয়ে আনার জন্য আরও কৌশলও রয়েছে। অন্য আর একটি কৌশল হলো মেথিওনিন থেকে ইথিলিন উৎপাদন হবার মাঝখানে যে দুটি রাসায়নিক যৌগ SAM এবং ACC তৈরি হয়– এগুলোর যে কোনো একটিকে অথবা দুটিকেই ভেঙে দিতে সক্ষম তেমন এনজাইম উৎপাদনকারী জিন টমেটোতে সংযোজন করা। S-এডিনোসিল মেথিওনিন হাইড্রোলেজ বা ACC ডিএমিনেজ এনজাইম উৎপাদনকারী জিনের সংযোজন ঘটিয়ে বিলম্বিত করা যায় ইথিলিন উৎপাদন।

২.১. দীর্ঘ সংরক্ষণকাল সম্পন্ন টমেটো

উদ্ভিদ আণবিক বংশগতিবিদগণ টমেটোর পচন রোধ করে টমেটোর সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি করার বিষয়টি বিবেচনায় নেন। তাঁরা ভাবলেন যদি এমন হয় যে টমেটো পাকার সবগুলো প্রক্রিয়া চললো কিন্তু টমেটো নরম হবার যে পদ্ধতি তা বন্ধ করা গেল তাহলে টমেটো উদ্ভিদে থাকা অবস্থায় পেকে গেলেও তা বেশ শক্ত থাকবে। ফলে অক্ষত অবস্থায় দূর-দূরান্তে এগুলো পরিবহন করা সম্ভব হবে। ফল নরম করে ফেলার জন্য দায়ী হলো– একটি এনজাইম যার নাম পলিগ্যালাকটো ইউরোনেজ (polygalacturonase) সংক্ষেপে বলা হয় PG। ফলের কোষপ্রাচীরে বিদ্যমান পেকটিন উপাদানকে ভেঙে দেয় এ এনজাইমটি। ফলে সহজেই নরম হয়ে যায় টমেটো। এন্টিসেন্স প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এমন একটি জিন টমেটোতে সংযোজন করা হলো যার RNA সহজেই বেঁধে ফেলে PG জিন থেকে নির্মিত RNA-কে। ফলে আর তখন তৈরি হয় না PG। আর তাতে নরম হয় না টমেটো সহজে। অনেক দিন শক্ত থাকে টমেটো। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেও তৈরি করা হয়েছে জিএম টমেটো।

২.২. ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ধান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, প্রতি বছর ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে অন্ধত্ববরণ করে পাঁচ লক্ষ শিশু এবং ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মারা যায় ৬০০০ মানুষ। ধান আমাদের শর্করা খাদ্যের যোগান দেয়। পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক লোকের শর্করার উৎস হলো ধান। ফলে ধানের মধ্যে ভিটামিন 'এ' উৎপাদনের কৌশল তথা জিন ঢুকিয়ে দেয়া হলে তা বিশ্বের একটি বড় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে বলে জিন বিজ্ঞানীরা ধানকে বেছে নেয়। ডেফোডিল ফুল থেকে দুটি জিন আর ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন নিয়ে ধানে ঢুকিয়ে দেয়া হয় তিনটি জিনই। ফলে ধানের সস্যে (endosperm) তৈরি হচ্ছে ভিটামিন 'এ'-এর আঁধার ক্যারোটিন। ক্যারোটিনের উপস্থিতির জন্য চালের রঙ হয়ে যাচ্ছে অনেকটা গাজরের বর্ণের মতো সোনালি বা হলদে সোনালি। এ কারণেই এ ধানকে বলা হয় 'সোনালি ধান' (golden rice)।

২.৩. অধিক সংরক্ষণ কালসমৃদ্ধ ফুল

ঘরে ফুল রেখে দিলে দ্রুত তা শুকিয়ে যায় এবং এর গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। ফুলে ইথিলিন তৈরি হয় বলে ঘরে রাখা ফুল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ইথিলিনের জৈব সংশ্লেষণ রোধ করা

গেলে ফুল অধিক সময় ধরে ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হয় । ইথিলিন উৎপাদন যেন বিলম্বিত হয়, সেজন্য ACC সিনথেজ বা ACC অক্সিডেজ যে কোনো একটি এনজাইম উৎপাদন বন্ধ করলেই চলে। এভাবে তৈরি করা জিএম ফুল সংরক্ষণ করলে বেশ ক'দিন বেশি রেখে দেয়া যায় ঘরে। এ ধরনের ফুলের আবাদ করার প্রক্রিয়া চলছে কোনো কোনো দেশে।

২.৪. ওলিয়েক এসিডসমৃদ্ধ সয়াবিন

সয়াবিন ফসলে উচ্চ মাত্রার ওলিয়েক এসিড উৎপাদনের লক্ষ্যে জিন সংযোজন করা হয়েছে জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে। ওলিয়েক এসিড একটি একক অসম্পৃক্ত (monounsaturated) চর্বি যা অন্যান্য প্রাণিজ চর্বি অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর। সাধারণ সয়াবিন জাতে ওলিয়েক এসিডের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ । নতুন উদ্ভাবিত জিএম ওলিয়েক এসিডসমৃদ্ধ সয়াবিনে ওলিয়েক এসিডের মাত্রা শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক।

২.৫. উচ্চ লরেটসমৃদ্ধ ক্যানোলা

লরিক এসিড (lauric acid) উৎপাদনের জন্য জিন ক্যানোলাতে সংযোজন করে সৃষ্টি করা হয়েছে অধিক মাত্রায় লরেটসমৃদ্ধ ক্যানোলা। এ নতুন ক্যানোলা তেল খাদ্য শিল্পে চকলেটর বাইরে আবরণ তৈরি করা, কফিকে সাদাকরণ ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এমনকি কসমেটিক শিল্পেও এর ব্যবহার করা হয়। ক্যানোলাতে উচ্চ মাত্রায় ওলিয়েক এসিড উৎপাদনের লক্ষ্যে জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে জিন সংযোজন করা হয়েছে। ওলিয়েক এসিডসমৃদ্ধ সয়াবিনের মতো বাজারে এগুলোরও বাড়তি চাহিদা রয়েছে।

Acc ... 15.2.52

একাদশ অধ্যায়

ফুলের বর্ণ, গন্ধ, গঠনকাঠামো ও সংরক্ষণকাল পরিবর্তন

১. ফুলের বর্ন, গন্ধ ও সংরক্ষণকাল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট

ফুলের বাহারি বর্ণ, কাঠামোগত বৈচিত্র্য আর এর আমোদে গন্ধ সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। সেজন্যই আনন্দের দিনে যেমন দুঃখের দিনেও তেমনি ফুল আমাদের প্রয়োজনে আসে। আমাদের নান্দনিক চেতনায় ফুলের জন্য রয়েছে আশ্চর্য টান। সে জন্যই মানুষ খুঁজে ফেরে আরও ভিন্ন রকম ফুল, ভিন্ন বর্ণের ফুল। মানুষ চায় একই ফুলের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ। কখনো একই ফুলে নানা বর্ণচ্ছটা। কখনো তার চাওয়া একই ফুলের ছোট বড় আর মাঝারি আকৃতি।

ফুল মানুষ ঘরে রেখে দেয় তার মনোহর রূপ আর গন্ধের জন্য। মানুষ চায় অনেক দিন ধরে সংরক্ষিত থাকুক ফুল ঘরে। অনেক দিন বিলিয়ে যাক তার গন্ধ। নানা বর্ণের ফুলের চাহিদা গোলাপে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বর্ণ। নানা আকৃতির ফুলের চাহিদা মেটাতে গাঁদা ফুল আজ কত না আকৃতির পাওয়া যায়। ফুলের গঠন কাঠামো পাল্টাতে, এর নতুন নতুন বর্ণ তৈরির জন্য উদ্ভিদ প্রজননবিদ এবং উদ্যানতত্ত্ববিদগণ নিরলস কাজ করে চলেছেন। নানারকম ফুলের জাত সৃষ্টির কাজ চলছে পৃথিবীর নানা দেশে। প্রচলিত পদ্ধতিতে অনেক জাতের ফুলও তৈরি করেছে মানুষ। অনেক সাফল্যের পাশাপাশি প্রচলিত জাতের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। ফুলের বর্ণ গন্ধ আর আকার আকৃতির জন্য দায়ী নানা উপাদান। প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি উপাদানের রূপান্তর ঘটাতে গেলে প্রায়শই পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্য কোনো উপাদান। নির্দিষ্ট করে কেবল বর্ণ, কেবল গন্ধ কিংবা কেবল আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো খুবই কষ্টসাধ্য, কখনও কখনও আবার তা অসম্ভবও।

এসব কঠিন আর অসম্ভব কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে আধুনিক জীব প্রযুক্তি। জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ এখন কেবল একটি নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করছে অন্য সব গুণাগুণকে অপরিবর্তিত রেখে। কখনও অন্য গাছের জিন ঢুকিয়ে দিয়ে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে যাচিত বর্ণ, গন্ধ বা কাঠামোগত বৈচিত্র্য। কখনও এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো ধাপকে দাবিয়ে রেখে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে বিরল সব বর্ণ। আজ সম্ভব হয়েছে কমলা রঙয়ের পিটুনিয়া আর নীল বর্ণের গোলাপ তৈরি করা। আণবিক ফুল প্রজনন কেবল যে ফুলের এসব চিরায়ত বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে তা নয় ফুল গাছ হয়ে উঠছে নানা রকম কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণু প্রতিরোধী। পাল্টে যাচ্ছে ফুলের সংরক্ষণকাল।

২. ফুলের বর্ণ

ফুলের বর্ণ মূলত নির্ধারিত হয় বর্ণীল অ্যান্থোসায়ানিন যথা- হলুদ বর্ণের চালকন (chalcone), নীল এবং রক্তাভ বর্ণের ডেলফিনিডিন (delphinidin), লাল বর্ণের

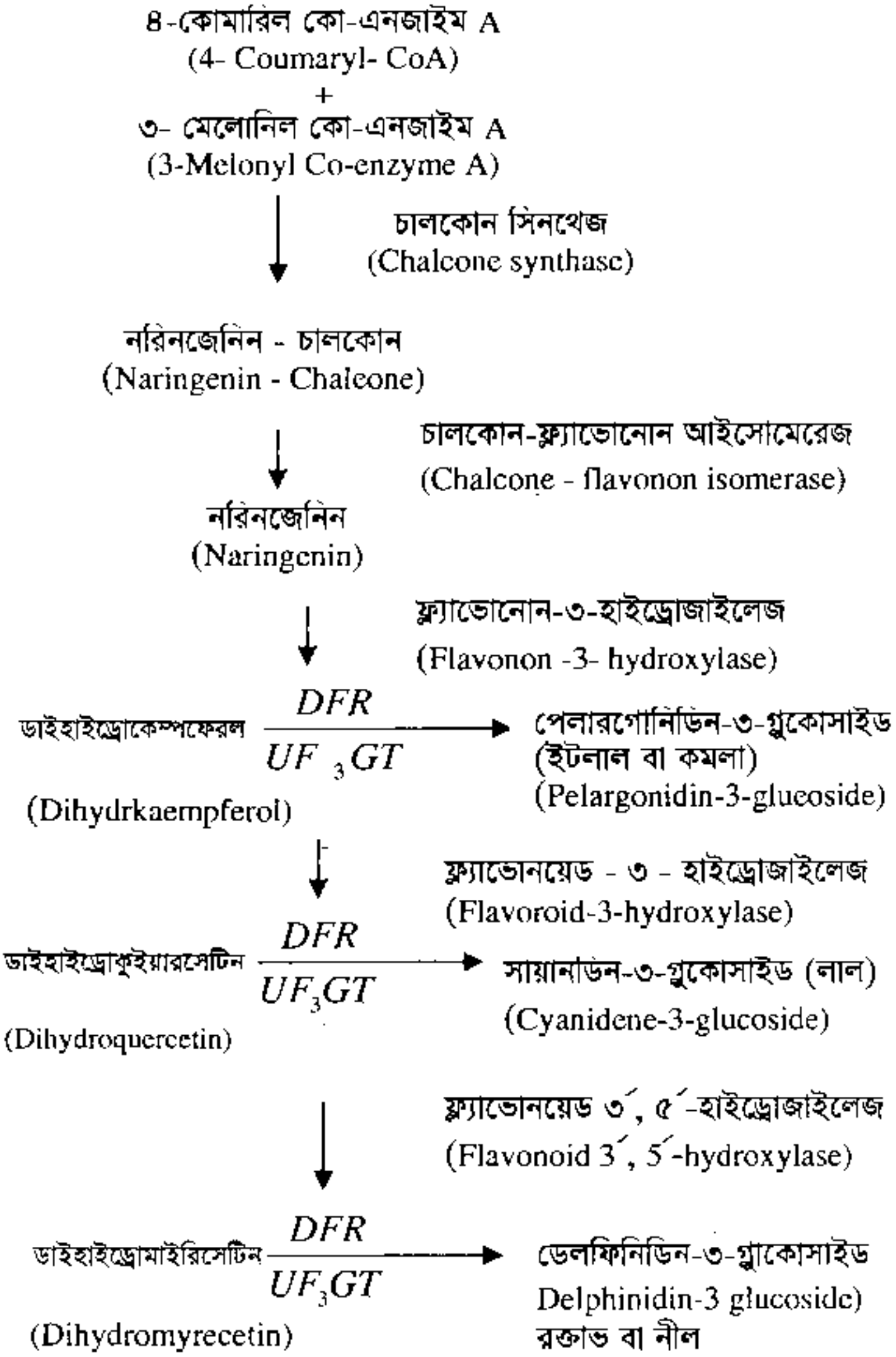

চিত্র ১১.১ : প্রধান ধাপসহ অ্যান্থোসায়ানিস পথক্রম

DFR-ডাইহাইড্রোফ্ল্যাভোনোন-৪-রিডাকটেজ (Dihydroflavonon-4-reductase)
UF_3GT- ফ্ল্যাভোনোয়েড-৩-o-গ্লুকোসিল ট্রান্সফারেজ (Flavoroid-3-0- glucosyl transferase)

সায়ানিডিন (cyanidin), কমলা বর্ণের পেলারগুনিডিনস্ (pelargonidins) দিয়ে এবং বর্ণহীন ফ্লেভানোন (flavanone) ও নারিনজেনিন (naringenin) এর আপেক্ষিক উপস্থিতি দিয়ে। বর্ণীল বিজ্ঞানীরা এখন অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) সংশ্লেষণের ধাপগুলো জেনে গেছে । ফিনাইলএলানিন দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়ে এটি ফিনাইল প্রোপানয়েড (phenyl propanoid) পথক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। *Agrobacterium* কে ব্যবহার করে অথবা জিন বন্দুক (gene gun) দিয়ে এখন অনেক উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে। ফুলে বর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানীরা এখন জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছেন। ফুলের বর্ণে রূপান্তর ঘটানোর জন্য অনেকগুলো বিকল্প পথ রয়েছে। সেগুলো হলো–

১) অ্যান্থোসায়ানিন জীবসংশ্লেষণ পথক্রমের এক বা একাধিক জিনের প্রকাশকে অবমান করে,

২) কোনো একটি নির্দিষ্ট জিনের অতিপ্রকাশ ঘটিয়ে একটি নির্দিষ্ট রঞ্জক উৎপাদন করে,

৩) হেটেরোলোগাস জিনের (heterologous gene) প্রকাশ ঘটিয়ে কোনো একটি অভিনব (novel) রঞ্জক উৎপাদন করে,

৪) অ্যান্থোসায়ানিন জীবসংশ্লেষণ পথক্রমের কিছু জিনের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশুদ্ধ সাদা ফুল তৈরির জন্য অ্যান্থোসায়ানিন সংশ্লেষণ বন্ধ করা সম্ভব। এর জন্য চালকন সিনেথেজ উৎপাদনের জন্য দায়ী জিনটিকে বন্ধ করে দিতে পারলেই চলে। এ রকম জিন আলাদা করে নিয়ে তা ফুল গাছে সংযোজন করে বিশুদ্ধ সাদা ফুল পাওয়া গেছে। পিটুনিয়াতে চালকন সিনথেজ জিনকে ব্লক করে দিয়ে তুলনামূলকভাবে হালকা রঙিন ফুল পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ সাদা পিটুনিয়া ফুল অবশ্য পাওয়া গেছে অ্যান্থোসায়ানিন উৎপাদনে সেন্স প্রতিবন্ধকতা (sense suppression) সৃষ্টি করে। চন্দ্রমল্লিকা, *Gerbera*, গোলাপ ইত্যাদি ফুলেও পাওয়া গেছে বিশুদ্ধ সাদা বর্ণ।

চালকন সিনথেজ জিনের পরিবর্তে অ্যান্থোসায়ানিন উৎপাদন বন্ধ করার জন্য ফুল গাছে সন্নিবেশন করা হয়েছে ডাইহাইড্রোফ্ল্যাভোনোল-৪-রিডাকটেজ (DFR) জিন। এর ফলে বর্ণীলতা অনেক গুণ কমে গেছে। কিছু ফুল একেবারে সাদাও পাওয়া গেছে। পিটুনিয়াতে সাধারণত কমলা রঙের ফুল সৃষ্টি হয় না। হয় DFR জিনের অনুপস্থিতি নয়তো ত্রুটিপূর্ণ DFR জিনের উপস্থিতি কমলা রঙ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। Gerbera এবং ভুট্টার DFR জিন পিটুনিয়াতে সংযোজন করে পাওয়া গেছে ইট লাল থেকে কমলা রঙের ফুল। এসব ফুল গাছ থেকে অনেকবার বাছাই করে পাওরা গেছে কমলা রঙের পিটুনিয়া ফুল। নেদারল্যান্ডের গবেষকরা উজ্জ্বল কমলা রঙের পিটুনিয়া ফুল গাছের বাণিজ্যিক আবাদ নিশ্চিত করেছে। চন্দ্রমল্লিকায়ও উজ্জ্বল কমলা রঙের ফুল তৈরির কাজ বহুদূর এগিয়েছে।

ফুল গবেষকদের একটি বড় চাহিদা হলো নীল ফুল তৈরি করা। ফুলের নীল বর্ণ সৃষ্টি হয় যদি তা অ্যান্থোসায়ানিন ডেলফিডিন বিদ্যমান থাকে। তবে নীল বর্ণ সৃষ্টির জন্য অন্যান্য সহরঞ্জকেরও (co-pigments) ভূমিকা রয়েছে। কোষস্থ গহবরের pH

এরও কিছু ভূমিকা রয়েছে । অধিকাংশ নীল ফুলে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে যা রূপান্তরিত হয়ে গেলে পরে এর সাথে যুক্ত হয় ফ্ল্যাভানোল এবং ফ্ল্যাভোন। যে ফুল গাছ ডেলফিনিডিন তৈরি করতে পারে না তারা নীল ফুলও তৈরি করতে পারে না কারণ; এসব ফুল গাছে এনজাইম ফ্ল্যাভোনয়েড-৩´-৫´-হাইড্রোক্সজাইলেজ (F 3´ 5´ H) তৈরি হয় না। এ এনজাইমটি ডাইহাইড্রোকেম্পফেরেলকে ডাইহাইড্রোমাইরিসটিনে রূপান্তর করে যা পরবর্তীকালে দুটি এনজাইম ডাইহাইড্রোফ্ল্যাভানোল-৪-রিডকটেজ এবং অ্যান্থোসায়ানিন সিনথেজ দিয়ে যথাক্রমে লিউকোডেল ফিনিডিন এবং ডেলফিনিডিনে রূপান্তরিত হয়। পিটুনিয়া থেকে এসব জিন আলাদা করে নিয়ে বেশ ক'টি ফুল গাছে সংযোজন করা হয়েছে। জিএম পিটুনিয়া তৈরি করা হয়েছে F 3´ 5´ H জিনটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে। এদের পাপড়িতে এ জিনটির প্রকাশ ঘটায় পাপড়ি হয়েছে বেগুনি। এসব বেগুনি পাঁপড়িতে তৈরি হয় ডেলফিনিডিন। জিএম বেগুনি Carnation অস্ট্রেলিয়াতে 'Moondust' নামে বাণিজ্যিকভাবে আবাদ হচ্ছে।

৩. ফুলের গন্ধ

ফুলের গন্ধ মানুষকে আকুল করে। গন্ধযুক্ত ফুল তাই মানুষের কাছে আরও বেশি প্রিয়। গন্ধযুক্ত গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, টিউলিপ বা অর্কিড অনেকের খুব বেশি প্রিয়। অনেক ফুলের গন্ধ না থাকলেও রয়েছে মনোহরা রূপ। এদের মনোহরা রূপের সাথে একটু খানি সুগন্ধ যোগ করা গেলে এসব ফুলের মূল্য আরও কত বেড়ে যেত। কাজটি যে সহজ তা কিন্তু নয়। বহু রহস্য জানা দরকার এ কাজে সফল হতে হলে। এ পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। আজ এ বিষয়ে সফল না হতে পারলেও পুষ্প বিজ্ঞানীরা এ রকম লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ফুলের গন্ধ একটি জটিল বৈশিষ্ট্য। এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে অনেক উদ্বায়ী অ্যারোমেটিক যৌগ। এসব রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনের পথ পরিক্রমা এখনও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানীদের জানা হয়নি। গন্ধবিশিষ্ট এসব কিছু কিছু যৌগ উৎপাদনের উপায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে। টারপোনয়েড একটি গন্ধবিশিষ্ট যৌগ। এর উৎপাদনের উপায় এখন বিজ্ঞানীরা জেনে গেছে । এ ক্ষেত্রে যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে এক দশকের মধ্যে গন্ধহীন অনেক ফুল গন্ধযুক্ত হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

৪. ফুলের গঠনকাঠামো

ফুলের মূল কাঠামোটি পরিবর্তন করার জন্যও আজকাল জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। পাঁপড়ি হলো ফুলের প্রধান আকর্ষণ। পাঁপড়ি কত বড় হবে অথবা তা কতটা ছোট হবে, পাঁপড়িগুলো কতটা বৃত্তে সজ্জিত থাকবে অথবা পাঁপড়ির বিন্যাস কি হবে সেসবই এখন গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব গবেষণা লব্ধ ফলাফল এখন কাজে লাগাচ্ছে বিজ্ঞানীরা। এখন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে নানা ধরনের পাঁপড়ি সজ্জাবিশিষ্ট ফুলের গাছ। যে গাছে অল্প ক'টি মাত্র ফুল হতো গাছের শীর্ষে তাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে ভিন্নতর রূপে। এখন অনেক দিন ধরে গাছটি লম্বা হতে থাকবে, আর গাছে ফুল ধরতে থাকবে । অল্প ফুল ধরত যে গাছে এখন অনেক ফুল তাতে ধরবে।

৫. ফুলের সংরক্ষণকাল

ফুল এখন অনেক রকম আনন্দ উৎসব আর সুখ-দুঃখের সময় ব্যবহৃত হয়। ফুলের ব্যবসাও তাই এখন রমরমা সারা পৃথিবী জুড়েই। ফুল দিয়ে যারা ঘর সাজায় কিংবা টবে যারা কাঁচা ফুল সংরক্ষণ করতে চায় অধিক সময় ধরে ফুলের সৌন্দর্য আর গন্ধ যারা উপভোগ করতে চায় তাদের জন্য একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো ফুলের সংক্ষিপ্ত সংরক্ষণকাল। অতি অল্প সময়েই শুকিয়ে যায় ফুল, ঝরে যায় পাঁপড়ি, গন্ধ যায় মিলিয়ে। সে কারণেই জিন প্রযুক্তিবিদদের বিষয়টি নজরে এসেছে । ফুলের দ্রুত বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়াটাকে পাল্টে দিতে বিজ্ঞানীরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । তারা ইথিলিন তৈরির প্রক্রিয়াটাকে বিলম্বিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, কারণ এ রাসায়নিক পদার্থটির জৈবসংশ্লেষণ ফুলের বয়োপ্রাপ্তি ঘটায়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে পেল যে দুটি এনজাইমের যে কোনো একটিকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারলেই ফুলের বয়োপ্রাপ্ত হওয়া বিলম্বিত হবে। এর একটি হলো ACC (1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid) সিনথিজ আর অন্যটি হলো ACC অক্সিডেজ। এদের যে কোনো একটির সংশ্লেষণ বন্ধ করার জন্য ফুল গাছে একটি জিন ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জিনটি তৈরি করে একটি বার্তাবাহক RNA যা এর সাথে বেঁধে ফেলে ACC সিনথেজ বা ACC অক্সিডেজ জিনের বার্তাবাহক RNA কে। এর ফলে বার্তাটি আর বাহিত হতে পারে না। ফলে এনজাইমটি তৈরি হওয়ারও প্রশ্ন আসে না। এভাবে অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে ইথিলিন উৎপাদন এবং ফুল অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানে এসব ফুলের আবাদও শুরু হয়ে গেছে।

ফুল উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে মানুষের আপত্তি খুব বেশি থাকার কথা নয়। সরাসরি খাওয়া হয় না বলে এর গ্রহণযোগ্যতা অধিক হওয়ার কথা। ফুল প্রেমিকদের জন্য জিন প্রযুক্তি তাই আশির্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টি

১. জিন প্রযুক্তি ও হাইব্রিড জাত

এখন থেকে ৯০ বছর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভিদ প্রজননবিদ জর্জ শাল (George Shull)। ভুট্টা ফসল উন্নয়নের ধারাটাকে সম্পূর্ণই পাল্টে দেন এবং ভুট্টা ফসলসহ অন্যান্য বহুরকম ফসল উন্নয়নের একটি চমৎকার মডেল উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞানী শাল এটি আবিষ্কার করেন যে, ভুট্টার দুটি ভিন্নরকম ইনব্রিড লাইনের মধ্যে সঙ্করায়ন করা হলে হাইব্রিড উদ্ভিদ সঙ্কর তেজ বা সঙ্কর সাবল্য (hybrid vigour) প্রদর্শন করে। অর্থাৎ সে সময় কৃষকগণ যেসব ভুট্টার আবাদ করছিল যুক্তরাষ্টে তার চেয়ে হাইব্রিড উদ্ভিদ শতকরা ২০ ভাগ বা তারও অধিক ফলন প্রদান করে। বিষয়টি কিন্তু নজর কাড়ে তাবৎ পৃথিবীর কৃষি বিজ্ঞানীদের। বিশেষ করে উদ্ভিদ প্রজনন দিয়ে যাদের কর্মকাণ্ড তাদের তো বটেই। ভুট্টা ফসলের জন্য হাইব্রিড জাত সৃষ্টি করাও অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়লো। কারণ ভুট্টা গাছের পুরুষ আর স্ত্রী ফুল আলাদা । সহজেই এদের নিয়ন্ত্রিতভাবে সঙ্করায়ন করা যায়। ফলে সহজে হাইব্রিড জাতের বীজ প্রতি বছর তৈরি করা যায় ।

২. ফসলে হাইব্রিড সৃষ্টি

অধিকাংশ ফসলেই হাইব্রিড সেই ফসলের প্রচলিত জাত অপেক্ষা শতকরা ১০-২০ ভাগ অধিক ফলন দেয়। ফলে বিজ্ঞানীরা অন্যান্য ফসলেও হাইব্রিড জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড শুরু করে। তবে হাইব্রিড বীজ সৃষ্টির কাজ সব ফসলে এতটা সহজ নয় যেমনটি করা সম্ভব হয়েছে ভুট্টা ফসলে। কারণ অধিকাংশ ফসলে একই গাছে একই ফুলে অবস্থান করছে পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ। এসব ফসলের ক্ষেত্রে হাইব্রিড বীজ তৈরি করতে হলে পরাগায়নের পূর্বেই পুরুষ জননাঙ্গটি সযত্নে সরিয়ে দিতে হয়। কিছু কিছু ফসলের বুনো আধাবুনো আত্মীয় প্রজাতি থেকে ফসলে নানা কৌশলে পুংবন্ধ্যাত্ব (male sterility) স্বভাবটি নিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। এসব অল্প কিছু ফসলে এখন বাণিজ্যিকভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। কিন্তু অনেক ফসল রয়েছে যাদের সঙ্কর সাবল্য রয়েছে কিন্তু উপযুক্ত পুংবন্ধ্যাত্ব কৌশল এগুলোর মধ্যে স্থানান্তর করা যাচ্ছে না বলে হাইব্রিড জাতের সুফলও ভোগ করা যাচ্ছে না।

৩. হাইব্রিড সৃষ্টিতে জিন প্রযুক্তি

বিজ্ঞানীরা হাইব্রিড বীজ সৃষ্টির এরকম একটি সমস্যায় যখন পড়ে গেলেন সে সময় জিন প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের একটি চমৎকার পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এবং ব্যালজিয়ামের প্ল্যান্ট জেনেটিক সিস্টেম হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের যুগান্তকারী একটি জিন প্রযুক্তিগত কৌশল সৃষ্টি করেছেন। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা দুটি কাজ করেছেন। একটি হলো, ফসলে নির্দিষ্ট একটি জিন ঢুকিয়ে দিয়ে

সৃষ্টি করা হলো পুংবন্ধ্যাত্ব স্বভাবটি। সেই ফসলের অন্য আর একটি জাতে, যাকে হাইব্রিড তৈরির সময় পুরুষ প্যারেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অন্য আর একটি জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যার পরাগরেণু উড়ে এসে পুংবন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দেয় এবং তৈরি হয় হাইব্রিড বীজ।

৪. *Barnase* জিন সংযোজন

জিন প্রকৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করে পুংবন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি এবং উর্বরতা প্রত্যার্পন (fertility restoration) করা হয়েছে বেশ কয়েকটি উদ্ভিদ প্রজাতিতে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে ভুট্টা এবং তেলবীজ রেপ (*Brassica napus*)। তেলবীজ রেপ এ পুংবন্ধ্যাত্বের ভিত্তি হলো কোষবহিঃস্থ RNA নিউক্লিয়েজ (RNA nuclease) যাকে *Barnase* বলা হয়। একটি ব্যাকটেরিয়াম *Bacillus amyloliquefaciens* এই *Barnase* এনজাইমটি উৎপাদন করে। এ *Barnase* এনজাইমটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কোষীয় বিষাক্ত পদার্থ। ব্যাকটেরিয়া থেকে *Barnase* জিনটি কর্তন করে নেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে এবং এটিকে তামাকের একটি টিস্যু নির্দিষ্ট (tissue specific) জিনের প্রোমোটার TA 29 এর সাথে জুড়ে দিয়ে উদ্ভিদে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এ প্রমোটারটি পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণুর উৎপাদন হয় যে স্থানটিতে সে স্থানটি অর্থাৎ ট্যাপেটামে (tapetum) জিনটির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। ফলে *Barnase* ট্যাপটামকে নষ্ট করে দেয় ও পুংরেণুকে বন্ধ্যা করে ফেলে। *Agrobacterium* এর মাধ্যমে TA 29 - *Barnase* জিনটিকে ঢুকিয়ে দেয়া হয় রেপ উদ্ভিদ জেনোমে এবং রেপ উদ্ভিদ জিনের উৎপাদ (product) *Barnase* এনজাইমের বিষক্রিয়ায় ফুল পুংবন্ধ্যা হয়ে যায় (চিত্র ১২.১)।

৫. *Barstar* জিন সংযোজন

কোনো গাছকে পুংবন্ধ্যা করে ফেললেই কিন্তু সব কাজ শেষ হলো না। পুংবন্ধ্যা গাছের সাথে পুংউর্বর গাছের ক্রসের পরে F_1 বীজ যেন উর্বর হয় সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। একই ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ *B. amyloliquefaciens* এ পাওয়া গেল আরেকটি জিন যাকে বলা হয় *barstar* জিন। *barstar* হলো একটি অন্তঃকোষীয় প্রোটিন যা *Barnase* এর ঘাতক প্রভাবের বিপক্ষে কাজ করে। অর্থাৎ *Barnase* যেন *barstar* এর উপস্থিতিতে অকার্যকর হয় সে ব্যবস্থাটি করে। *Barstar* জিনের উৎপাদ (product) বেঁধে ফেলে *Barnase* জিনের উৎপাদকে এবং তৈরি করে একটি জটিল বস্তু যা RNA নিউক্লিয়েজ অর্থাৎ *Barnase* কে কাজ করতে দেয় না। *Barstar* আসলে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব *Barnase* এর বিপক্ষে প্রতিরক্ষা প্রদান করে থাকে।

কোনো স্বাভাবিক গাছে *barstar* জিন ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, গাছটি উর্বর পরাগরেণু তৈরি করছে এবং তা গাছে কোনো প্রকার অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করছে না এবং ট্যাপেটামে কোনো *barstar*ও তৈরি হচ্ছে না। এরকম ট্রান্সজেনিক গাছ সহজেই হোমোজাইগাস অবস্থায় রক্ষা করা যায়। যখন একটি হোমোজাইগাস *barstar* হোমোজাইগাস পুংউর্বর লাইনকে *Barnase* জিনসমৃদ্ধ পুংবন্ধ্যা লাইনের সাথে ক্রস করা হয় তখন সব সন্তানই পুং-উর্বর হয়। এরকম উর্বরতার কারণ *barstar* প্রোটিন *Barnase* নিউক্লিয়েজের সাথে যুক্ত হওয়ায় নিউক্লিয়েজটি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

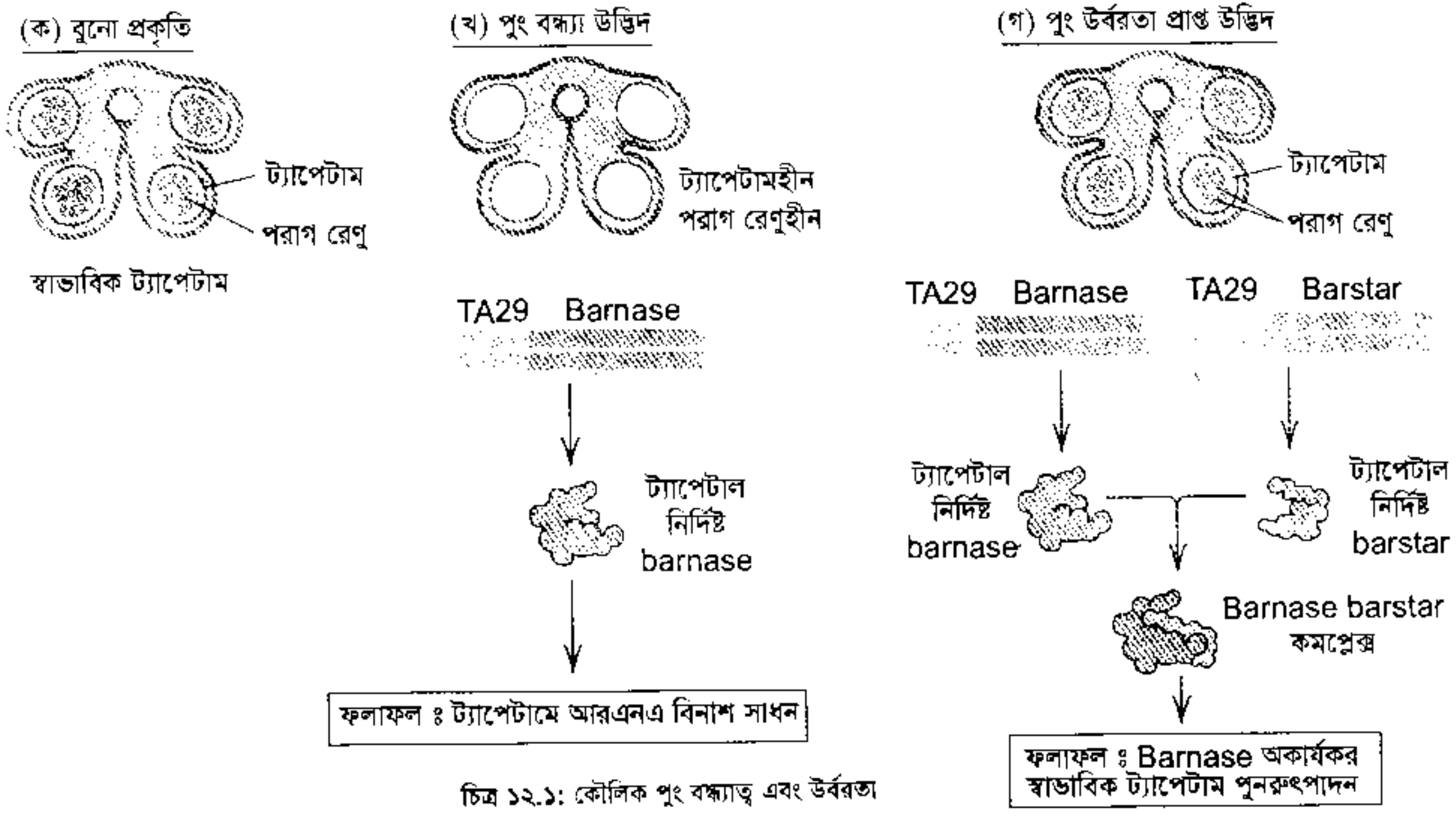

চিত্র ১২.১: কৌলিক পুং বন্ধ্যাত্ব এবং উর্বরতা

ক) পাতলা আবরণী সমৃদ্ধ ট্যাপেটাল কোষের মধ্যে পরাগরেণু উৎপাদন;
খ) *Barnase* RNA নিউক্লিয়েজের উপস্থিতিতে ট্যাপেটাল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং উদ্ভিদ পুংবন্ধ্যা হয়ে গেছে;
গ) ট্যাপেটাল কোষে *barstar* সৃষ্টি হওয়ায় *Barnase* অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং ফলে পুংউর্বরতা ফিরে এসেছে।

B. napus গাছের স্বাভাবিক বুনো উদ্ভিদের ফুল, পরাগধানী এবং পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদের সাথে *Barnase* জিনসমৃদ্ধ পুংবন্ধ্যা গাছের এবং *Barnase* ও *barstar* জিনসমৃদ্ধ গাছের ফুল, পরাগধানী এবং পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদের তুলনা করলে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় (চিত্র ১২.২)। বুনো উদ্ভিদের ফেনোটাইপ উপস্থাপন করা হলো (চিত্র ১২.২–এর ক–খ)।

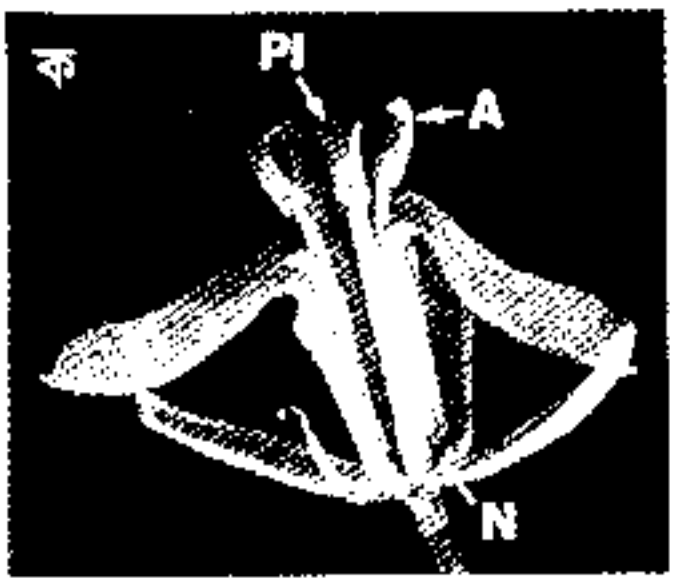

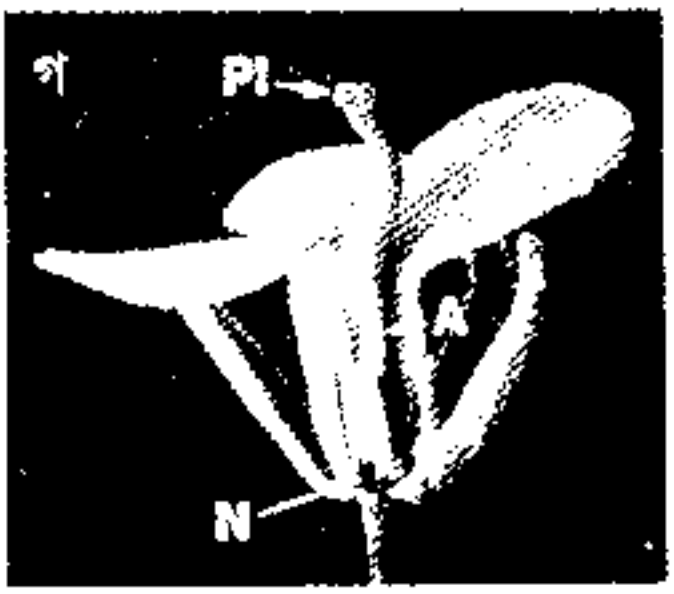

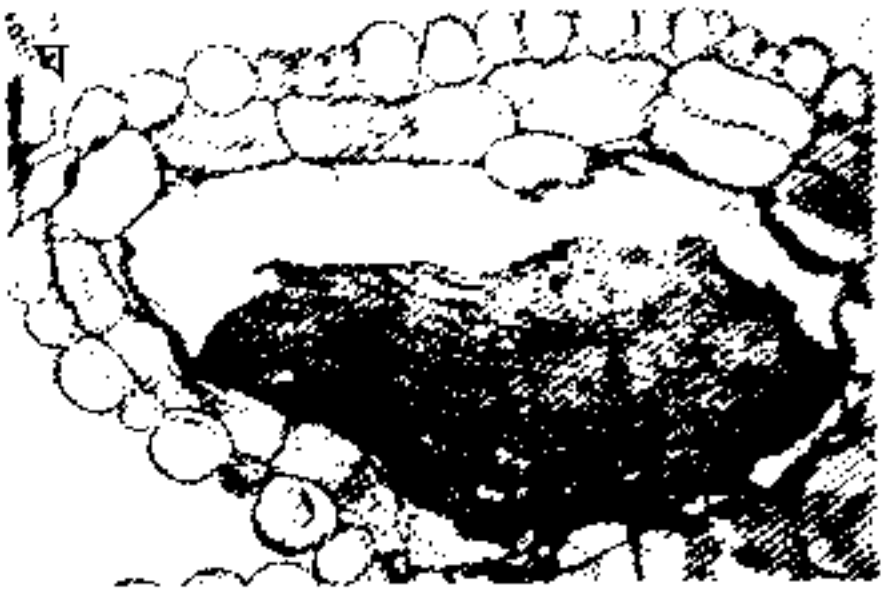

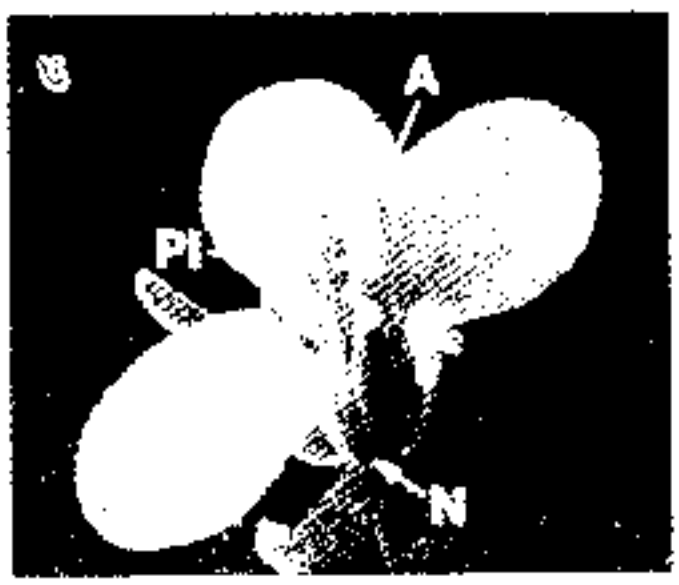

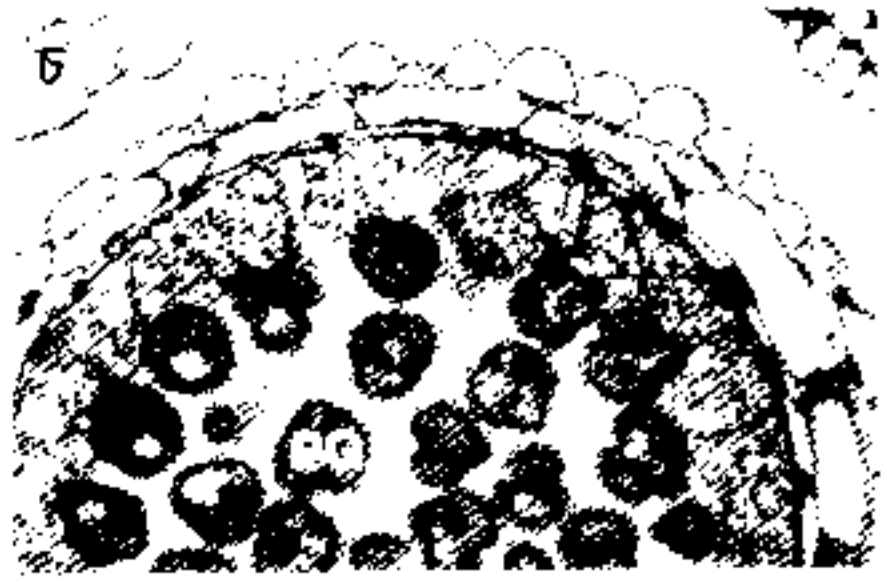

চিত্র ১২.২ : ক, গ, ঙ ও ঙ তিনটি তেলবীজ রেপ-এর ফুল এবং পরাগধানীর লম্বচ্ছেদ (খ, ঘ ও চ)।

জেনোটাইপগুলো হলো–

খ - বুনো প্রকৃতির ; গ ও ঘ - TA 29 - *Barnase* ; ঙ ও চ - TA 29 - *Barnase* + TA 29 - *barstar* বুনো ফুলের পরাগরেণু (খ) এবং *Barnase* ও *barstar* সমৃদ্ধ ফুলের পরাগরেণু (চ) এবং এ দু'রকমের ফুল (ক ও ঙ) হুবহু একই রকমের।

পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদে অসংখ্য পরাগরেণু (PG) দেখা যায়। গ ও ঘ তে প্রদর্শিত চিত্র দুটি হলো TA 29 - *Barnase* সমৃদ্ধ পুংবন্ধ্যা গাছ যেগুলোর পরাগধানী ক্ষুদ্র, কুচকানো এবং পরাগরেণু শূন্য। চিত্র ঙ ও চ তে প্রদর্শিত ফুল এবং পরাগধানী যার মধ্যে রয়েছে *Barnase* এবং *barstar* উভয় জিন-এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পরাগরেণু। বুনো গাছে এবং শেষোক্ত গাছের ফুল ও পরাগরেণুতে কোনো পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়নি।

কোনো পুংবন্ধ্যাত্ব সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে যদি হাইব্রিড বীজ তৈরি করতে হয়, তবে এর জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সেগুলো হলো-

ক. কার্যকর পুং-উর্বরতা প্রত্যর্পণকারী ব্যবস্থা;

খ. পুংবন্ধ্যা সারির সহজ রক্ষণাবেক্ষণ;

গ. পুংবন্ধ্যা সারি থেকে পুং-উর্বর সহজে অপসারণ;

ঘ. উদ্ভিদের উপর পুংবন্ধ্যাত্বের কোনো বিরূপ প্রভাব না থাকা;

ঙ. বিভিন্ন পরিবেশে স্থায়ীভাবে পুংবন্ধ্যাত্ব প্রদর্শন;

চ. F_1 হাইব্রিডের সন্তোষজনক ফলাফল;

Barnase এবং *barstar* সিস্টেমটি এসব শর্তাবলি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ সিস্টেমটি এখন বেশ কিছু ফসলে কাজে লাগিয়ে হাইব্রিড বীজ তৈরির গবেষণা এগিয়ে চলছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আণবিক ফার্মিং

১. ভূমিকা

ন্যূনতম দশ হাজার বছর ধরে মানুষ নানারকম ফসলের আবাদ শুরু করেছে। এর মধ্যে মানুষ পেয়েছে অনেক নতুন ফসল। ফসলের অনেক আগাছা ফসলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার কোনো কোনো ফসল আগাছায় পরিণত হয়েছে। এরই মধ্যে কোনো কোনো ফসল এতটাই সফল হয়েছে যে, এগুলোর বিস্তার ঘটেছে পৃথিবীর নানা দেশে। এদেরই কোনো কোনো ফসল এখন পৃথিবীর মানুষের কাছে বাঁচা মরার ফসল হিসেবে পরিণত হয়েছে। যুগে যুগে মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে নানারকম ফসলের চাহিদা বেড়েছে। আবার ব্যবহারের বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবাদ কম হতো– এমন ফসলের আবাদও বাড়ছে। ফলে আজ যে ফসল অনাদরে অবহেলায় জন্মাচ্ছে আগামী দিন নতুন প্রেক্ষাপটে অন্যরকম প্রয়োজনে সে ফসলও হয়ে উঠতে পারে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। জিন প্রযুক্তির বহুমাত্রিক প্রয়োগ আর মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে কখন যে কোনো ফসল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

২. ফসলের অন্যরকম ব্যবহার

জিন প্রকৌশল তথা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আজ এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো ফসলকে। এতদিন ফসলের আবাদ করা হতো তা থেকে খাদ্য, তন্তু বা জ্বালানি পাবার লক্ষ্যে। এখন কোনো কোনো ফসল আবাদ করা হচ্ছে এগুলোর এক একটি গাছকে ক্ষুদে এক একটি কারখানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। নির্দিষ্ট কোনো রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করার জন্য বোনা হচ্ছে ফসল। এসব রাসায়নিক পদার্থ যেমন শিল্প কারখানায় ববহৃত হতে পারে, তেমনি ওষুধ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হতে পারে। আণবিক কৌশল প্রয়োগ করে ফসলে নির্দিষ্ট জিন ঢুকিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ তৈরির লক্ষ্যে ফসলের আবাদকে আণবিক ফার্মিং (Molecular farming বা Molecular pharming) বলা হয়, বাংলায় যাকে এক সাথে বলা হয় আণবিক ফার্মিং। গাছকে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করে আগামী দিনে তৈরি করা হবে নানারকম জৈব রাসায়নিক পদার্থ, এনজাইম, শ্বেতসার, স্নেহজাতীয় পদার্থ, আমিষ এবং চিকিৎসার জন্য নানারকম উপকরণ। আগামী দিনে আণবিক ফার্মিং শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকেই বদলে দিতে পারে।

ফসল নানারকম জৈব রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে কাঁচামালকে নানারকম রাসায়নিক পদার্থে রূপ দিতে সক্ষম। গাছের বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু উৎপাদনের জৈব সংশ্লেষণের পথগুলো যত জানা সম্ভব হবে তত সহজে বিক্রিয়ার নানা স্থানে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন নতুন উৎপাদ পাওয়া সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে গোলআলু টমেটো আর কলাতে এরকম

পরিবর্তন তৈরি করছে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ। আর এসব যৌগ ব্যবহৃত হচ্ছে নানাভাবে (সারণি ১৩.১)। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদে নানারকম যৌগ উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন । ইতোমধ্যে আণবিক ফার্মিং-এর জন্য যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তা হলো-

ক) কলকারখানার জন্য এনজাইম উৎপাদন, যেমন- আলফা এমাইলেজ, ফাইটেজ;
খ) তৈলবীজে ভিন্নরকম এবং উত্তম চর্বি উৎপাদন, যেমন- জিএম কেনোলাতে অধিক মাত্রায় লরিক এসিড উৎপাদন;
গ) সাইক্লোডেক্সট্রিন (cyclodextrin) উৎপাদন;
ঘ) জীবভঙ্গুর (biodegradeble) প্লাস্টিক, যেমন- পলিহাইড্রেক্সিবিউটাইরেট (polyhydroxybutyrate);
ঙ) বাণিজ্যিকভাবে এবং চিকিৎসা শিল্পে ব্যবহার উপযোগী নানারকম গৌণ মেটাবোলাইটস্ (secondary metabolites) যেমন- স্কোপোলামিন (scopolamine) ও অন্যান্য অ্যালকালয়েড;
চ) চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ পলিপেপটাইড, যেমন- এন্টিভাইরাল প্রোটিন, ট্রাইকোসেনথিন (trichosanthin) ইত্যাদি;
ছ) অনেক অউদ্ভিজ্জ (non-plant) প্রোটিন, যেমন- হিউম্যান ইন্টারফেরন (human interferon), হিউম্যান নিউরোপেপটাইড (human neuropeptide), সেরাম এলবুমিন (serum albumin), ইমিউনুগ্লোনস্ (immunoglubins);
জ) এন্টিবডি (Antibody);
ঝ) এন্টিজেন (Antigen), যেমন-ভেকসিন।

৩. কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার উৎপাদন

উদ্ভিদ বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান বহুরকম কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে। সবচেয়ে সুলভ কার্বোহাইড্রেট হলো সেলুলোজ আর শর্করা। এগুলোর উৎপাদন ও গুণমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ওলিগোফ্রুকটান (oligofructan), সাইক্লোডেক্সট্রিন (cyclodextrin) এবং ট্রেহ্যালেজ (trehalas) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও এ প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হচ্ছে (সারণি ১৩.১)। এক জাতের গোলআলুর জিন অন্য চাষযোগ্য গোলআলুতে স্থানান্তরে করে পাওয়া গেছে অধিক পরিমাণ শর্করা। *Klebsiella pneumoniae* থেকে সাইক্লোডেক্সট্রিন গ্লাইকোসিল ট্রান্সফারেজ (Cyclodextrin Glycosil Transferase, CGT) জিন গোলআলু গাছে স্থানান্তর করে দেখা গেছে যে, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড গোলআলুতে অধিক পরিমাণ সাইক্লোডেক্সট্রিন উৎপাদিত হচ্ছে। ফ্রুকট্যান অল্প ক'টি মাত্র উদ্ভিদে প্রজাতিতে তৈরি হয়। খাদ্য শিল্পে এটি ব্যবহার করা হয়। সুক্রোজ ফ্রুকটোসিল ট্রান্সফারেজ (Sucrose Fructosil Transferase) এবং ফ্রুকটোস ফ্রুকটোসিল ট্রান্সফারেজ (Fructose Fructosil Transferase) এনজাইম জিন গোলআলু আর সুগারবিটে সংযোজন করে দেখা গেছে যে, এসব ফসলের কোষ গহ্বরে তৈরি হচ্ছে ফ্রুকটান।

সারণি ১৩.১ : কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড উৎপাদনের জন্য আণবিক ফার্মিং

যৌগ	জিনের উৎস	প্রয়োগ	ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ
কার্বোহাইড্রেট			
এমাইলোজমুক্ত শর্করা	গোলআলু	খাদ্য, শিল্প	গোলআলু
উচ্চ এমাইলোজ শর্করা	গোল আলু	খাদ্য, শিল্প	গোলআলু
সাইক্লোডেক্সট্রিন	*Klebsiella pheumoniae*	খাদ্য, ওষুধ	গোলআলু
ফ্রুকটান	*Bacillus subtilis* জেরুজালেম আর্টিচোক	শিল্প	তামাক, গোলআলু, ভুট্টা, সুগারবিট
ট্রেহালোজ	*E. coli*	খাদ্য	তামাক
লিপিড			
মাঝারি শৃঙ্খল যুক্ত ফ্যাটি এসিড	*California bay tree*	খাদ্য, ডিটারজেন্ট, শিল্প	তেলবীজ রেপ
সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	*Brassica rapa*	খাদ্য	তেলবীজ রেপ
মনো-অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	ইঁদুর	খাদ্য	তামাক
পলিহাইড্রোক্সি বিউটাইরেট	*Alcaligenes eutrophus*	জীবভঙ্গুর প্লাস্টিক	*Arabidopsis*, সয়াবিন, তেলবীজ রেপ, তুলা

৪. লিপিডের গুণমান বৃদ্ধি

প্রধান প্রধান তেল উৎপাদী ফসলগুলোতে রয়েছে পামিটিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড, ওলিয়েক এসিড, লিনুলেয়িক এসিড এবং লিনুলেনিক এসিড যাদের দৈর্ঘ্য C_{16} বা C_{18} (সারণি ১৩.২)। নারিকেল এবং পামতেলের গঠন মূলত C_8 - C_{14}। এগুলোর তেলে রয়েছে লরিক এসিড (১২ : ০) যা সাবান, কসমেটিক এবং ডিটারজেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ফসলে অ্যাসাইল বাহক প্রোটিন দিয়ে (Acyl Carrier Protein, ACP) বা ACP কে ACP থায়োএস্টারেজ নামক এনজাইম দিয়ে ভেঙে দিলে তৈরি হতে পারে লরিক এসিড (চিত্র ১৩.১)। 'ক্যালিফোরনিয়া বে' (California bay) নামক বৃক্ষ থেকে এ ACP থায়োএস্টারেজ জিন তেলবীজ রেপ ফসলে সংযোজন করে বীজে পাওয়া গেছে উচ্চ মাত্রার লরিক এসিড।

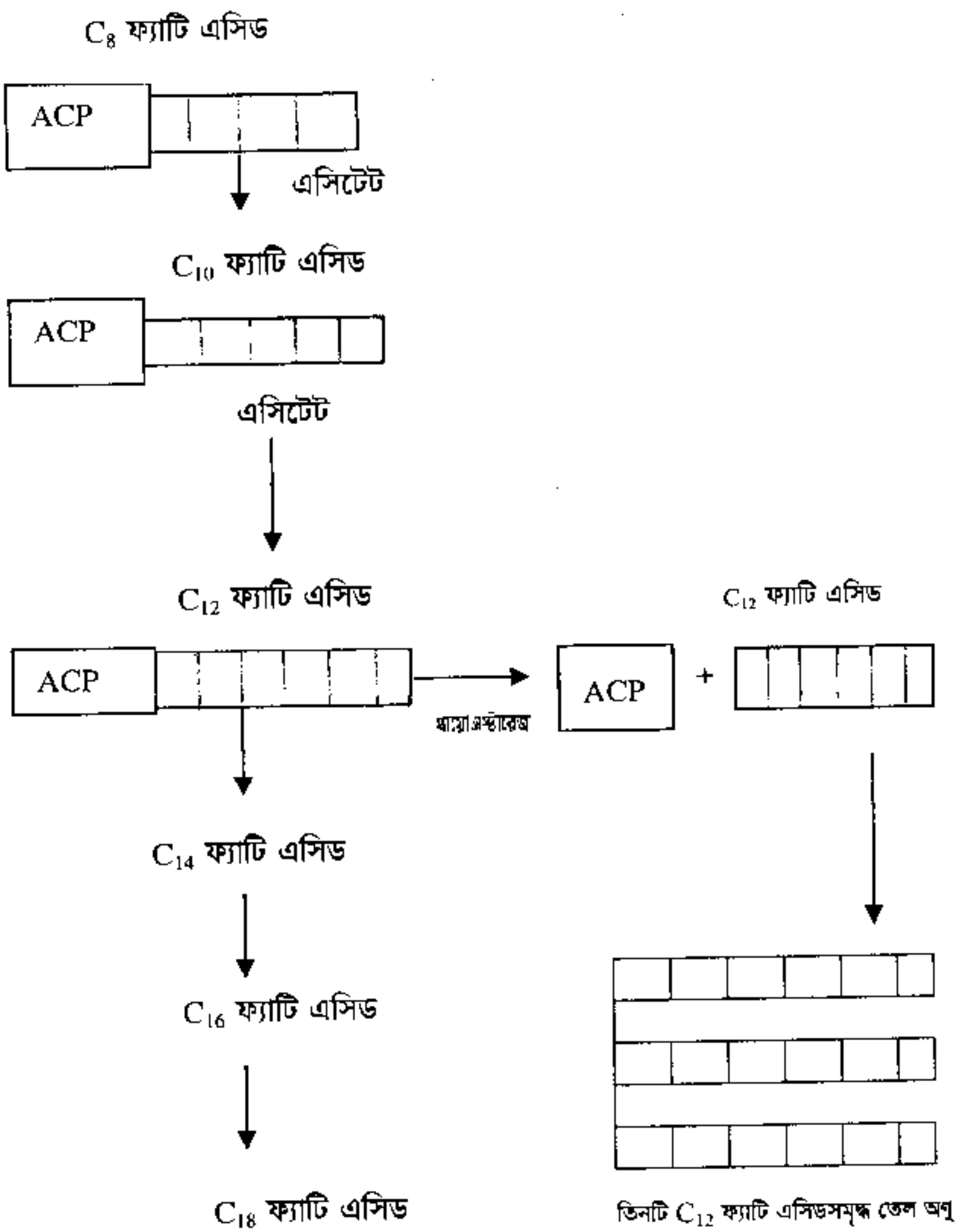

চিত্র ১৩.১ : ফ্যাটি এসিড এবং তেল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। থায়োএস্টারেজ এনজাইম সঠিক স্থানে অ্যাসাইল ক্যারিয়ার প্রোটিন (ACP) কে বিযুক্ত করে দিয়ে C_{12} ফ্যাটি এসিডসমৃদ্ধ লরিক এসিড উৎপাদন করে।

সারণি ১৩.২ : প্রধান প্রধান তেল ফসলসমূহের ফ্যাটি এসিড গঠন কাঠামো

ফ্যাটি এসিড	সয়াবিন	পাম	রেপবীজ (LEAR)	সূর্যমুখী তেল	বাদাম
১৬ : ০	১১	৪২	৪	৫	১০
১৮ : ০	৩	৫	১	১	৩
১৮ : ১	২২	৪১	৬০	১৫	৫০
১৮ : ২	৫৫	১০	২০	৭৯	৩০
১৮ : ৩	৮	০	৯	০	০
২০ : ১	০	০	২	০	৩
অন্যান্য	১	০	২	০	০

LEAR, নিম্ন ইরেউসিক এসিড রেপ

৫. প্লাস্টিক উৎপাদন

কৃত্রিম প্লাস্টিকের একটি বড় অসুবিধা এই যে, এগুলো অক্ষয় অবস্থায় প্রকৃতিতে থেকে যায়। অণুজীব কৃত্রিম প্লাস্টিককে ভেঙে ফেলতে অক্ষম। উদ্ভিদকে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করে জীববিনাশক্ষম প্লাস্টিক বা বায়োপ্লাস্টিক উৎপাদন করার বিষয়টি ভাবছেন বিজ্ঞানীরা। অণুজীবীয় গাজনের মাধ্যমে এখন এ বস্তুটি তৈরি করা হচ্ছে। তবে উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উদ্ভিদে প্লাস্টিক উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। বায়োপ্লাস্টিক উৎপাদনকারী রাসায়নিক পদার্থ পলিহাইড্রক্সিএ্যালকানোয়েটস্ (PHA) উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলো (চিত্র ১৩.২) নিচে উপস্থাপন করা হলো।

এসিটাইল- COA
(Acetyl- COA)

↓ ৩- কিটোথায়োলেজ (3- Ketothiolase)
(phb A জিন)

এসিটুএসিটাইল - COA
(Acetoacetyl-COA)

↓ এসিটোএসিটাইল- COA রিডাকটেজ
(*phb B* জিন)
(Acetoacetyl - COA Reductase)

β- হাইড্রক্সিবিউটাইরিল- COA
(β- Hydroxybutyryl- - COA)

↓ PHB সিনথেজ
(*phb C* জিন)

পলিহাইড্রাক্সাবউটাইরেট
(Polyhydroxybutyrate)

চিত্র ১৩.২ ঃ পলিহাইড্রক্সিবিউটাইরেট সংশ্লেষণ পথক্রম

মনসান্তো (Monsanto)-এর এক দল বিজ্ঞানী PHB জীব সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি জিন *phb A, phb B* ও *phb C* একটি ব্যাকটেরিয়া *Ralstonia eutropha* থেকে আলাদা করে নিয়ে একত্রে সংযুক্ত করে একটি বীজ নির্দিষ্ট প্রোমোটারের সাথে জুড়ে দিয়ে তেলবীজ রেপ-এ সংযোজন করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এসিটাইল COA কে ফ্যাটি এসিড জীবসংশ্লেষণের পথে যেতে না দিয়ে- একে বায়োপ্লাস্টিক উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়া। জিন সংযোজনের ফলে পরিপক্ব তেলবীজ লিউকোপ্লাস্টে PHB জমা হতে দেখা গেছে। এখনও বাণিজ্যিকভাবে এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করার পর্যায়ে আসেনি বটে, তবে ভবিষ্যতে এটি বায়োপ্লাস্টিক উৎপাদনের একটি চমৎকার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬. প্রোটিন উৎপাদন

বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদকে এখন এনজাইম এবং উচ্চ মূল্যমানের প্রোটিন তৈরির কারখানা হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা করছে । এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রোটিন উৎপাদনে আশাতীত সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। হিরুডিন (hirudin) এক প্রকার পেপটাইড যা থ্রোমবোসিস চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর। বর্তমানে এটি পাওয়া যায় এক প্রকার জোঁক *Hirudo medicinalis* এর লালা গ্রন্থিতে। কিন্তু এর পরিমাণ এত অল্প যে এর ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গাছে নির্দিষ্ট জিন সংযোজন করে হিরুডিনের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করা যায় কি-না তা নিয়ে ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। *Brassica napus* প্রজাতির উদ্ভিদে একটি কৃত্রিম জিন সংযোজন করে দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে হিরুডিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন যেমন ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে হিউম্যান সেরাম এলবুমিন (HSA) এবং হিউম্যান ইন্টারফেরন (INF) সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে । চিকিৎসার ক্ষেত্রে HSA এর বেশ কদর রয়েছে। তাই এর বাণিজ্যিক মূল্য অনেক। অণুজীবে অধিক মাত্রায় এ প্রোটিন উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না বিধায় উদ্ভিদকে কারখানা হিসেবে ব্যবহারের প্রশ্ন উঠেছে। ট্রান্সজেনিক গোলআলুতে শতকরা ০.০২ ভাগ প্রোটিন হিউম্যান সেরাম এলবুমিন পাওয়া গেছে । যথাযথ প্রোমোটার জিনের সাথে জুড়ে দিয়ে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

হিউম্যান ইন্টারফেরন অতিমূল্যবান প্রোটিন। কারণ এগুলো মানুষে ভাইরাস রোগের বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া সহ অন্যান্য প্রাণীর কোষেও তা উৎপাদন করা যায় বটে, তবে ইন্টারফেরন স্বল্পমূল্যে অধিক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদ যে চমৎকার একটি মাধ্যম হতে পারে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কোনো সংশয় নেই। শালগমে জিন সংযোজন ঘটিয়ে পাওয়া গেছে ইন্টারফেরন। ট্রান্সজেনিক তামাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে হিউম্যান ইন্টারফেরন। উপযুক্ত প্রোমোটার ব্যবহার করে উদ্ভিদে ইন্টারফেরন উৎপাদন লাভজনক করা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

৭. শিল্পের জন্য এনজাইম উৎপাদন

নানা রকম শিল্প কারখানায় এখন ব্যাপক হারে এনজাইমের ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমের আনুমানিক মূল্য প্রায় প্রতিবছর দুই বিলিয়ন

ইউ এস ডলার। শিল্পের কাজের জন্য দরকারি দু'টি উদ্ভিদে তৈরি করা হয়েছে দু'রকমের প্রোটিন বেশ অনেক দিন ধরেই। এর একটি হলো- এভিডিন যা মোরগের জিন ভুট্টাতে সংযোজন করে পাওয়া গেছে। আর একটি হলো β- গ্লোকোরুনিডেজ, যা তৈরি করা হয়েছে *E. coh.* এর জিন ভুট্টা গাছে সংযোজন করে দিয়ে। এ দু'টি সাফল্য জিএম উদ্ভিদে প্রোটিন এবং এনজাইম উৎপাদন করার কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে। ২০০২ সালে একটি কোম্পানি প্রোটিন ভাঙতে সক্ষম একটি এনজাইম ট্রিপসিন উৎপাদনের আয়োজন করে। বর্তমানে এর চাহিদা এত বেশি যে প্রচলিত পদ্ধতিতে সে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

উদ্ভিদে এখন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে আরও ক'টি এনজাইম (সারণি ১৩.৩)। জীবীয় ইথানল উৎপাদনে, বস্ত্রশিল্পে, পাল্প এবং কাগজ শিল্পে এবং পশু খাদ্য উৎপাদনে এসব এনজাইমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফাইটেজ এখন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে উদ্ভিদ কোষে। শূকর এবং হাঁস মুরগির খাদ্যে এসব জিএম বীজ অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এগুলোর ফসফেট ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কমে গেছে পূর্বের তুলনায় ফসফেট নির্গমনের হার। এভাবে দিন দিন জিএম ফসল তৈরি করবে আরও বহু রকমের এনজাইম আর প্রোটিন।

সারণি ১৩.৩ : উদ্ভিদে উৎপাদিত এনজাইমের তালিকা

এনজাইম	ব্যবহার
এভিডিন	শনাক্তকারী উপকরণ
β-গ্লোকোরুনিডেজ	শনাক্তকারী উপকরণ
ট্রিপসিন	ওষুধশিল্পে, ক্ষতের উপশম
সেলুলেজ	ইথানল উৎপাদন
জাইনালেজ	জীব ভর প্রক্রিয়াকরণ
ফাইটেজ	ফাইটেট ভাঙন, ফসফেটের ব্যবহার বৃদ্ধি
α-এমাইলেজ	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
β-গ্লুকানেজ	মদ উৎপাদন
লিগনিন পারঅক্সিডেজ	কাগজ উৎপাদন

৮. চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রোটিন

চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তেমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ এখন গাছে জিন সংযোজন করে তৈরি করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। স্তন্যপায়ী জীবে এখন তৈরি হচ্ছে নানারকম এন্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন। এসব এন্টিবডির কোনো কোনোটা এখন পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা গেছে কোনো কোনো উদ্ভিদে (সারণি ১৩.৫)। দাঁতের ক্ষয়রোধ ও ক্যানসারের ক্ষেত্রে কোনো কোনো এন্টিবডি বেশ সফল বলে দেখা গেছে।

ভক্ষণযোগ্য ভ্যাকসিন উৎপাদন জিন প্রযুক্তির আর একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। কম খরচে স্থায়ীভাবে উদ্ভিদে ভ্যাকসিন উৎপাদন করা সম্ভব বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ এবং প্রাণীকে রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু ভাইরাস প্রতিরোধী ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে (সারণি ১৩.৪)।

সারণি ১৩.৪ : জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদে উৎপাদিত ভ্যাকসিন

উৎপত্তি	রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন	উদ্ভিদ	উৎপাদনের মাত্র
মানুষ			
E. coli	এন্টেরোটক্সিন B	তামাক	০.০০১%
Vibrio cholerale	কলেরা Ctox A এবং Ctox B উপএকক	গোলআলু	০.৩%
হেপাটাইটিস B	এনভেলপ সার্ফেস প্রোটিন	তামাক/গোলআলু	<০.১%
নরওয়াক ভাইরাস	ক্যাপসিড প্রোটিন	তামাক/গোলআলু	০.২৩%
র‍্যাবিস ভাইরাস	র‍্যাবিস ভাইরাস গ্লাইকোপ্রোটিন	টমেটো	১%
প্রাণী			
ফুট এন্ড মাউথ ভাইরাস	ভাইরাস ইপিটিকা vp1	আলফাআলফা/ *Arabidopsis*	পরিমাণ অজানা
পর্সিন	ভাইরাস গ্লাইকোপ্রোটিন	তামাক/ভুট্টা	০.২%
মিল্ক এন্টেরিটিস ভাইরাস	ভাইরাস ইপিটজ vp 2	ব্ল্যাকিয়েড শিম	পরিমাণ অজানা
ক্যানিন পার্ভোভাইরাস	vp2 হতে পেপটাইড ক্যাপসিড প্রোটিন	*Arabidopsis*	৩%

সারণি ১৩.৫ : উদ্ভিদে উৎপাদিত কিছু এন্টিবডির উদাহরণ

প্রয়োগ	উদ্ভিদ	এন্টিবডি
ইম্পিউনোগ্লোবিউলিন		
Streptcoccus mutans SA I/II (দাঁতের ক্যারিস)	তামাক	SI g A (হাইব্রিড)
পৃষ্ঠদেশ এন্টিজেন (কোলন ক্যানসার)	তামাক	IgG Co 17 - 1A
হার্পেস সিমপ্লেক্স ভাইরাস	সয়াবিন	IgG (anti HSV-2)
একক শৃংখল ভেরিয়েবল ফ্রেগমেন্ট		
লিম্ফোমা	তামাক	sc Fv
কার্সিনো এমব্রায়োনিক এন্টিজেন (ক্যানসার)	দানা শস্য	sc Fv

অন্যান্য প্রোটিন যেগুলোর ঔষুধি মূল্য রয়েছে তেমন গাছে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রোটিনও উৎপাদন করা হয়েছে। বেশ কিছু জীবীয় ওষুধ (biopharmacueticals)

তৈরি করা হয়েছে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে (সারণি ১৩.৬)। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে গাছকে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করে আগামী দিনগুলোতে এমনই অনেক জৈব রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা হবে ।

সারণি ১৩.৬ : উদ্ভিদ থেকে উৎপাদিত জীবীয় ওষুধের উদাহরণ

রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন	উৎপত্তি	উদ্ভিদ	প্রয়োগ
প্রোটিন সি	মানুষ	তামাক	জমাটরোধী
হিরুডিন	*Hirudo medicinalis*	ক্যানোলা	জমাটরোধী
সোমাটোট্রোপিন	মানুষ	তামাক	বৃদ্ধি হরমোন
β-ইন্টারফেরন	মানুষ	ধান/শালগম/ধান	হেপাটাইটিস B + C রোগের চিকিৎসা
সেরাম এলবুমিন	মানুষ	তামাক	পোড়া/তরল পুনঃস্থাপন
হিমোগ্লোবিন α এবং β	মানুষ	তামাক	রক্তের বিকল্প
হোমোট্রাইমেরিক কুলাজেন	মানুষ	তামাক	কুলাজেন
α1- এন্টিট্রিপসিন	মানুষ	ধান	কুলাজেন
এপ্রোটিনিন (ট্রিপসিন প্রতিরোধক)	মানুষ	তুলা	ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি
লেক্টোফেরিন	মানুষ	গোলআলু	অণুজীবরোধী
ACE	মানুষ	তামাক/টমেটো	হাইপার টেনশন
এরিথ্রোপোয়েটিন	মানুষ	*Arabidopsis*/ক্যানোলা	অপিয়েট
ট্রাইকোসেনথিন-α	*Trichosanthes kirilowii*	তামাক	HIV থেরাপি, ক্যানসার

চতুর্দশ অধ্যায়

আগামী দিনের জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

১. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের ভবিষ্যৎ

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়েছে ১৯৯৬ সালে। অর্থাৎ জিএম ফসল চাষের এক যুগ মাত্র পূর্তি হয়েছে। জিএম ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আগামী দিনগুলোতে ব্যবহার করা হবে– এরকম জিনের উৎস যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও। ফসল উন্নয়নে কত রকমের প্রয়োগ জিন প্রযুক্তির হতে পারে আজকের প্রেক্ষাপটে তা হয়তো অনুমান করাও কঠিন। পৃথিবীর এত বেশি গবেষণাগারে এখন জিন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে যে আগামী দিনের জিএম ফসল যে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে হবে এটি অনুমান করা চলে।

দানাশস্য, সবজি, ফল, আঁশজাতীয় ফসলসহ নানা রকম ফসল উন্নয়নে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিন প্রযুক্তি। অনেক ফসলের জিএম উদ্ভিদ নিয়ে চলছে প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলছে মাধ্যমিক পর্যায়ের যাচাই বাছাই। অন্য কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে আবার চলছে বাণিজ্যিক আবাদের লক্ষ্যে ছাড়পত্র দেয়ার জন্য শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা। সুতরাং পাইপ লাইনে রয়েছে নানা ফসলের নানা স্তরের জিএম ফসল। আগামী দিনগুলোতে এগুলোর কোনো কোনোটা চলে আসবে কৃষকের মাঠে, আমাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে কোনো কোনটি আমাদের জানা সত্ত্বেও, কোনো কোনোটি আবার আমাদের অজান্তে নানা খাদ্যের উপকরণ হিসেবে।

ইতোমধ্যে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে অল্প ক'টি ফসলের জিএম জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে যেগুলোর বাণিজ্যিক আবাদও কোনো কোনো দেশে শুরু হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এসব জিএম ফসল মূলত আগাছানাশক, কীট ও ভাইরাস প্রতিরোধিতা অর্জন করেছে। এ তিনটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বহু সংখ্যক দানা শস্য, সবজি, ফল আর আঁশজাতীয় ফসল এখন সৃষ্টি করা হচ্ছে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে। আগামী দিনে নিঃসন্দেহে আরও অনেক দেশে এসব আগাছানাশক, কীট বা ভাইরাস প্রতিরোধী জিএম ফসলের চাষ শুরু হবে। ইদানীংকালে প্রতিরোধী জিনও সংগ্রহ করা হচ্ছে নানা বৈচিত্র্যময় উৎস থেকে। ফলে আগামী দিনের এসব জিএম ফসল কার্যকরভাবে জীবীয় ও অজীবীয় পীড়নের (biotic and abiotic stress) বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষমতা প্রদর্শন করবে এমনটি আশা করা চলে।

২. জীবীয় পীড়নক্ষম ফসল

মাঠে ফসলকে কখনো কখনো জীবীয় ও অজীবীয় দু'রকমের পীড়নই সইতে হয়। তবে এর যে কোনো এক রকমের পীড়ন সইতে হয় প্রায় সব ফসলকেই। জীবীয়

পীড়নের মধ্যে ভাইরাস ছাড়াও রয়েছে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও নেমাটোড। ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী জিএম ফসল সৃষ্টির কর্মকাণ্ড বহুদূর এগিয়েছে। নানা রকম নতুন নতুন কৌশল আর নতুন নতুন উৎস থেকে জিন এনে ফসলে সংযোজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া রোগ প্রতিরোধী কোনো জিএম ফসল বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য অবমুক্ত করা যায়নি। তবে এরকম জিএম ফসলের বেশ ক'টি পুরোগামী লাইন রয়েছে যাচাই বাছাইয়ের শেষ পর্যায়ে। আগামী দিনে এসব ফসলের কোনো কোনটার জিএম জাতের চাষ শুরু হবে।

৩. অজীবীয় পীড়নক্ষম ফসল

ফসলের জীবীয় প্রতিকূলতার পাশাপাশি রয়েছে নানা রকম অজীবীয় প্রতিকূলতাও। দিন দিন বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাড়ছে উষ্ণতা। ফলে ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা আর উপকূলীয় জমির লবণাক্ততা। বৃষ্টির পরিমাণ ও বৃষ্টিপাত ঘটার সংখ্যাও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে দেখা দিচ্ছে খরা। শীত প্রধান দেশের জন্য শৈত একটি বড় বাঁধা। ফসলের উৎপাদনের আর একটি বাঁধা হচ্ছে কোনো কোনো জমিতে ভারী ধাতুর উপস্থিতি। এসব সমস্যা মাথায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে জীবীয় ও অজীবীয় পীড়ন প্রতিরোধী জিএম ফসল। ধানের খরা ও লবণাক্ত প্রতিরোধী জিএম নিয়ে কোনো কোনো দেশে চলছে মাঝারি পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা (চিত্র ৮.১)।

৪. ফসলের গুণগত মানবৃদ্ধি

ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধিতে জিএম প্রযুক্তি আগামীতে বিশাল অবদান রাখবে এটি সহজেই অনুমান করা যায়। বহু জিএম ফসলে বিলম্বিত পরিপক্বতা ঘটায় এমন জিন সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে ফল উৎপাদনকারী সবজি ফসলে এরকম জিন একাধিক উৎস থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এসব জিএম উদ্ভিদ এখন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফসল হিসেবে এগুলোর সফলতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য জন্মানো হচ্ছে। এ চাড়াও জিন প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্রমে ফসলের সঙরক্ষণকাল বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড এগিযে চলছে। কেবল সবজি নয়, ফুল ফসলেও এ নিযে চলছে ব্যাপক গবেষণা। কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যও এসেছে।

বীজ ফসল মানুষ এবং পশু পুষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অল্প ক'টি দানা শস্য গোটা বিশ্বের মোট খাদ্য ক্যালরির শতকরা ৫০ ভাগের অধিক সরবরাহ করে থাকে। একই ভাবে সাতটি দানাদার শিমজাতীয় ফসল আমাদের ক্যালরি গ্রহণের একটি ভালো অংশের যোগানদাতা। দানা শস্যের আমিষ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশের আমিষের চাহিদা পূরণ করে। অথচ দানা শস্যের আমিষে অত্যাবশ্যক একাধিক এমাইনো এসিডের ঘাটতি রয়েছে, যেমন- লাইসিন এবং থ্রিওনিন। শিমজাতীয় ফসলের বীজেও ঘাটতি রয়েছে সালফার অ্যামাইনো এসিডগুলোর। ধানে অবশ্য তুলনামূলকভাবে এমানইনো এসিডের সুষমতা মন্দ নয় কিন্তু এর প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট কম; ফসলের এই যে ঘাটতি তা আজ নানা উৎস থেকে ফসলে জিন সংযোজন করে দিয়ে পূরণ করার সুযোগ এসেছে।

৪.১ ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান

ধানে ভিটামিন 'এ' উৎপাদনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী ইনগো পুত্রিকাস আর পিটার বেয়ার তিন তিনটি জিন ঢুকিয়ে দিয়ে তৈরি করেছে সোনালি ধান। জাপোনিকা এবং ইন্ডিকা উভয় প্রকার ধানেই এখন সংযোজন করা হয়েছে ভিটামিন 'এ' উৎপাদনকারী জিন। ধানে সংযোজন করা হয়েছে আয়রন উৎপাদনকারী জিনও। এমনকি একটি ধানের জাতে ভিটামিন 'এ' এবং আয়রন উৎপাদনকারী জিন একত্রে সংযোজন করা হয়েছে। ফলনের মাত্রা যথাযথ হলে এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য তা হুমকির কারণ না হলে আগামী দিনে এরকম জিএম ধানের জাত ফসলের মাঠে জন্মাবে তেমনটি আশা করা যায় না।

৪.২ আমিষসমৃদ্ধ ফসল

এখন জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ পাল্টে দিতে যাচ্ছে খাদ্যের শ্বেতসার, চর্বি, আঁশ এবং ভিটামিন উপাদানের পরিমাণ ও গুণ। আমিষসমৃদ্ধ দানাশস্য থেকে জিন আলাদা করে নিয়ে এখন তা সংযোজন করা হচ্ছে কম আমিষ যুক্ত অন্য দানা শস্যে। কখনও দানাদার শস্যের আমিষ জিন ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে অন্য কোনো ফসলে। *Amaranth* নামক আমাদের ডাটার এক আত্মীয় প্রজাতি তৈরি করে আমিষসমৃদ্ধ ছোট ছোট বহু দানা। এর দানার আকৃতি ছোট বলে এ ফসলটিকে খুব একটা জনপ্রিয় করে তোলা যাচ্ছে না। সেজন্য এ ফসলের এমারেন্থাস এলবুমিন জিন (Am A 1) সংগ্রহ করে তা গোলআলুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। লক্ষ্য হলো আমিষহীন গোলআলুতে অধিক মাত্রায় আমিষ পাওয়া। ফলাফল বেশ আশাব্যঞ্জক। রুটি বানাবার জন্য উচ্চ গুণমানসম্পন্ন প্রোটিন জিন একটি পুরোনো দিনের গমের জাত থেকে সংযোজন করা হয়েছে গমের আধুনিক জাতে। ফলাফল এখানেও যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

৪.৩ শ্বেতসারসমৃদ্ধ ফসল

শ্বেতসারের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যেও চলছে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ। উচ্চ এমাইলোজ উৎপাদনকারী জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়া থেকে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে গোলআলুর জেনোমে। এতে বেড়েছে গোলআলুর এমাইলোজ উৎপাদনক্ষমতা। অন্য আর একটি জিন গোলআলু গাছে সংযোজন করায় শতকরা ৩৫ ভাগ অধিক শর্করা উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে। উচ্চ মাত্রার সুগার উৎপাদনকারী সয়াবিন জিএম তৈরি করা হয়েছে। শিল্পে ব্যবহারের লক্ষ্যে এখন ফসলে তৈরি করা হচ্ছে সাইক্লোডেক্সট্রিন। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে এখন ফ্রুকটান (fructan) অধিক মাত্রায় তৈরি করা হচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া থেকে ল্যাভেনসুক্রেজ জিন উদ্ভিদে সংযোজন করে অধিক মাত্রায় ফ্রুকটান পাওয়া যাচ্ছে।

আগামী দিনগুলোতে বাজারে আসবে অধিক গুণগত পুষ্টিমান সম্পন্ন জিএম ফসল। টমেটোতে এন্টিঅক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভানয়েডের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। দানা ও শিমজাতীয় শস্যের আমিষের জীবীয় দক্ষতা (biological efficiency) বাড়ানো সম্ভব হবে এক ফসলের জিন অন্য ফসলে সংযোজন করে।

শিমজাতীয় ফসলের জিন দানা শস্যে ঢুকিয়ে অধিক মাত্রায় লাইসিন পাওয়া সম্ভব হবে। ফসলের বীজে বিদ্যমান পুষ্টিমান বিনাসী উপাদানও জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। গমের মতো অনেক শ্বেতসার উৎপাদনকারী ফসলের দানায় বীজ সংরক্ষণশীল আমিয বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। নুডুলস বানাবার উপযোগী করে শর্করা উৎপাদনের লক্ষ্যে শর্করায় নিশ্চয় পরিবর্তন আনা হবে।

৪.৪ নির্দিষ্ট ফ্যাটি এসিড উৎপাদন

পৃথিবীর বেশ কিছু ল্যাবে তেল ফসলে ফ্যাটি এসিডের গঠন রূপান্তরের গবেষণা চলছে। মানুষ এখন কোলেস্টেরল বিষয়ে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। সম্পৃক্ত তেল অপেক্ষা অসম্পৃক্ত তেল স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উত্তম। তেল ফসলে জিন সংযুক্ত করে দিয়ে অধিক মাত্রায় লিনোলেনিক এবং লিনোলেয়িক এসিড সমৃদ্ধ তেল উৎপাদন করতে পারলে তা সহজেই মানুষের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে সরিষার তেলের ব্যবহার হয়ে আসছে আদিকাল থেকেই। এখন মূলত সয়াবিন তেল নির্ভর হয়ে উঠলেও সরিষার তেলকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া হয়নি। সরিষার তেলে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক রয়েছে ইরিউসিক এসিড যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। ইরিউসিক এসিড উৎপাদন করার পূর্বে সরিষার বীজে তৈরি হয় লিনোলেনিক এসিড এবং লিনোলেয়িক এসিড। যদি কোনো জিন সরিষার গাছে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে ইরিউসিক এসিড উৎপাদন টিকিয়ে দেয়া যায় তাহলে বীজে লিনোলোনিক বা লিনোলেয়িক এসিডের পরিমাণ অনিবার্যভাবে বেড়ে যাবে । সেরকম সরিষা যে অনেক কাঙ্ক্ষিত সরিষা হবে তা বলাই বাহুল্য।

শিল্পের জন্য ব্যবহারের লক্ষ্যে আগামী দিনগুলোতে ফ্যাটি এসিডের গঠনে নানারকম রূপান্তর সম্ভব হবে। কোনো কোনো তেল ফসলের আবাদ হবে লরিক এসিড উৎপাদনের লক্ষ্যে, স্টিয়ারিক এসিড বা পামিটোলিয়েক এসিড বা পেট্রোসেলেনিক এসিড কিংবা কখনো অলিয়েক এসিড উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো তেল ফসলের আবাদ করা হবে। মার্জারিন তৈরির লক্ষ্যে তেলে নিয়ে আসা হবে নানা রকম রূপান্তর। কখনও ফ্যাটি এসিডের শৃংখলটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হবে, কখনও আবার ফ্যাটি এসিডের সম্পৃক্ততা আর অসম্পৃক্ততা স্বভাবের রূপান্তর ঘটানো হবে।

৫. আলোকজ্জ্বল জিনসমৃদ্ধ ফসল

মাঠে ফসল ফলাবার জন্য শুকনো মৌসুমে পানি সেচ এখন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সময়মতো ও যথাযথ পরিমাণ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পানি অনেক দেশে এখন আর অপ্রতুল থাকছে না। এক দিকে যেমন পানির উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে সুনির্দিষ্ট সময় কেবল পরিমাণমতো পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঠিক পানি সেচের সময় নির্ধারণের জন্য জেলি ফিশের একটি জিন ঢুকানো হয়েছে একটি ফসলের জাতের উদ্ভিদে। মাঠে কোনো ফসলের জাত আবাদ করার সময় জেলি ফিসের আলোকোজ্জ্বল (luminescent) ঐ জিন সমৃদ্ধ অল্প ক'টি গাছও পাশাপাশি রোপন করে দেওয়া যায়। মাঠে পানির অভাব ঘটলে এ গাছ তার আলোক বিচ্ছুরণ

করে অন্ধকার রাতে পানির অভাবের কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিবে। পানির সংকটপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের জিএম গাছ পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

৬. ফসলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনক্ষম জিন সংযোজন

ফসলের উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ এখন এক অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা। এমন কোনো ফসল নেই যার আবাদের জন্য এখন রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবাহার করা হচ্ছে না। উৎপাদন খরচও বেড়ে যাওয়ায় দিন দিন নাইট্রোজেন সারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো কোনো উদ্ভিদ বায়ুর নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে সক্ষম অণুজীবগুলোর নিজের মূলে আশ্রয় দেয় বলে এগুলোর নাইট্রোজেন সার খুবই অল্প প্রয়োগ করতে হয়। শিমজাতীয় ফসলের (legume) নাইট্রোজেন সংবন্ধনক্ষম জিন শিমজাতীয় নয়– এমন ফসলে (non-legumes) সংযোজন করা গেলে আগামীতে নিসন্দেহে নাইট্রোজেনের একটি সস্তা বিকল্পকে মাঠে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

৭. C_3 উদ্ভিদকে C_4 উদ্ভিদে রূপান্তর

ফসলের ফলনশীলতা বৃদ্ধির একটি বড় উপায় হলো ফসলের সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ফসলের উদ্ভিদাকৃতি পাল্টে দিয়ে ধানে আর গমে ফলন বৃদ্ধির যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। ষাটের দশকে এর মূল কারণ ছিল উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধি। আধা খর্বাকৃতি উদ্ভিদের খাড়া খাড়া পাতা নেতিয়ে পড়া স্বভাবের পাতা অপেক্ষা অনেক বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটাতে সক্ষম ছিল বলে এবং প্রস্তুতকৃত খাদ্যের একটি বড় অংশ দানায় পৌছাতে পারে বলে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। সালোকসংশ্লেষণের জন্য উদ্ভিদের C_4 পথক্রম C_3 পথক্রম অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতার সাথে বায়ুর CO_2 কে কাজে লাগাতে পারে। ভুট্টা গাছের C_4 পথক্রমের প্রধান এনজাইম হলো ফসফোইনোল পাইরুভেট ডিকার্বোক্সাইলেজ (phosphoenol pyruvate dicarboxylase)। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এ এনজাইমের জিনটি ধানে সংযোজন করেছেন জাপানী বিজ্ঞানী Ku এবং তাঁর সঙ্গীরা। ধানের এরকম রূপান্তরিত গাছে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে সালোকসংশ্লেষণ ব্যাহত হওয়া হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধানের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা C_4 পথের আরও দুটি জিনকে ধানে সংযোজন করে দিতে পারলে ফলন আরও বেড়ে যাবে। আর সেটা হবে নিঃসন্দেহে আর এক সবুজ বিপ্লব।

৮. এলার্জিমুক্ত ফসল

কোনো কোনো ফসলে মানুষের এলার্জি সৃষ্টি করার উপাদান 'এলার্জেন' রয়েছে। যেগুলোর সহজে এসব ফসলের উৎপাদিত পণ্য খাবারে ব্যবহার করলে এলার্জি দেখা দেয় সেগুলো অনেকটা কষ্ট করেই এসব খাবার বর্জন করে। আগামী দিনে এলার্জেনকে রোধ করার জন্য জিন প্রযুক্তির প্রয়োগকে নিশ্চয়ই অনেকে স্বাগতম জানাবে। বেগুন আমাদের দেশী ফসল। এদেশে এর উৎপত্তি ঘটেছে। ফলে এদেশে

বেগুনের নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ জাত রয়েছে। লোভনীয় বেগুনের দিকে অনেকটা আড়চোখে চায় আর কষ্ট সংবরণ করে তারা যাদের এলার্জির জন্য বেগুন খাওয়া নিষেধ। বেগুনের এলার্জি ঘটাবার ক্ষমতাটাকে তাড়াতে পারলে তা হয়ে উঠতে পারে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সবজি। বাদামসহ আরও কিছু ফসলে এ এলার্জেনকে অপসারণের লক্ষ্যে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে সয়াবিনের নির্দিষ্ট এলার্জেনকেও শনাক্ত করেছে বিজ্ঞানীরা এবং জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সফলভাবে তৈরি করা হয়েছে রূপান্তরিত সয়াবিন।

৯. ক্যাফেইনমুক্ত কফি

কফি পানীয় হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কফি পায়ীদের জন্য কফির মধ্যে বিদ্যমান 'ক্যাফেইন' স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। জার্মান রসায়নবিদ লুডউইগ রোসেলিয়াজ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কফি থেকে ক্যাফেইন দূর করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এ কৌশল ধীরে ধীরে মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নানা রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে কফিতে তৈরি হয় এ পদার্থটি। রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো ধাপকে বাঁধাগ্রস্ত করে ক্যাফেইন তৈরিকে বন্ধ করা যেতে পারে। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ক্যাফেইনমুক্ত কফি তৈরি হবে আগামীতে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা চলে।

১০. জীবালোকোজ্জ্বল অলঙ্করণ উদ্ভিদ

ফুল ব্যবসা এখন বহু দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। ফুল প্রিয় মানুষ চায় আরও নানা বর্ণের ফুল, নানা আকৃতির গন্ধযুক্ত ফুল। জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ আজ ফুল উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে যাচ্ছে। জীবপ্রযুক্তিবিদগণ চাচ্ছে *Vibrio fischeri* থেকে জীবালোকোজ্জ্বল (bioluminescence) জিন বা *lux* জিন ফুল গাছের কোষে সংযোজন করে দিতে। অথবা জোনাকী পোকার লুসিফারেজ জিন ফুল গাছে বা অলঙ্করণ উদ্ভিদে (ornamental) ঢুকিয়ে দিতে পারলে সেসব অলঙ্করণ উদ্ভিদ বা ফুল থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে আলোক রশ্মি। রাতে তা তখন এক দৃষ্টি নন্দন পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

১১. পরিবেশ উপযোগী ফসল

বিশ্ব পরিবেশ অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন একটি নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন ওজোন স্তর ক্ষয়ে যাওয়ায় অধিক মাত্রায় অতিবেগুনী রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাচ্ছে। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে দিন দিন CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বলে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং বেগুনি রশ্মির হাতে পড়ছে যাবতীয় গাছপালা এবং আমাদের ফসল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফসলের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এর ফলন ও গুণমান বৃদ্ধি করার কৌশল জীবপ্রযুক্তিবিদদের এখন থেকেই হাতে নিতে হবে। আগামী দিনের সমস্যা নিরসালে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ যে বৃদ্ধি পাবে তা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের বিশ্ব পরিস্থিতি

১. সূচনা

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল এখন আর বিজ্ঞানীদের কল্পনার কোনো বিষয় নয়। এটি এখন এক বাস্তবতা। ইতোমধ্যে জিএম ফসলের বাণিজ্যিক আবাদের এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। দিন দিন জিএম ফসলের নানা বিষয় মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে এবং এসব ফসলের আবাদী এলাকা বেড়ে চলেছে। তবে একথা ঠিক যে, যে হারে এসব ফসল পৃথিবীর দেশে দেশে আবাদ করা হবে বলে বিজ্ঞানীর ভেবেছিলেন সেরকম ব্যাপক আবাদ এ ফসলটির হয়নি। এ প্রযুক্তি এবং এ ধরনের ফসলের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি নেতিবাচক মনোভাব এর প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়।

২. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল আবাদী এলাকা

বিশ্ব জুড়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সময়ের মধ্যে জিএম ফসলের আবাদী এলাকা বেড়েছে ৫০ গুণেরও বেশি। ১৯৯৬ সালে যেখানে জিএম ফসল আবাদ করা হতো ১.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেখানে ২০০৫ সালে আবাদী এলাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ মিলিয়ন হেক্টরে (সারণি ১৫.১)। এ সময় কালের মধ্যে জিএম ফসল আবাদী দেশের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র তিনগুণ। ১৯৯৬ সালে জিএম ফসল ৬টি দেশ আবাদ করতো। ১৯৯৮ সালে এসে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৯টি তে। ১৯৯৯ সালে ১২ টি দেশে জিএম ফসলের আবাদ শুরু হয়; আর ২০০৪ সালে আরও ৪টি দেশে জিএম ফসলের আাবাদ শুরু হওয়ায় জিএম ফসল আবাদ করছে এরকম দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১টিতে।

সারণি ১৫.১ : বিশ্বজুড়ে জিএম ফসলের আবাদী এলাকা, ১৯৯৬-২০০৫

সন	হেক্টর (মিলিয়ন)	সন	হেক্টর (মিলিয়ন)
১৯৯৬	১.৭	২০০১	৫২.৬
১৯৯৭	১১.০	২০০২	৫৮.৭
১৯৯৮	২৭.৮	২০০৩	৬৭.৭
১৯৯৯	৩৯.৯	২০০৪	৮১.০
২০০০	৪৪.২	২০০৫	৯০.০

৩. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল আবাদী দেশ

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, শিল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশে জিএম ফসলের গ্রহণযোগ্যতা এক রকম নয়। মূলত শিল্পোন্নত দেশে এ ফসলের আবাদ বেশি হচ্ছে,

যদিও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সিংহভাগই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করছে। ২০০৪ সালে মোট ৮১ মিলিয়ন হেক্টর আবাদী এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ পড়েছে উন্নত বিশ্বে, আর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের অংশে। বিশ্বজুড়ে ২১টি দেশে এখন জিএম ফসল আবাদ করা হচ্ছে । ২০০৪ এর হিসাব অনুযায়ী ১৪টি দেশের প্রত্যেকটিতে আবাদ করা হচ্ছে ৫০০০০ হেক্টরেরও অধিক জমি। ২০০৫ সালে এসেও এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তবে ২০০৫ সালে এসে নতুন করে জিএম ফসল আবাদ শুরু করেছে আরও ৪টি দেশ। ফলে এখন মোট ২১টি দেশে জিএম ফসল আবাদ করা হচ্ছে । এসব দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, প্যারাগুয়ে, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, রোমানিয়া, ফিলিপাইনস্, স্পেন, কলোম্বিয়া, ইরান, হন্ডুরাস, পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স ও চেক প্রজাতন্ত্র (সারণি ১৫.২)।

সারণি ১৫.২ : ২০০৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জিএম ফসলের আবাদী এলাকার পরিমাণ

ক্রম বিন্যাস	দেশ	আবাদী এলাকা (মিলিয়ন হেক্টর)	জিএম ফসল
১	যুক্তরাষ্ট্র	৪৯.৮	সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, ক্যানোলা, স্কোয়াশ, পেঁপে
২	আর্জেন্টিনা	১৭.১	সয়াবিন, ভুট্টা , পেঁপে
৩	ব্রাজিল	৯.৪	সয়াবিন
৪	কানাডা	৫.৮	ক্যানোলা, ভুট্টা, তুলা
৫	চীন	৩.৩	তুলা
৬	প্যারাগুয়ে	১.৮	সয়াবীন
৭	ভারত	১.৩	তুলা
৮	দক্ষিণ অফ্রিকা	০.৫	ভুট্টা , সয়াবিন, তুলা
৯	উরুগুয়ে	০.৩	সয়াবিন, ভুট্টা
১০	অস্ট্রেলিয়া	০.৩	তুলা
১১	মেক্সিকো	০.১	তুলা, সয়াবিন
১২	রোমানিয়া	০.১	সয়াবীন
১৩	ফিলিপাইন	০.১	ভুট্টা
১৪	স্পেন	০.১	ভুট্টা
১৫	কলম্বিয়া	<০.১	তুলা
১৬	ইরান	<০.১	ধান
১৭	হন্ডুরাস	<০.১	ভুট্টা
১৮	পর্তুগাল	<০.১	ভুট্টা
১৯	জার্মানি	<০.১	ভুট্টা
২০	ফ্রান্স	<০.১	ভুট্টা
২১	চেক প্রজাতন্ত্র	<০.১	ভুট্টা

উৎস : ক্লাইভ জেমস্, ২০০৫

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জিএম ফসলের আবাদ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী সেখানে ৪৯.৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মোট ছয়টি জিএম ফসলের আবাদ হয়েছে ।

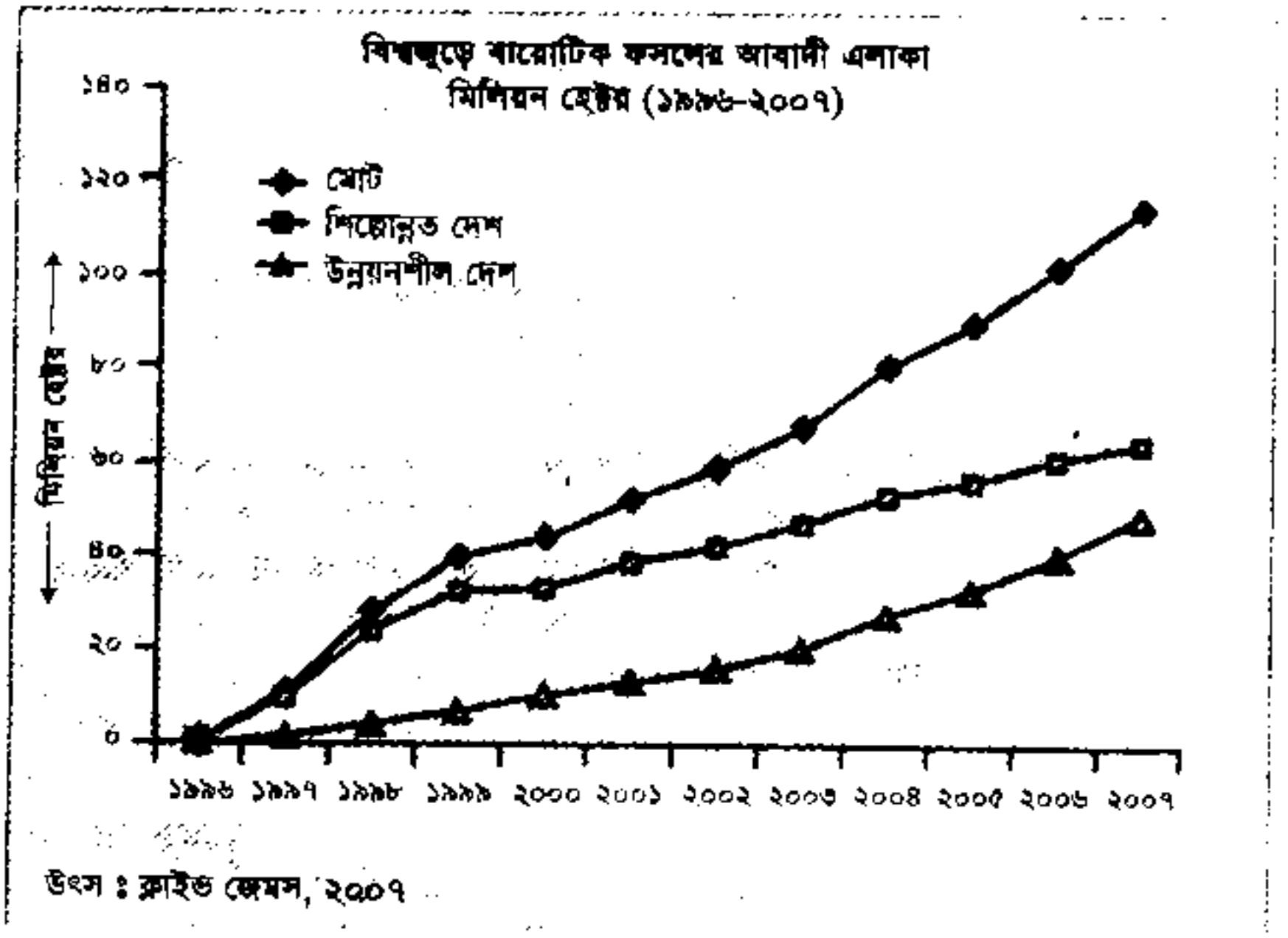

চিত্র ১৫.১: বিশ্বজুড়ে জি এম ফসল আবাদী এলাকা (১৯৯৬-২০০৭)

সারণি ১৫.৩ : ২০০৪ সালের প্রধান প্রধান জিএম ফসল

জিএম ফসল	হেক্টর (মিলিয়ন)	জিএম ফসলের শতকরা হার
আগাছানাশক প্রতিরোধী সয়াবিন	৪৮.৪	৬০
Bt ভুট্টা	১১.২	১৪
Bt তুলা	৪.৫	৬
আগাছানাশক সহিষ্ণু ভুট্টা	৪.৩	৫
আগাছানাশক সহিষ্ণু ক্যানোলা	৪.৩	৫
Bt ও আগাছানাশক সহিষ্ণু ভুট্টা	৩.৮	৪
Bt ও আগাছানাশক সহিষ্ণু তুলা	৩.০	৪
আগাছানাশক সহিষ্ণু তুলা	১.৫	২
মোট	৮১.০	১০০%

মোট জিএম ফসল আবাদী এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা আবাদ করা হচ্ছে এখন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই।

আবাদী জিএম ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, ক্যানোলা, স্কোয়াশ এবং পেঁপে। জিএম ফসল আবাদের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা। এখানে আবাদী এলাকার পরিমাণ ১৭.১ মিলিয়ন হেক্টর। এখানে সয়াবিন, ভুট্টা আর পেঁপের জিএম জাত আবাদ করা হচ্ছে। মোট ২১টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশে আবাদ করা হচ্ছে জিএম ভুট্টা ফসল। আর ৮টি দেশে আবাদ হচ্ছে জিএম সয়াবিন। তুলার আবাদ হচ্ছে মোট ৮টি দেশে।

ইউরোপের দেশগুলোতে এতদিন জিএম ফসল ফলানো নিষিদ্ধ ছিল। এখন ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলোতে জিএম ফসলের আবাদ শুরু হয়েছে। ২০০৫ সালে পর্তুগালে ও ফ্রান্সে Bt ভুট্টার আবাদ শুরু হয়েছে। চেক প্রজাতন্ত্র, জার্মানি আর স্পেনেও আবাদ হচ্ছে Bt ভুট্টা। ইসি (EC)ভুক্ত ৫টি দেশে এখন আবাদ করা হচ্ছে জিএম ফসল।

২০০৪ সালে ইরান অবমুক্ত করা হয়েছে Bt ধান। ধান একটি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর খাদ্যের উৎস। চীনেও Bt ধানের আবাদ শুরু হয়েছে। Bt ধান সফল বলে প্রমাণিত হলে তা ব্যাপক সংখ্যক কৃষক আবাদ করতে আগ্রহী হবে এটি অনুমান করা চলে।

৪. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড প্রধান প্রধান ফসল

২০০৪ সালে জিএম ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ আবাদী এলাকা দখল করে রেখেছিল আগাছানাশক প্রতিরোধী সয়াবিন (সারণি ১৫.৩)। ২০০৫ সালে এসেও তা একই পর্যায়ে রয়েছে। ২০০৫ সালে দ্বিতীয় স্থানে ছিল জিএম ভুট্টা এবং তৃতীয় স্থানে তুলা আর চতুর্থ স্থানে ক্যানোলা। গত এক দশকে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসল শীর্ষে অবস্থান করেছে। আগাছানাশক প্রতিরোধী সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা আর তুলা মিলে দখল করেছে ৭১% জিএম আবাদী জমি ২০০৫ সনে। Bt ফসল এ সময় দখল করেছে শতকরা ১৮ভাগ জিএম আাবাদী জমি; আর অধিক সংরক্ষণকাল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিএম ফসলের আবাদ হয়েছে শতকরা ১১ ভাগ জমিতে।

উন্নত বিশ্বের প্রধান জিএম ফসলগুলো হলো আগাছানাশক প্রতিরোধী। দ্বিতীয় আর তৃতীয়স্থানে রয়েছে যথাক্রমে কীট প্রতিরোধী জাত ও অধিক গুণমানসম্পন্ন জিএম ফসল। অনুন্নত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আবাদ করা হচ্ছে কীট প্রতিরোধী জিএম জাত। এসব দেশে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে কীট ও রোগ প্রতিরোধী জিএম ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। কারণ কম খরচে কীটপতঙ্গ ও নানারকম রোগ দমনের এটি একটি চমৎকার বিকল্প।

ষোড়শ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের বর্তমান অবস্থা

বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে কোনো জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি। এ দেশে জিএম ফসলের আবাদ এখনও শুরু হয়নি। তবে আবাদ শুরু না হলেও জিএম ফসলের উৎপন্ন দ্রব্য আমরা খেতে শুরু করেছি। এদেশের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ তেলের চাহিদা পূরণ করা হয় বিদেশ থেকে তেলের কাঁচামাল বা তেল আমদানি করে। আমাদের তেল আমদানির একটা বড় অংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের আবাদী সয়াবিন হলো জিএম সয়াবিন। আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম সয়াবিন আমাদের সয়াবিন তেলের একটি অন্যতম উৎস। ফলে জেনে হোক আর না জেনে হোক জিএম খাদ্য আমরা গ্রহণ করতে শুরু করেছি। কোনো কোনো দেশে কিন্তু জিএম টমেটোরও আবাদ হচ্ছে। বিদেশী টমেটো কেচআপে (ketch up) আমরা অনেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। এসব কেচআপে ব্যবহৃত টমেটো যে জিএম নয় একথা নিশ্চিত করে বলা অসুবিধাজনক। ফলে জিএম ফসল আবাদ না করেও জিএম ফসলের উৎপাদিত পণ্য প্রতিদিন খাওয়া হচ্ছে।

২. বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল নিয়ে গবেষণা

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল সৃষ্টির মূল কৌশলটি আণবিক জৈব রাসায়নিক কৌশল-নির্ভর। এর জন্য দরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রয়োজন রাসায়নিক পদার্থের সুলভ সরবরাহ আর অতি দক্ষ নিপুণ বিজ্ঞানী। আর দরকার নানা বিষয়ে দক্ষ বিজ্ঞানীদের সমন্বিত কার্যক্রম। এর একটির অভাব ঘটলে সিস্টেমটি সফলভাবে কাজ করতে যে ব্যর্থ হবে তা বলাই বাহুল্য। এদেশে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার করে জিএম ফসল সৃষ্টি করতে আরো কিছু দিন লেগে যাবে। জিএম ফসল তৈরি করতে যত সময়ই প্রয়োজন হোক এর অনেক পূর্বেই এদেশের মাঠে জিএম চলে যাবে এমনটি অনুমান করা যায়। নীতি নির্ধারকরা যে সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছেন এমন লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। আমরা সবাই জানি আর না জানি জিএম ফসল এদেশে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গত বছর থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে। এদেশের বিজ্ঞানীরা এগুলোর মান নির্ণয় ছাড়াও বহুদিক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বলা বাহুল্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথাগত সব প্রক্রিয়া সম্পাদন করেই এদেশে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে এসব জিএম উদ্ভিদ। এদের অনেকেই রয়েছে অনেকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বেশ প্রাথমিক পর্যায়েই। এদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে আরো কিছু দিন সময় লাগবে।

৩. সোনালি ধান

বাংলাদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যে জিএম ফসলটি প্রথম সরকারি অনুমোদন পায় সেটি হলো সোনালি ধান (Golden Rice)। ভিটামিন-এ এর আঁধার β-ক্যারোটিন তৈরি হয় এসব বীজে। এজন্য বীজগুলো দেখতে হলুদাভ বা সোনালি। এ থেকেই এর নাম সোনালি ধান (Golden Rice)। এখন থেকে পনের বছরেরও পূর্বে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব প্ল্যান্ট সায়েন্স প্রতিষ্ঠানটিতে একদল বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করে। এই প্রথম তারা তিনটি পৃথক জিন ঢুকাতে সক্ষম হন একটি ফসলে এবং সংযোজিত তিনটি জিন সুন্দরভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে পর্যায়ক্রমে তিনটি জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। ফলে ধানে তৈরি হয় ভিটামিন–এ। তারা যে তিনটি জিন ধানে সংযোজন করেন সে তিনটি জিনের দুটি নেয় হলুদ বর্ণের ডেফোডিল ফুল থেকে আর একটি নেয় ব্যাকটেরিয়া থেকে। এ তিনটি জিন প্রথমে তারা গবেষণাগারে সংযুক্ত করে নেয় এবং এরপর ঢুকিয়ে দেয় ধানের কোষে। তাদের এ কাজটি করা হয়েছিল মূলত জাপোনিকা শ্রেণীর একটি ধানের জাতে।

আমাদের দেশে ভাতের আঠালো ভাবের কারণে জাপোনিকা শ্রেণীর কোনো ধানের জাতের আবাদ হয় না। এ শ্রেণীর জাতগুলোর ধানের দানা লম্বাটে ও আঠালো। আমরা চাই ছোট খাটো দানার ঝরঝরে ভাত। সেজন্য এ এলাকার অনেক দেশে আবাদ করা হয় ইন্ডিকা (indica) শ্রেণীর ধানের জাত। আমাদের সবগুলো ধানের জাতই আসলে ইন্ডিকা শ্রেণীর। ফলে সুইজারল্যান্ডে তৈরি করা জিএম ধান আমাদের জন্য সরাসরি কোনো উপকারে আসলো না। আমাদের জন্য প্রয়োজন হলো ইন্ডিকা ধানের জাতে ভিটামন 'এ' উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জিনের সন্নিবেশন ঘটানো। এ কাজে অগ্রসর হলো ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অর্থাৎ IRRI।

আমাদের দেশের ধানের দুটি জনপ্রিয় জাত হলো ব্রি-ধান ২৮ এবং ব্রি-ধান ২৯। এ দুটি ধানের বীজে ভিটামিন 'এ' উৎপাদনের জন্য তিনটি জিন ঢুকিয়ে দিয়ে জিএম ধান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ জাত দুটি বীজ পাঠানো হয় IRRI তে। দুটি জাতেই সংশ্লিষ্ট জিনগুলো সংযোজনে সক্ষম হন IRRI বিজ্ঞানীরা। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর জিএম ব্রি-ধান ২৮ এবং জিএম ব্রিধান ২৯ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাঁচঘরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।

একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, জিএম ব্রিধান ২৮ বা জিএম ব্রিধান ২৯ পরীক্ষা–নিরীক্ষা থেকে শেষ পর্যয়ের প্রাপ্ত কোনো জিএম ধান নয়। ট্রান্স জিনগুলো দুটি জাতে সংযোজন করার পরপরই এগুলোকে ব্রি বিজ্ঞানীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের এসব জিএম ধান পূর্বেকার ব্রিধান ২৮ বা ব্রিধান ২৯ এর মতো ফলন দেবে কি-না এবং যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত গাছে ভিটামিনের পরিমাণ কেমন থাকবে তা দেখার ও জানার বিষয় রয়েছে। এমনিতে এ দুটি জিএম ধান পূর্বের চেয়ে অধিক ফলনশীল হবার কেনো কারণ নেই কেননা ফলন

বৃদ্ধির জন্য কোনো জিন এতে সংযোজন করা হয়নি। বরং এ দু'টি জনপ্রিয় ধানের জাতে β - ক্যারোটিন উৎপাদনের তিনটি জিন ঢুকানোর ফলে এর ফলন পূর্বের চেয়ে কিছুটা হ্রাস পাবার কথা । বাস্তবে কি ঘটেছে তা পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষ না হলে বোঝা যাবে না।

IRRI থেকে পাওয়া জিএম ধানের জাত দুটি কতটা সফল হবে পরীক্ষাগারে তা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি BRRI বিজ্ঞানীর নিশ্চয়ই এ দুটি জিএম জাতের সাথে এদেশে উদ্ভাবিত অন্যান্য দু'চারটি ধানের আধুনিক জাতের ক্রসিং এবং ব্যাকক্রসিং (backcrossing) অব্যাহত রাখবে। যেন পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত জিনগুলো অন্য ধানের জাতে নিয়ে নেয়া যায় এবং ব্যাকক্রসিং করে নির্দিষ্ট জেনোটাইপ সম্পন্ন জাতগুলো হুবহু পাওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য কাচঘরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গাছের বৈশিষ্ট্যগুলোর পূর্ণ প্রকাশ ঘটানো কঠিন হবার কথা। তাছাড়া এসব জিএম ধানে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনও থেকে যাবার কথা। খুব বেশি সংখ্যক গাছ না লাগাতে পারলে এন্টিবয়োটিক প্রতিরোধী জিনের জাত থেকে নিস্কৃতি পাবার উপায় কি সেটিও ভাবতে হবে। কি ঘটবে এসব জিএম নিয়ে এ বিষয়ে সঠিক করে কিছু বলার সময় এখনো আসেনি। তবে এসব জিএম ধান নিয়ে যে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে এমনটা অনুমান করা যায়।

৪. খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ধান ফসল

ধানের খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সরকার ইরি ধান জিএম IR 64 এদেশে আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে । বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এ জিএম ধান নিয়ে গবেষণা করবে। পাশাপাশি ব্রি বিজ্ঞানীরা নিজস্ব জাতগুলোতে প্লাজমিড দিয়ে রূপান্তরকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জিনবাহী প্লাজমিডও আমদানি করতে পারবে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে Dr. Ray Wu এবং তার সহযোগীরা খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিএম ধান সৃষ্টির লক্ষ্যে *E. coli* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে দুটি জিন আলাদা করে নেয়। এ দুটি জিন হলো ট্রেহালোজ-৬- ফসফেট সিনথেজ (যাকে সংক্ষেপে TPS বলা হয়) এবং ট্রেহালোজ-৬- ফসফেট ফসফাটেজ (TPP)। এ দুটি জিনকে পরবর্তীতে অল্প দৈর্ঘ্যের DNA সিকুয়েন্স দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে TPSP ফিউশন জিন। *Agrobacterium* এর প্লাজমিডে জিনটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে এই ব্যাকটেরিয়াটির মাধ্যমে IR 64 জাতের ধানের ক্যালাসে ফিউশন জিনটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এ জিএম জাতটি নিয়ে এখন ব্রি (BRRI) বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করছে।

তিন রকমের কর্মকাণ্ড এখন সম্পন্ন করতে হবে ব্রি বিজ্ঞানীদের। প্রথমত, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তারা দেখবে IR 64 জাতটি খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু কি-না। এর জন্য তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এ দুটি পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। কাজটি খুব সহজ নয়। এ জিএম জাতটিতে সংযুক্ত রয়ে গেছে হাইগ্রোমাইসিস মার্কার জিন। মার্কার জিন থেকে মুক্তি পেতে হলে জন্মাতে হবে অনেক সংখ্যক উদ্ভিদ এবং ল্যাবতিত্তিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে নির্ণয় করতে হবে কোন কোনটি হাইগ্রোমাইসিস মার্কার মুক্ত

আনার পূর্বে বা বেগুন বাজারে আনার সময়ও বেগুনে শেষ স্প্রেটা করা হয় । বেগুনের মাঠে কীটনাশকের ব্যাপক প্রয়োগ জনস্বাস্থ্যে ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলেই সবাই মনে করে।

ভারতের Mahyco Research Centre নামক প্রতিষ্ঠান Bt জিন বেগুনে সংযোজন করে বেগুনের কীট প্রতিরোধী গাছ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে Mahyco Research Centre এর এক সমঝোতা চুক্তির আওতায় BARI বিজ্ঞানীরা এদেশের ৯টি বেগুনের উন্নত জাত ও স্থানীয় জাত মিলে ৯টি বেগুনের জাতে Bt জিন স্থানান্তরের জন্য Mahyco Research Centre এ গমন করে। সেখানে কেন্দ্রে উদ্ভাবিত জেনেটিক্যালি মোডিফাইড বেগুনের সাথে Bt জিনটি স্থানান্তরের জন্য আমাদের দেশের ৯টি জাতের ক্রস করা হয়। এ ৯টি বেগুনের জিনসম্পদের মধ্যে ৪টি হলো বিআরআই উদ্ভাবিত বেগুনের জাত। এ জাতগুলো হলো উত্তরা, কাজলা, নয়নতারা এবং বারি বেগুন-৬ নামক জাত। অন্যান্য সংগৃহীত কৃষকের জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামপুরী, খটখটিয়াসহ আরও কিছু জাত। এসব জাতের F_1 বংশধরকে অতঃপর আমাদের স্ব স্ব দেশী জাতগুলোর সাথে ব্যাকক্রস করা হয়। সরকারের অনুমোদনের পর বিআরআই এর নিয়ন্ত্রিত কাঁচঘরে এখন জন্মানো হচ্ছে এর ব্যাকক্রস দ্বিতীয় বংশধর (BC_2)। কয়েক বংশধর এভাবে ব্যাকক্রস করা হলে একসময় পাওয়া সম্ভব হবে কেবল কীট প্রতিরোধক্ষম জিন সম্বলিত হুবহু আমাদের উত্তরা, কাজলা, নয়নতারা, বিআরআই বেগুন-৬ বা অন্যান্য জাতের মতো হুবহু বেগুন। এর পর চলবে এর বিষাক্ততা ও এলার্জেনসহ নানা প্রকার জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে হয়তো এদের কোনো কোনটি ছাড়পত্র পাবে এ দেশের মাটিতে আবাদের জন্য।

বেগুনের উপর Bt জিনসমৃদ্ধ ৯/১০টি লাইন নিয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য সরকার অনুমতি দিয়েছে এ দেশের প্রাইভেট বীজ কোম্পানি ইস্ট ওয়েস্ট বাংলাদেশ লিঃ কে। এটি এদেশের প্রথম প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যারা জিএম উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা চালাবে। Mahyco Research Centre এর সাথে এ কোম্পানির সমঝোতা চুক্তির আওতায় কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী Bt জিনসম্পন্ন ১০টি লাইন নিয়ে সঙ্কর জাতের বেগুন তৈরি তাদের লক্ষ্য। উপযুক্ত মনে হলে এর এক বা একাধিক লাইন থেকে বেগুনের জিএম জাত পাওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের পেঁপেতে ভাইরাসের আক্রমণ একটি সাধারণ ঘটনা। ভাইরাসের আক্রমণ পেঁপের ভীষণ রকম ফলন কমিয়ে দেয়। মূলত 'পেঁপের রিং স্পট ভাইরাস' (Paypa ring spot virus) এ জন্য দায়ী। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপের পুনা জেলায় এ ভাইরাসের আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হয়। পেঁপে শিল্পকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে PRSV রোগ প্রতিরোধক্ষম ট্রান্সজেনিক পেঁপে উদ্ভাবন করা হয়। হাওয়াইয়ের লাল শাঁসযুক্ত Sunset জাতে জিন বন্দুক (gene gun) ব্যবহার করে PRSV এর 'আবরণী প্রোটিন জিন' (coat protein gene) সংযোজন করা হয়। অতঃপর কয়েক বছর নির্বাচন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জিএম Sunset উদ্ভিদ সমষ্টির

একটি লাইন থেকে একটি পেঁপের জিএম জাত পাওয়া যায় । এর নামকরণ করা হয় 'Sunup'। অপর দিকে Sun up জাতের সাথে অন্য একটি প্রচলিত জাতের সঙ্করায়ন করে F- ১ নামক একটি উন্নত হাইব্রিড পেঁপের জাতও উদ্ভাবন করা হয়।

বাংলাদেশের পেঁপের কিছু জাতেও জিন বন্দুক ব্যবহার করে PRSV প্রতিরোধক্ষম 'আবরণী প্রোটিন জিন' সংযোজন করা হয়েছে। এসব জিএম উদ্ভিদ থেকে যাচাই বাছাই করে PRSV প্রতিরোধক্ষম পেঁপে জাত পাওয়া সম্ভব। বেশ কিছু সময় ধরে পেঁপের ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম জিএম পেঁপে নিয়ে এদেশে গবেষণা চললেও সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এখনও অনুমোদন প্রদান করা হয়নি।

সপ্তদশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও পরিবেশ

১. পরিবেশ ও জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

আমাদের পরিবেশ দিন দিন বৈরী হয়ে উঠছে। মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড দিন দিন পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে। অবিবেচনাপ্রসূতভাবে পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করার কারণে পরিবেশও আমাদের উপর কিছু প্রতিশোধ নিচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে বনাঞ্চলের বিনাশ সাধন, কয়লা এবং তেলের অবিরত ব্যবহার, বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড উপাদান বাড়িয়ে তুলছে এবং তাতে বিশ্ব উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তাপমাত্রার বৃদ্ধি ক্রমশ বৃষ্টিপাতের ধরনটাকেও পাল্টে দিচ্ছে। ফলে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে কৃষি ব্যবস্থাপনার নানা দিকও পাল্টে যেতে পারে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা এখনও বেড়েই চলেছে। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৯.৩ বিলিয়নে দাঁড়াবে। তার অর্থ হলো পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে যাবে ৩ বিলিয়ন। এ বিশাল জনসংখ্যা কতভাবে যে এ পৃথিবীর উপর প্রভাব ফেলবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। হ্রাস পাবে বনভূমি আরও, অনেক আবাদী জমিও আবাদের আওতার বাইরে চলে যাবে। বাড়তি খাদ্যের যোগান দেয়ার জন্য ভূমি ব্যবহারের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। নানারকম বর্জ্য বিষিয়ে তুলবে পানি, মাটি আর বায়ু।

পরিবেশের প্রাণ হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। কত রকম বিচিত্র সব উদ্ভিদ আর প্রাণী নিয়ে গড়ে উঠেছে এ পৃথিবীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবকুল। পরিবেশের পরিবর্তন পরিবেশের জীব উপাদান-গাছপালা আর প্রাণিকুলের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে এবং ফেলবে। এতে যে কেবল কোনো একটি বা দু'টি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে তাই নয় বরং কোনো কোনো প্রজাতির অন্তর্গত বৈচিত্র্যও এতে হ্রাস পাচ্ছে। আর জীববৈচিত্র্য হ্রাসের প্রভাব আমাদের পরিবেশের জন্য কতটা নেতিবাচক হতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই অনুধাবন করা যায়।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে জিএম ফসলের আবাদ নানা আশা আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি নানা হতাশা ও আশংকারও জন্ম দিচ্ছে। কৃষি কর্মকাণ্ড বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপর বরাবরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ কথা জেনেও বৃহত্তর জনমানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি কর্মকাণ্ডের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের নিকট খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা অন্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে যে জরুরি তা আর বিশ্লেষণ করার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থাপনার সাথে জিএম ফসলের আবাদ শুরু হলে পরিবেশের উপর এর যে প্রভাব পড়বে তা অনুমান করা চলে। তবে সে প্রভাব ভালো

না মন্দ, ধনাত্মক না ঋণাত্মক সেটাই হলো ভাবনার বিষয়। জিএম ফসলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানোর পূর্বে সচেতন সব মহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা দরকার। আর্থসামাজিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নতুন এ প্রযুক্তির উৎপাদকে (product) এবং পরিবেশের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন আলোচনা করা দরকার।

২. পরিবেশের উপর জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের প্রত্যক্ষ প্রভাব

পরিবেশের উপর জিএম ফসলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে হলে কোন ধরনের জিএম ফসল কি কারণে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সে আলোকে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। ঢালাওভাবে সব জিএম ফসলকে একই পর্যায়ে ফেলে আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সব জিএম ফসল উৎপাদন পদ্ধতি যেমন একরকম নয় তেমনি এসব ফসলে সংযুক্ত জিনের ক্রিয়াকলাপও একরকম নয়। পরিবেশের উপর জিএম ফসল আবাদের কারণে যেসব ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করা হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

২.১ জিন প্রবাহ

পরাগায়নের উপর ভিত্তি করে আমাদের যেমন স্বপরাগী ফসল রয়েছে, তেমনি রয়েছে পর-পরাগী ফসল। আবার কিছু স্ব-পরাগায়ন এবং কিছু পর-পরাগায়ন ঘটে একই ফসলের এমন জাতও রয়েছে। পর-পরাগায়ন ফসলের প্রাকৃতিকভাবে ভিন্নতা সৃষ্টি এবং ফসলে বৈচিত্র্য রক্ষার একটি অন্যতম উপায়। কিন্তু ফসলের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এটি আমাদের কাছে একটি বাড়তি ঝামেলা। তবু স্ব স্ব ফসলের পরাগায়ন স্বভাবকে মেনে নিয়েই এর জাতকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হয়। পর-পরাগী ফসল সহজেই পরাগরেণু ছড়িয়ে দিতে পারে। আশেপাশে বুনে দেওয়া একই ফসলের অন্য জাতের সাথে এগুলোর মুক্ত পরাগায়ন ঘটা একটি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এর ফলে জিএম ফসলের অন্যান্য জিনের পাশাপাশি জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযোজিত জিনটিও অন্য জাতে অনায়াসে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফসলে সংযোজিত জিনটিকে কেবল জিএম ফসলেই সীমাবদ্ধ রাখা যাচ্ছে না।

জিএম ফসলে সংযোজিত করা হয়েছে নানা রকম জিন। কোনো কোনোটা রোগ প্রতিরোধী, কোনোটা কীট-প্রতিরোধী, আবার কোনো কোনটা আগাছানাশক প্রতিরোধী। ফসলের অন্য জাতের সাথে পর-পরাগায়ন এ সবগুলো জিনকেই একই ফসলের অন্যান্য জাতে নিয়ে যেতে পারে। কখনও কখনও এসব বৈশিষ্ট্য নিকট সম্পর্কিত আগাছা বা বুনো বংশধরের উদ্ভিদের মধ্যেও চলে যেতে পারে। যে ফসলের জাতে এসব জিন স্থানান্তরিত হবে সেসব জাতের কোনোটি রোগ প্রতিরোধী স্বভাব অর্জন করবে, কোনো কোনটা পাবে কীট-প্রতিরোধতা আবার কোনো কোনটা পাবে আগাছানাশক প্রতিরোধিতা। ফলে প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য এরা বাড়তি কিছু সুবিধা পাবে। এদের টিকে থাকা অর্থ হলো নতুন করে এদের কোনো কোনো গাছপালা ফসলের আগাছা হেসেবে আবির্ভূত হওয়া। আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন পাওয়া

গাছগুলোর আগাছা হিসেবে মাঠে বিরাজ করার সম্ভাবনাটা অধিক। এ জিনের প্রবাহ কোনো ফসলের জাতের স্বতন্ত্র গাছকে মাঠে আগাছানাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধিতা দেয়ায় সেই গাছটি কিন্তু নির্দিষ্ট আগাছানাশক বা একই গ্রুপের আগাছানাশক দিয়ে নিধন করা সম্ভব হবে না। ফলে গাছটির আগাছা হিসেবে আবির্ভূত হবার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। আর বুনো কোনো বংশধরের উদ্ভিদের মধ্যে এ জিনের অন্তর্ভুক্তি একে আরো আগ্রাসী আগাছা করে তুলবে কি-না এসব বিষয়তো রয়েছেই।

জিএম ফসল নিজে আগাছা হিসেবে ফসলের মাঠে টিকে যেতে পারে এরকম আশংকাও রয়েছে অনেকের মনে। আগাছানাশক প্রতিরোধী গাছ সেই আগাছানাশকের উপস্থিতিতে অক্ষত থেকে যায় বলে অল্প কিছু গাছও যদি ফসলের মাঠে থেকে যায় তবে এগুলো এক সময় অন্য ফসলের আগাছা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। কোনো ফসলের আগাছা হিসেবে টিকে থাকার জন্য যেসব বুনো বৈশিষ্ট্যাবলি দরকার তা এগুলোর নেই। ফলে অযত্ন অবহেলায় ফসলের গাছগুলো কতটা সফল হবে এটি অবশ্য দেখার বিষয়। বিজ্ঞানীরা ১৯৯০ থেকে দশ বছর তেলবীজ রেপ, গোলআলু, ভুট্টা এবং সুগারবিট নিয়ে এবং আগাছানাশক প্রতিরোধিতা ও কীট-প্রতিরোধিতাকে বিবেচনায় রেখে রূপান্তরিত ফসল আর অরূপান্তরিত ফসলের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে জিএম ফসলকে অধিক আগ্রাসী বা বুনো পরিবেশে অধিক সফল বলে খুঁজে পাননি। তবে একথা ঠিক যে, এ ধরনের জিএম ফসল মাঠে আবাদ করার পূর্বে এবং ফসল মাঠে আবাদকালে প্রতিটি জিএম ফসলের আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। জিএম সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুযায়ী যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে দেখে নিয়ে তবে এসব ফসলকে আবাদের জন্য গ্রহণ করতে হবে।

কোনো ফসলের উৎপত্তি কেন্দ্রে একটি ফসলের সর্বাধিক জেনেটিক ভিন্নতা (variation) তথা কৌলিক বৈচিত্র্য (genetic diversity) রয়েছে। ফলে এসব উৎপত্তি কেন্দ্রে সেই নির্দিষ্ট ফসলের জিএম ফসল আবাদ করার পূর্বে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। কোনো ফসলের উৎপত্তি কেন্দ্রে একটি ফসলের সর্বাধিক স্থানীয় জাত দেখতে পাওয়া যায়। শত শত বছর ধরে সেই এলাকার কৃষকদের যাচাই বাছাই সৃষ্টি করেছে কত বিভিন্ন রকমের স্থানীয় জাত। ফসলের এসব জিনসম্পদে জিএম ফসল থেকে জিন প্রবাহ ঘটুক এটি বিজ্ঞানীদেরও কাম্য নয়। সেজন্য তারা নানারকম কৌশল অবলম্বন করারও প্রস্তাব দিয়েছেন । এর মধ্যে কিছু জিএম ফসলের জিন প্রবাহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, আর কিছু ফসল জেনেটিক কৌশল অবলম্বন করে জিন প্রবাহ বন্ধ করা যাবে বা জিন প্রবাহের মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়।

ফসলের উৎপত্তি কেন্দ্রে কেবল নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় জিএম ফসলের আবাদ সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে জিন প্রবাহ বন্ধ রাখা বা হ্রাস করা যাবে। এসব কেন্দ্রে আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের আবাদ না করাই উত্তম হবে। একটি ফসলের উৎপত্তি কেন্দ্র তো আর সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত নয়। ফলে কোনো কোনো জিএম ফসলের

আবাদ অঞ্চলভেদে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবার কথা নয়। কখনও কখনও বাফার অঞ্চল গড়ে তুলেও জিএম ফসলের জিন প্রবাহের হাত থেকে স্থানীয় জাত বা বুনো বংশধরের উদ্ভিদের রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। জিএম ফসলের পুষ্পায়ন কালকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে জিন প্রবাহের সুযোগ সীমিত করা যায়। কন্দাল ফসলের ক্ষেত্রে পুষ্পায়ন কোনো জরুরি ঘটনা নয়। এমনিতেই অনেক কন্দাল ফসলের ফুল তৈরি হয় না। আর যেসব কন্দাল ফসলে ফুল হয় এগুলোর পুংরেণুটাকে বন্ধ্যা করে দেয়ার কৌশল জিএম ফসলে ঢুকিয়ে দিয়ে জিন প্রবাহের সুযোগটা বন্ধ করা যেতে পারে। চিকিৎসা বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক কোনো নির্দিষ্ট বস্তু উৎপাদনের লক্ষ্যে তৈরি করা জিএম ফসল এমনভাবে জন্মানো উচিত যেন এগুলোর জিন কোনো খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত না হতে পারে।

২.২ পরিবেশে বিদ্যমান অন্য কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর উপর প্রভাব

ব্যাকটেরিয়ার Bt জিন ফসলের ক্রোমোজোমে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে কীট-প্রতিরোধী ফসল তৈরি করা হয়েছে। দানা শস্য, আঁশজাতীয় ফসল, নানারকম সবজিতে এখন এ জিনকে ব্যবহার করা হয়েছে। এ জিনের প্রোডাক্ট ক্রিস্টাল প্রোটিন কীটের মধ্য অন্ত্রে (mid-gut) ভেঙে গিয়ে বিষাক্ত রূপটি তৈরি করে। এরই বিষক্রিয়ায় একসময় মারা যায় কীটপতঙ্গ। মূলত Bt জিন Lepidoptera এবং Diptera গোত্রের কীটপতঙ্গের উপর অধিক কার্যকর। ফসলের মাঠে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের পাশাপাশি রয়েছে অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ। এসব উপকারী কীটপতঙ্গও ফসল থেকে তাদের খাবার গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে উপকারী কীটটিরও বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটার কথা। যদি এরকমটি ঘটে তবে তা পরিবেশের ভারসাম্যতা বিনষ্ট করে দিবে এবং কীটপতঙ্গ দমনের যে একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

১৯৯৯ সালের মে মাসে একটি প্রতিবেদনে এসেছে যে Bt কীট-প্রতিরোধী ভুট্টা মোনার্ক বাটারফ্লাই লার্ভার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ প্রতিবেদন বেশ সাড়া জাগায় এ কারণে যে, অন্যান্য লক্ষ্যহীন কীটপতঙ্গের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে Bt ভুট্টা। এ প্রতিবেদনের ফলাফলটি নেওয়া হয় একটি ল্যাব-ভিত্তিক গবেষণা থেকে যেখানে কীটটির জন্য বিকল্প কোনো খাদ্যের উৎস ছিল না। অনিবার্যভাবে তাকে Bt ভুট্টা গ্রহণ করতে হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়টি নিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে এ তথ্যই জানা যে, মাঠ পর্যায়ে Bt ফসলের পরাগরেণু ভক্ষণ করলে লক্ষ্যহীন কীটপতঙ্গের তেমন কোনো বড় রকম ক্ষতি সাধন ঘটে না। আর তাছাড়া কোনো কীট পতঙ্গ শুধু একররকম ফসল থেকে সেগুলোর খাদ্য গ্রহণ করে না।

ফসলের জমিতে সতত ক্রিয়াশীল রয়েছে কত রকম অণুজীব। মাটির পরিবেশের প্রবীণতম জীবীয় উপাদান হলো এসব অণুজীব। সত্যি কথা বলতে গেলে এরাই হলো মাটির প্রাণ। Bt ফসলের আবাদের ফলে ফসলের মূল ফসলের অকর্তিত অংশ সহ ফসলের বহু অংশ মাটিতে ভেঙে পড়ে থাকে। ফলে ফসলের মূলসহ এসব কাণ্ডাংশ বা

ফল মাটিতে পঁচে মিশে যায়। আর তা থেকে মাটিতে অবমুক্ত হয় Bt জিনের উৎপাদ ক্রিস্টাল প্রোটিন। মাটিতে ক্রিস্টাল প্রোটিনটি ভেঙে গেলে তা অণুজীবদের দেহে চলে যেতে পারে। ফলে মৃত্তিকাস্থ অণুজীবের উপর এর প্রভাব কতটা নেতিবাচক হতে পারে এ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। এ নিয়ে কিছু গবেষণাও হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে Bt ফসলের মাটির অণুজীব সম্প্রদায়ের গঠনকে অন্য প্রচলিত ফসলের মাটির অণুজীব সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় কিছুটা পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে বটে, যদিও বিজ্ঞানীরা একে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে Bt ফসল আবাদ করলে মাটির স্বাস্থ্যের অবস্থা কি দাঁড়াবে এ নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।

এ পর্যন্ত পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে লক্ষ্যহীন বন্য প্রাণী, কীটপতঙ্গ বা মৃত্তিকাস্থ অণুজীবের উপর জিএম ফসলের তেমন কোনো নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। তবে লক্ষ্যহীন কীটপতঙ্গ, প্রাণী বা মৃত্তিকাস্থ অণুজীবের উপর দীর্ঘমেয়াদে একই জমিতে বারবার Bt ফসলসহ অন্যান্য জিএম ফসলের আবাদ কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি-না তা জানতে হলে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক হবে। আমাদের চারপাশের পরিবেশ প্রতিবেশের উপর এ ফসলের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব জানতে হলে আরও তৎপর হতে হবে এবং এসব বিষয়ে সঠিক করে জানতে হলে গবেষণার ক্ষেত্রে আরও উন্নত পদ্ধতি বা কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

৩. পরিবেশের উপর পরোক্ষ প্রভাব

জিএম ফসলের আবাদ এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা সনাতন চাষাবাদ অপেক্ষা নানা কারণেই কিছুটা ভিন্নতর বিধায় পরিবেশের উপর এর একটি পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। সে প্রভাব যেমন ভালো হতে পারে তেমনি তা মন্দও হতে পারে। অনেক সচেতন মানুষ ও পরিবেশবাদীদের ধারণা এই যে, কৃষি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রকার নাশক দ্রব্য যেমন– কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, ব্যাকটেরিয়ানাশক এবং আগাছানাশক খামার এলাকায় অবস্থিত পশুপাখি, বুনো উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এগুলোর সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য রকমভাবে হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া এসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুরের পানিতে চলে যাচ্ছে। পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে এসব পদার্থ। জলজ জীবজন্তুর উপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

জিএম ফসলের আবাদের ফলে কিছুটা হলেও রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের পরিমাণ ও এর প্রয়োগ সংখ্যা এবং ভূমি ব্যবহারের ধরন পাল্টে যাবে। ফলে পরিবেশের উপরে জিএম ফসলের আবাদ কি রকম প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে নিশ্চিত নয় বিজ্ঞানীরা। সাধারণভাবে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জিএম ফসলের আবাদ রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। Bt ফসল সব ধরনের কীটপতঙ্গের বিপক্ষে প্রতিরোধী নয়। বরং তা একটি দু'টি সুনির্দিষ্ট মুখ্য কীট প্রতিরোধী। অন্যান্য অপ্রধান কীটপতঙ্গের আক্রমণ ঠেকাতে তাই ফসলের মাঠে অল্প সংখ্যক বার কীটনাশক ছিটিয়ে

দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে অথবা সমন্বিত কীট দমন কর্মকাণ্ড চালাবার প্রয়োজন হতে পারে। মাঠে Bt ভুট্টা, তুলা আর সয়াবিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এগুলোর আবাদের ফলে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পায় উল্লেখযোগ্যভাবে। জিএম তুলার মাঠে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এ রকম তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়া, চীন, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রে। কীট প্রতিরোধী জিএম ফসলের আবাদের ফলে পরিবেশ উপকৃত হয়। দূষণের হাত থেকে অনেকটা বেঁচে যায় চারপাশ। কমে যায় অল্প কীটনাশক স্প্রে করার কারণে খামার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি।

পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে যান্ত্রিক আগাছা নির্মূলের পরিবর্তে আজকাল খুব স্বাভাবিকভাবে আগাছানাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। ইদানীংকালে অধিক বিষাক্ত আগাছানাশকের পরিবর্তে কম বিষাক্ত আগাছানাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। তার উপর আগাছানাশক জিএম ফসলের আবাদ আগাছানাশকের ব্যবহারকে উৎসাহিত করছে। ফলে পরিবেশ বিষাক্ত রাসায়নিকের হাতে পড়ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে নানারকম পশুপাখি ও জীবজন্তুর উপর। আগাছানাশক প্রতিরোধী গাছ কোনোভাবে মাঠে থেকে গেলে তারও আগাছা হিসেবে পরিণত হওয়ার সুযোগ বাড়ছে। এসব আগাছানাশক ফসলের মাঠে বিদ্যমান সব আগাছারই মৃত্যু ঘটাচ্ছে। এসব আগাছার মধ্যেও রয়েছে নানারকম উপকারী উপাদান। এদের রয়েছে ঔষধি মূল্য। এরকম অনিয়ন্ত্রিত আগাছানাশকের প্রয়োগে অন্যান্য গাছপালা, বুনো আধাবুনো ফসলের আত্মীয়, ফসলের মাঠে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব ফেলবে। অবশ্য মাটি কম নাড়াচাড়া করেই আগাছা দমন করা যাচ্ছে বলে মাটি সংরক্ষণ করা সহজ হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে পরিবেশে এর বিরূপ প্রভাব যে পড়বে এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

দীর্ঘদিন Bt ফসল এবং আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের আবাদ কীটপতঙ্গ ও আগাছার মধ্যে যে প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করতে পারে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত। প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতি অবলম্বন করে উদ্ভাবিত কীট প্রতিরোধী জাতের প্রতিরোধিতা ভেঙে যাবার অনেক উদাহরণ রয়েছে। Bt ফসলের কীট-প্রতিরোধিতার মাত্রা অনেক বেশি বলে কীট পতঙ্গের উপর নির্বাচন চাপও (selection presure) অধিক। ফলে কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রতিরোধিতা ব্যূহ ভেঙে ফেলার জন্য জিনগত পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনাও অধিক থাকে। আর আগাছানাশকের ব্যবহারের ফলে আগাছার মধ্যে জিএম আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল আবাদের পূর্বেই প্রতিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এ জাতীয় ফসলের আবাদ রাসায়নিক আগাছানাশকের ব্যবহার বাড়াবে। আগাছা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সমস্যায় পড়বে বলে আগাছার উপর প্রচণ্ড চাপ বাড়বে। ফলে কিছু কিছু আগাছাও আগাছানাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর জন্য প্রয়োজন হবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

অজীবীয় পীড়ন যেমন-খরা, লবণাক্ততা, শীত, অধিক তাপমাত্রা, ধাতব পদার্থের উপস্থিতি ইত্যাদি নানা রকম পীড়নসহিষ্ণু জিএম ফসল মাঠে যাবার জন্য তৈরি করা

হচ্ছে। ধানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত লবাণাক্ততা ও খরাসহিষ্ণু জিএম ফসল নিয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বেশ কিছু দেশে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রতিরোধী জিএম ফসলও তৈরি করা হয়েছে দু'একটি। এসব জিএম ফসল মাঠ পর্যায়ে আবাদ করা হলে পরিবেশে এগুলোর কি প্রতিক্রিয়া হবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলার কোনো সুযোগ নেই। সময়ই বলে দেবে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর কি হবে এগুলোর প্রতিক্রিয়া।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও জনস্বাস্থ্য

১. সূচনা

পৃথিবীর বেশ ক'টি দেশে এখন জিএম ফসলের আবাদ হচ্ছে। এসব ফসলের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার এখন আর কেবল সেই সব দেশেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। দেশ মহাদেশের গণ্ডি পেড়িয়ে তা এখন অন্য দেশে অন্য মহাদেশে চলে যাচ্ছে। আমেরিকার সীমানা পেড়িয়ে কোনো কোনো ফসল বা জিএম খাদ্য এখন চলে এসেছে আমাদের দেশেও। ফলে জিএম খাদ্য এবং জনস্বাস্থ্যের উপর এসব খাদ্যের কোনো বিরূপ প্রভাব রয়েছে কি-না সে সম্পর্কে জানা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ছে।

২. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল আবাদের ছাড়পত্র

জিএম ফসলে সংযোজিত সব জিনের ক্রিয়াকলাপ একরকম নয়। ফলে ঢালাও ভাবে সব জিএম ফসল নিয়ে কোনো সাধারণ মন্তব্য করা যুক্তিসংগত নয়। তবে পৃথিবীর নানা দেশে আবাদ করা হচ্ছে যেসব জিএম ফসল এগুলোর উৎপাদিত পণ্য বা এগুলো দিয়ে তৈরি করা জিএম খাদ্য মানুষের ভক্ষণের জন্য নিরাপদ এ দাবী করেছে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স (International Council for Science)-যাকে সংক্ষেপে ICSU বলা হয়। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জিএম খাদ্য নিরাপদ কি-না তা যাচাই করা হচ্ছে এ সংস্থাটি তা সঠিক বলে মতামত ব্যক্ত করেছে। উন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, চীন ও যুক্তরাজ্য তাদের নিজ নিজ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা যাচাই কৌশল প্রয়োগ করে এসব ফসল খাবার উপযোগী বলে ছাড়পত্র দেয়ার পর এসব জিএম ফসলের আবাদ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো ব্যক্তি জিএম খাদ্য গ্রহণ করে বিষক্রিয়ায় পড়েছে বা এ খাদ্য গ্রহণ করায় তার উপর কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব পড়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই বলে উল্লেখ করেছে জিএম সায়েন্স রিভিউ প্যানেল (GM Science Review Panel)। লক্ষ লক্ষ মানুষ জিএম ভুট্টা, সয়াবিন আর কেনোলা থেকে উৎপাদিত খাদ্য ভক্ষণ করছে কিন্তু তার ফলে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে মানুষের উপর এমন কোনো প্রতিবেদন নেই বলে মতো দিয়েছে ICSU। অবশ্য দু'টি সংস্থাই একথাও উল্লেখ করেছে যে, এতদিন জিএম খাদ্যের কোনো নেতিবাচক প্রভাব জনস্বাস্থ্যের উপর দেখা যায়নি বলে আগামী দিনের জিএম ফসলে জনস্বাস্থ্যের জন্য কোনো হুমকি থাকবে না একথা বলা যাবে না। তাছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে জিএম ফসল ভক্ষণ করার ফলে মানুষের উপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে সে সম্পর্কে ধারণা করা এখনই সম্ভব নয়।

৩. এলার্জেনমুক্ত জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্য

প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতির মতো জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট ফসলে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান বিষাক্ত প্রোটিন বা অন্যান্য ক্ষতিকারক যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটতে পারে। প্রচলিত পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত ফসলে এসব প্রাকৃতিক পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধি যাই ঘটুক না কেনো তার জন্য কোনো রকম বাড়তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাধারণত করা হয় না। যদি কোনো জানা এলার্জেন উৎস থেকে জিন ফসলে নেওয়া হয়ে থাকে এবং যদি দেখা যায় যে তা মানুষে এলার্জির পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে তবে সেরকম জিএমও আবাদ না করাই উত্তম। জিএম ফসলের বাণিজ্যিক আবাদ শুরু করার পূর্বে অথবা জিএম খাদ্য বাজারজাত করার পূর্বে এগুলোর মধ্যে জানা অজানা কোনো এলার্জেন রয়েছে কি-না তা জেনে নেবার জন্য নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। বিজ্ঞানীদেরও অভিমত এই যে, এসব ফসলের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যায়ন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকা দরকার এবং এগুলোর মূল্যায়ন পদ্ধতি যেন আরও উন্নত ধরনের হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

৪. আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন

জিএম ফসল নিয়ে মানুষের মনে অনেক আশংকা, অনেক প্রশ্ন। জিএম নিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ যে প্রশ্নটি সেটি এই যে, বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকারী যেসব জিন ফসলে ঢুকিয়ে দিয়ে জিএম ফসল তৈরি করা হয় সেসব জিন বা জিনের উৎপাদিত পণ্য মানুষের জন্য ক্ষতিকারক কি-না। আসলে নির্দিষ্ট জিএম ফসল ভিত্তিক আলোচনা করা গেলে কেবল এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসলের কথা ধরা যাক। আগাছানাশক যেসব জিন ফসলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এরা কিন্তু বিষাক্ত জিন নয়। বরং এগুলো আগাছানাশকের বিষক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয় নানা কৌশলে। অথবা ফসলের যেন আগাছা নাশক কোনো ক্ষতি করতে না পারে, এসব জিন বা এগুলোর প্রোডাক্ট সে কাজটি করে। এমনিতে জিনগুলো কিন্তু বিষাক্ত নয়। ফলে অন্য সাধারণ জিনের মতো এসব জিনও মানুষ বা কীটপতঙ্গের দেহে সহজেই পরিপাক হয়ে যায় কোনো রকম বাড়তি ঝামেলা সৃষ্টি না করেই।

মানুষ সারাদিন বহু জিন ভক্ষণ করে তার খাদ্য গ্রহণ করার কারণে। মানুষের সারাদিন ভক্ষণকৃত জিনের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এসব জিন বা ডিএনএ মানুষের পরিপাকতন্ত্রে নানা রকম এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গিয়ে কোষে কোষে আত্তীকৃত হয়ে যায়। বাইরে থেকে জিএম ফসলে সংযোজিত জিনও একই নিয়মে ভেঙে কোষে আত্তীকৃত হয়ে যায়। এর জন্য কোনো বাড়তি ঝামেলাই পোহাতে হয় না মানুষকে।

৫. কীটনাশক প্রতিরোধী জিন

কীটনাশক প্রতিরোধী জিনটি নিজে কিন্তু বিষাক্ত নয়। এ জিন ক্রিয়ার ফলে যে প্রোটিনটি তৈরি হয় তাও সরাসরি বিষাক্ত নয়। বরং পরিপাকের সময় এর রূপান্তরিত

ক্ষুদ্রাকার রূপটি বিষাক্ত, যার প্রভাবে কীটপতঙ্গ মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে। সাধারণত কীট প্রতিরোধী জিএম ফসল সৃষ্টির জন্য যে জিনটি ফসলে সংযোজন করা হয় তাকে বলা হয় Bt জিন। আর এ জিন যে প্রোটিন তৈরি করে এর নাম ক্রিস্টাল প্রোটিন। কীটপতঙ্গের দেহে এ প্রোটিনটির বিপাক ক্রিয়ার জন্য যে রিসেপ্টর (receptor) দরকার এদের কোষে তা বিদ্যমান রয়েছে বিধায় এ প্রোটিনটি ভেঙে যায়। ফলে ক্ষুদ্রাকার বিষাক্ত রূপটি তৈরি হয়। এর ক্রিয়ার ফলেই কীটপতঙ্গ মারা যায়। ফলে প্রশ্ন আসে মানুষ যখন Bt ফসল ভক্ষণ করে তখন Bt ফসলে বিদ্যমান জিন বা জিনের প্রোডাক্ট মানুষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে কিনা।

মজার বিষয় এই যে, মানুষের দেহে Bt জিনের উৎপাদ এন্ডোট্রক্সিন (endotoxin) প্রোটিনটিকে পরিপাক করার পূর্বশর্ত যে রিসেপ্টর তা মানুষে বিদ্যমান নেই। ফলে মানুষের দেহে এ প্রোটিনটির বিপাক প্রক্রিয়া শুরু হবার কোনো সুযোগ নেই। এটি তাই মানুষের দেহে থেকে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই অপরিপাককৃত অবস্থায় মলের সাঙ্গে বেরিয়ে আসে। হজম না হলে কোষে এর নির্যাস আত্তীকৃত হবার সুযোগ নেই বলে অক্ষত অবস্থায় এ প্রোটিনটি বাইরে চলে আসে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে গরু ও ছাগলকে নিরন্তর কয়েক মাস Bt জিনসমৃদ্ধ এসব খাবার খাওয়ানো হয়েছে। এরপর এসব গরু আর ছাগল জবাই করে এগুলোর হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, লিভার, ক্ষুদ্রান্ত্রসহ সম্ভাব্য যেসব অঙ্গে বিষক্রিয়ার চিহ্ন থাকতে পারে বলে মনে করা হয়েছে সেসব অঙ্গ আলাদা করে নিয়ে নানারকম আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। গরু ছাগলের পরীক্ষিত এসব কোনো অঙ্গেই জিএম গ্রহণকারী গরু ছাগলের সাথে জিএম গ্রহণ না করা গরু ছাগলের কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। কোনো রকম বিষক্রিয়ার নমুনা এতে পাওয়া যায়নি বলে দাবী করেছে বিজ্ঞানীরা। তাছাড়া এগুলোর মধ্যে আচার আচরণগত কোনো পার্থক্যও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেননি। ফলে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, Bt জিনের আমিষ মানুষের জন্যও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ইদানীংকালে কীট প্রতিরোধী জিএম ফসল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলে বিদ্যমান নানারকম বিষাক্ত প্রোটিন উৎপাদনক্ষম জিন। এসব গাছপালা বা ফসলের জিন ফসলের উৎপাদিত পণ্যের সাথে নিয়মিত ভক্ষণ করা হচ্ছে। শিমজাতীয় ফসলের বহু প্রজাতিতে রয়েছে এসব কীট প্রতিরোধী জিন। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যায়। শিমে আলফা এমাইলেজ প্রতিবন্ধক (α-amylase inhibitor) জিন রয়েছে। এর কীট বিনাশী ক্ষমতা রয়েছে। এখন এ জিনটি অন্য কোনো শিম জাতীয় ফসলে ঢুকিয়ে যদি কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ প্রতিবন্ধক এনজাইমটি মানুষের এবং কীটপতঙ্গের আলফা এমাইলেজকে নষ্ট করে দেয়। এটা জেনে হোক আর না জেনে হোক পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ শিম ভক্ষণ করার ফলে এ প্রোটিনটিও ভক্ষণ করেছে। এতে মানুষের দেহে কোনোরকম বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে এ জিনটি অন্য কোনো শিমজাতীয় ফসলে বা অন্য কোনো ফসলে সংযোজন করা

হলে বাড়তি কোনো ঝামেলা সৃষ্টি হবার কথা নয়। বরং তা নিরাপত্তার দিক থেকে হুবহু পূর্বের মতই থাকার কথা। শিম রান্না করে খেলে এ জিনটি ভেঙে যায় এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবটি আর থাকেনা। ফলে যুগ যুগ ধরে শিমজাতীয় ফসল ভক্ষণ করেও আমরা টিকে আছি।

ইদানীংকালে জিএম সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত কারিগরি কৌশল যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিএম ফসল যেন পরিবেশ বান্ধব এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় সে লক্ষ্যে জিন প্রযুক্তিতে নিয়ে আসা হচ্ছে নানা রকম রূপান্তর। বিশ্বব্যপী জিএম নিয়ে মানুষের যে আশংকা ও আকাঙ্খা সব কিছু বিবেচনায় নিয়েই আসছে অনেকটাই পরিশিলিত দ্বিতীয় বংশধর (second generation) জিএম।

কোন ধরনের কীটপতঙ্গ গাছের কোন কোন অঙ্গে আক্রমণ ঘটাচ্ছে এসব বিবেচনায় নিয়ে সংযোজিত জিনগুলোকে কেবল নির্দিষ্ট অঙ্গে কর্মক্ষম করা যায় কি-না সে ব্যবস্থাও নিচ্ছে প্রযুক্তিবিদরা। আসলে অঙ্গ নির্দিষ্ট প্রোমোটার (organ specific promoter) জিনের সাথে জুড়ে দিলে জিনটির কেবল নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রকাশিত হবার কথা। পাতায় আক্রমণ ঘটায় যেসব পোকা উপযুক্ত প্রোমোটার জিনের সাথে জুড়ে দিলে কেবল পাতাতেই জিনটির প্রকাশ ঘটবে। ফলে পাতা ভক্ষণকারী কীটপতঙ্গ দমন হবে প্রোটিনটি গ্রহণ করলে। ফলে বীজে বা তক্ষণযোগ্য অংশে যদি জিনটির প্রকাশই না ঘটে তাহলে সেসব স্থানে প্রোটিনটি আর তৈরি হবে না। সেরকম জিএম ফসল মানুষের কোনো ক্ষতি করার সুযোগ পাবে না। আগামীতে এ ধরনের জিএম ফসল নিয়ে শঙ্কা অনেকটাই হ্রাস পাবার কথা।

৬. এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন

জিএম ফসল নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হবার বড় কারণ হলো জিনের সাথে জুড়ে দেয়া এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী (antibiotic resistant) জিন। যে কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে ফসলে স্থানান্তর করা হবে সে জিনটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এর সাঙ্গে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন জুড়ে দেয়া হয়। এ জিনটি যে কোষেই থাকুক না কেনো কোষ আবাদ মাধ্যমে নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে সহজেই সে কোষটিকে আলাদা করা সম্ভব। প্রথম বংশধর জিএম ফসলেই এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে জিনের সঙ্গে। এ মার্কার জিনটি নিয়ে খোদ বিজ্ঞানীদের নিকট থেকেও আপত্তি উঠেছে। জিএম ফসলে এ জিনটি থেকে যায় বহু দিন। খাবারের মধ্যে রয়ে যায় এ জিনটি বা এর উপাদান। খাদ্যে এ জিন বা এর উপাদানের উপস্থিতিতে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই বলে বিজ্ঞানীরা মতো দিয়েছেন। তবে এ জিনটি যদি কোনোভাবে মানুষের দেহে ঢুকে যায় তবে মানুষ সেই নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে যেতে পারে। অথবা মানুষের অন্ত্রের মধ্যে বাস করছে যেসব অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া আমাদের ভক্ষণ করা খাদ্যের মধ্য থেকে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন সেসব ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে চলে গেলে এবং ব্যাকটেরিয়ার

সোনালি ধানের অধিক ভিটামিন 'এ', সায়ানাইড মুক্ত ক্যাসাবা, হ্রাসকৃত এলার্জেন পদার্থ যুক্ত বাদাম ও গম ইত্যাদি জিএম খাদ্যের গ্রহণযোগ্যাতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তাছাড়া কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস, উৎপাদিত পণ্যে কীটপতঙ্গ বা রোগজীবাণুর কারণে সৃষ্ট অণুজীবীয় বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় জিএম খাদ্য মানুষের নিকট অধিক সমাদৃত হবার কথা।

২০০৩ সনের ৩০শে জুন থেকে ৭ই জুলাই-এ অনুষ্ঠিত Codex Alimentrarius Commision এর ২৬ তম সেশনে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত খাদ্য মান মূল্যায়নের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সমঝোতা স্মারক (Memorundendum of Understanding, MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সভায় খাদ্য নিরাপত্তা পরিমাপের গাইডলাইনও অনুমোদিত হয়েছে। এমনকি রিকম্বিনেন্ট DNA সংযোজিত অণুজীবকে ব্যবহার করে যেসব খাদ্য তৈরি করা হয় এগুলোর মান নিয়ন্ত্রণের উপায়ও নির্ধারিত হয়েছে। জিএম খাদ্যে পরিচিতি প্রদানের (labelling of GM food) বিষয়টিও এ সভায় উঠে এসেছে। মোটামুটি একটি সমঝোতাও এসেছে লেবেলিং নিয়ে। সামনে যেকোনো সময় এ নিয়ে সমঝোতা স্মারক করবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো। এভাবে জিএম ফসল আর জিএম খাদ্য ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

উনবিংশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্যে পরিচিতি প্রদান

১. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের পরিচিতি

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্য নিয়ে সংবাদ মাধ্যমসহ নানা জনের নানা রকম মত রয়েছে। জিএম প্রযুক্তি ও জিএম খাদ্য সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে নেতিবাচক আলোচনা তুলনামূলকভাবে অধিক হয়েছে। ফলে জিএম খাদ্য সম্পর্কে যে ভালো কিছু জানে না সেও জিএম খাদ্য বিষয়ে বেশ আশংকিত। অনেকে শুধু শুধু এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, অনেকে সবকিছু বুঝে শুনেও। অনেকের অবস্থান আবার জিএমের পক্ষে। তারা আপাতত নেতিবাচক কোনো প্রভাব জিএম খাদ্যের রয়েছে তা মানতে রাজি নন। জিএম প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা বরাবরই জিএম খাদ্যের পক্ষে। অনেকটা নিজের প্রোডাক্টের প্রতি মানুষের যেমন পক্ষপাত থাকে তেমনটা। জিএম নিয়ে আমাদের যার যা অবস্থান থাকুক না কেনো জিএম খাদ্য বা জিএম প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা খেয়ে চলেছি। জিএম সয়াবিন ফসল থেকে পাওয়া সয়াবিন তেল আমাদের নিত্যদিনের সাথী।

২. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্য নিয়ে আশংকা

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্য নিয়ে নানা আশংকা আর সন্দেহের কারণে আনেকের মতামত হলো জিএম খাদ্যে পরিচিতি প্রদান করা বা লেবেলিং দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ খাদ্যে এটি লিখে দেয়া যে জিএম ফসল থেকে এটি তৈরি করা হয়েছে–যেন যে ব্যক্তি জিএম খাদ্য খাবে সে জেনে শুনেই খাবারটা গ্রহণ করে। তাতে করে ভোক্তারা জিএম এবং নন–জিএম খাদ্য থেকে তার পছন্দের খাদ্যটি বেছে নিতে পারবে। মানুষ কি খাচ্ছে তা তাকে জানতে দেওয়া বেশ জরুরিও বটে। অনেক ভোক্তা মনে করেন কোনো খাদ্য কোথা থেকে তৈরি হয়েছে বা খাদ্যে কি রয়েছে এটি জানা তার অধিকার। কোনো খাদ্যকে গ্রহণ করা এবং কোনো খাদ্যকে বর্জন করার অধিকার এটি। নিজস্ব রুচি আর পছন্দমাফিক খাদ্য বাছাই করে নেওয়ার বিষয় এটি। অনেক দেশই জিএম খাদ্যে পরিচিতি প্রদানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এসব খাদ্যে পরিচিতি প্রদানের জন্য কি কি তথ্য থাকা দরকার সে লক্ষ্যে কোনো কোনো দেশে ইতোমধ্যে বিধি বিধান অনুমোদন করা হয়েছে। কোনো কোনো দেশে আবার বিধি বিধান তৈরির কাজ চলছে।

৩. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্যে লেবেলিং

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিএম খাদ্যে লেবেলিং বা পরিচিতি প্রদানের যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বিগত ২০০৩ সনের ৩০ শে জুন থেকে ৭ই

জুলাই-এ অনুষ্ঠিত FAO/WHO এর Codex Alimentarius Commission এর ২৩ তম সেশনে কয়েকটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ যুগান্তকারী ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট খাদ্য মূল্যায়নের নীতিমালা, রিকম্বিনেন্ট-DNA উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের খাদ্য নিরাপত্তা পরিমাপ করার গাইডলাইনসমূহ এবং রিকম্বিনেন্ট-DNA জীবাণু ব্যবহার করে প্রাপ্ত খাদ্যের খাদ্য নিরাপত্তা পরিমাপ করার গাইডলাইনসমূহ। কমিশনের এ সভায় চতুর্থ ডকুমেন্ট হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল জিএম খাদ্যে লেবেলিং বা পরিচিতি প্রদানের বিষয়টি–যা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। কৌলিক রূপান্তরকরণ বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত খাদ্যে লেবেলিং-এর খসড়া গাইডলাইন নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা চলছে। কোনো কোনো প্রশ্নে কমিশন এখনো একমত হতে পারেনি বটে, তবে অনেকেই এটি অনতিবিলম্বে অনুমোদিত হবে এ বিষয়ে আশাবাদী। গাইডলাইনে খাদ্য এবং খাদ্যের উপাদান লেবেলিং করার জন্য তিনটি অবস্থার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হলো- (১) যখন জিএম খাদ্য বা খাদ্যের কোনো উপাদান প্রচলিত খাদ্য বা খাদ্যের উপাদান থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন রকমের হয়, (২) যখন খাদ্যে জিএম বা জিই জীব দিয়ে গঠিত হয় বা খাদ্যে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো প্রোটিন বা DNA থাকে এবং (৩) যখন খাদ্যে কোনো জিএম/জিই জীব থাকে না কিন্তু জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট প্রোটিন বা DNA থেকে খাদ্য তৈরি করা হয় তখন খাদ্যে লেবেল প্রদান জরুরি হয়ে পড়ে।

'International Council for Science' (ICSU)–এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা লেবেলিং–এর সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হতে পারেনি। প্রচলিতভাবে বিভিন্ন খাদ্যের আবশ্যিকভাবে লেবেলিং করার উদ্দেশ্য হলো ভোক্তাদের সেসব খাদ্য শনাক্ত করতে সাহায্য করা যেসব খাদ্যে এলার্জেন বা অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি থাকতে পারে। খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ভোক্তারা যেন খাদ্য নির্বাচন করে নিতে পারে সেজন্যও অনেক খাদ্যে লেবেল প্রদান করা হয়। অনেক ভোক্তা রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত সবজি থেকে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত সবজি অধিক পছন্দ করেন। অনেক ভোক্তা নৈতিকভাবে কোনো কোনো খাদ্য থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চায়, আবার অনেক ভোক্তা ধর্মীয় কারণে অনেক খাবার বর্জন করে। লেবেলে কি কি তথ্য দেওয়া হয় এটিও দেশে দেশে একরকম নয়। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত কোনো সাধারন গাইডলাইন বর্তমানে বিদ্যমান না থাকায় নিজ নিজ দেশের আঙ্গিকে বিভিন্ন দেশ লেবেলিং করার বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন তৈরি করছে।

৩.১ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের লেবেলিং পরিস্থিতি

বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে লেবেলিং অবস্থাটা পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে জিএম লেবেলিং-এর বর্তমান অবস্থাটা কি। কানাডাতে যেসব খাদ্যে নিরাপত্তাজনিত বিষয় যেমন এলার্জেন উপাদান থাকলে বা কোনো পুষ্টি উপাদানের পরিবর্তন ঘটে থাকলে অবশ্যই এর জন্য খাদ্যে বিশেষ লেবেলিং করতে হয়। এ লেবেলিং দেখে বোঝা যায়

কি ধরনের পরিবর্তন খাদ্যটিতে আনা হয়েছে। তবে ফসল বা খাদ্যের উৎপাদক খাদ্যে জিএম উপাদান রয়েছে কিনা সে তথ্য লেবেলে উল্লেখ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে যেসব খাদ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে সেসব খাদ্য অবশ্যই লেবেলিং করতে হয়। বিশেষ করে পুষ্টিমানে যদি কোনো পার্থক্য হয়ে থাকে বা যদি জিএম উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত খাদ্যে ব্যবহৃত সাধারণ নাম দেখে তা বোঝা না যায়, তবে লেবেলিং প্রদান বাধ্যতামূলক। তবে উৎপাদক সংস্থা যেন সঠিক, অবিভ্রান্তমূলক ও সত্য বিষয় লেবেলে বর্ণনা করে এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সনের জানুয়ারিতে খাদ্য এবং ওষুধ প্রশাসন থেকে একটি খসড়া গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে।

৩.২. ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যে খাদ্যে লেবেলিং

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যে খাদ্যে লেবেলিং বিষয়ে বেশ কড়াকড়ি রয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লেবেলিং নীতিমালা অনুযায়ী কোনো খাদ্যে যদি জিএম উপাদান বা তা থেকে উদ্ভূত কোনো উপাদান শতকরা ০.৯ ভাগের বেশি থাকে তবে খাদ্যটি লেবেলিং করতে হবে। সেসব দেশে জিএম পশু খাদ্যেও লেবেলিং করা আবশ্যক হয়। জিএম পশু খাদ্য খেয়ে যেসব পশু দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদন করে এগুলোর লেবেলিং করার প্রয়োজন হয়। অবশ্য ১৯৯৭-এর পর থেকে যেসব খাদ্যে জিএম উপাদান রয়েছে উপাদানের মাত্রা নির্বিশেষে তা লেবেলিং করতে হয়। এসব দেশগুলোতে যেসব উদ্ভিজ্জ তেলে এবং অন্যান্য পরিচিত প্রোডাক্টে জিএম DNA বা জিএম থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন বিদ্যমান নেই তারও লেবেলিং করতে হয়।

৩.৩. অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে খাদ্যে লেবেলিং

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে বাধ্যতামূলক লেবেলিং প্রদানের বিষয়টি চালু হয়েছে ২০০১-এর ডিসেম্বর থেকে। এখানে লেবেলিং করতে হয় সেসব খাদ্যে যাদের পরিবর্তিত খাদ্য মান রয়েছে বা যখন খাদ্যে জেনিটিক রূপান্তরের মাধ্যমে পাওয়া কোনো DNA বা প্রোটিন থাকে। যেসব খাদ্য জিএম ফসল থেকে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু যাতে অপূর্ববিদিত DNA বা প্রোটিন নেই যেমন- তেল, চিনি, শর্করা ইত্যাদি লেবেলিং করার প্রয়োজন হয় না। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ছাড়া অন্য কোনোভাবে জেনেটিক্যালি রূপান্তরিত খাদ্যের লেবেলিং-এর প্রয়োজন হয় না।

৩.৪. জাপান ও কোরিয়ায় খাদ্যে লেবেলিং

জাপানের কৃষি, বন ও মৎস্য মন্ত্রণালয় ২০০১ সনের ১লা এপ্রিলে একটি লেবেলিং রূপরেখা তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত (end product) খাদ্যে যদি কোনো বায়োটিক DNA বা প্রোটিন থাকে, তবে সেসব খাদ্য অবশ্যই লেবেল করতে হয়। জাপানে অনুসৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো খাদ্যের মোট ওজনের শতকরা ৫ ভাগের অধিক রিকম্বিনেন্ট DNA উপাদান থাকলে তা লেবেলিং করতে হয়।

কোরিয়ার খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (KFDA) যখন কোনো খাদ্যে জিএম ভুট্টা, সয়াবিন বা গজানো সয়াবিন থেকে তৈরি করা হয় অথবা প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যে ৫টি প্রধান

উপাদানের তিনটি অর্থাৎ জিএম ভুট্টা, সয়াবিন বা গজানো সয়াবিন (soybean sprout) যদি থাকে তবে তাতে লেবেলিং করতে হবে।

জিএম খাদ্যে লেবেলিং-এর বিষয়টি এখন এতদূর গড়িয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কতকগুলো বাণিজ্যিক অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রের জিএম প্রোডাক্ট ওসব দেশে রপ্তানি করতে হলে অবশ্যই লেবেলিং থাকতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। এসব অনেক দেশ নিজেরা জিএম আবাদ করছে না কিন্তু এতদিন এরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লেবেলিং ছাড়া জিএম খাদ্য গ্রহণ করতো। কিন্তু এখন এসব খাদ্যে বাধ্যতামূলকভাবে লেবেলিং প্রদান করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর এসব দেশগুলোর চাপ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য জিএম খাদ্য লেবেলিং করাকে বাণিজ্যিক অবরোধের মতো মনে করছে।

৪. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্যে লেবেলিং সমস্যা

জিএম খাদ্য লেবেলিং করার বিষয়টি কিন্তু বেশ জটিল। কারণ কৃষকের মাঠ থেকে উৎপাদিত পণ্য থেকে শুরু করে তা বহন করা, বাজারজাত করা, সংরক্ষণ করা, তা থেকে কোনো কোনো পণ্য উৎপাদন, খাদ্যে এর প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডেই জিএমকে চিহ্নিত করে রাখার প্রয়োজন হয় যা খুব সহজ কাজ নয়। তবে কোন খাদ্যটি জিএম ফসল বা রিকম্বিনেন্ট DNA থেকে এসেছে আর কোনটি প্রচলিত ফসল থেকে এসেছে তা বলা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। সব ক'টি পর্যায়ে লেবেলিং রক্ষা করতে হলে যে সতর্কতা ও রেকর্ড রাখার প্রয়োজন হবে, তাতে জিএম খাদ্যের দাম অনেক বেড়ে যাবে।

জিএম ফসল বা জিএম খাদ্যে লেবেলিং করতে হলে দরকার প্রথমেই মান ধার্য করা এবং কোনো প্রতিষ্ঠান কিভাবে তা করবে তা ঠিক করা। নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে সঠিকভাবে মানটি নির্ধারণের জন্য জনবল ও প্রযুক্তিগত সুযোগ। যেসব খাদ্যের মূল উপাদান জিএম এগুলোর হয়তো সহজে শনাক্ত করা যায় কিন্তু প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য যেমন— তেল, চিনি এবং শর্করার জিএম উপাদান নির্ধারণ করা এত সহজ নয়। কোনো খাদ্যে DNA বা প্রোটিনের উপস্থিতি না থাকলে এগুলো শনাক্ত করা খুব কষ্টকর।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য লেবেলিং কতটা সুফল বয়ে আনবে তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ খাদ্য খোলা অবস্থায় গ্রাম্য বাজারগুলোতে বিক্রয় হয়ে থাকে। এসব খাদ্যে লেবেলিং করার কোনো সুযোগ নেই। কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্য যেভাবে নানা হাত ঘুরে ভোক্তাদের হাতে এসে পৌঁছে তা বেশ জটিল। ফলে কোন পণ্যটি জিএম আর কোনটি জিএম নয়, সেটি চিহ্নিত করে রাখা বেশ দূরূহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অসম্ভবও। এমনকি শহরগুলোতেও বাজারে লেবেলিং ছাড়াই খাদ্য বিক্রি করা হয়। হাতে গোনা অল্প ক'টি সুপার মার্কেটে কিছু কিছু প্রোডাক্টের উপর লেবেলিং থাকলেও তা থেকে অনেক তথ্য পাওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য এগুলোতে দেয়া নেই বললেই চলে।

৫. বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্যে লেবেলিং

বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ফলাতে আরও বেশ কিছু দিন সময় লেগে যাবে। কিন্তু তা যত সময়ই লাগুক জিএম খাদ্য বা জিএম প্রোডাক্ট এদেশে চলে আসতে শুরু করেছে বেশ আগে থেকেই। সয়াবিন তেল, টমেটো কেচআপ ইত্যাদির মাধ্যমে জিএম জিনের প্রোডাক্ট আমরা ভোগ করতে শুরু করেছি। এসব তেলে জিনের প্রোডাক্টটি অক্ষত থাকার কোনো সুযোগ নেই। ফলে আমদানি করা তেলে সরাসরি জিনের প্রোডাক্ট নেই বলে তা জনস্বাস্থ্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে জানা কঠিনই হবে। আর আমাদের ল্যাবগুলোতে যা প্রস্তুতি তাতে করে এসব বিষয়ে পরীক্ষা করে কোনো তথ্য পাওয়া অসম্ভবই হয়ে পড়বে। জিএম ফসল এ দেশে আবাদ করার পূর্বে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি আমাদের দরকার তার মধ্যে প্রাণরাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা বেশ জরুরি বলে মনে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দিবে তেমনটি আমরা প্রত্যাশা করি। খাদ্যে সঠিক লেবেলিং তথা পরিচিতি প্রদানের জন্যও এদিকে নজর দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল নিয়ে নানা প্রশ্ন

১. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও জিজ্ঞাসা

নতুন কোনো বিষয় জানবার মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে মানুষের আগ্রহ আর কৌতূহল যে একটু বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক। আর যেসব আবিষ্কারের সাথে মানুষের দৈনন্দিন খাবারের বিষয়টি জড়িত থাকে তা নিয়ে মানুষ যে অধিকতর ভাববে কথা বলবে সেটাই স্বাভাবিক।

কোনো খাদ্য গ্রহণের এবং কোনো খাদ্য বর্জনের এ দু'রকম অধিকারই মানুষের রয়েছে। কোনো খাদ্য গ্রহণ করলে তা যদি জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় তাহলে তা নিয়ে মানুষ অবশ্যই কথা বলবে। কোনো খাদ্য যদি পরিবেশকে বিষিয়ে তুলে বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে তা নিয়েও মানুষ কথা বলবে। কোনো ফসল বা খাদ্য যদি মানুষের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাহলে তা নিয়েও মানুষ কথা বলবে।

২. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল নিয়ে জিজ্ঞাসার ইতিবাচক দিক

জিএম ফসল নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এর কিছু প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক, এগুলোর জবাব তার জানা দরকার। কিছু প্রশ্ন সন্দেহের, এসবের জবাব পেলে ভাল হয়। কোনো কোনো প্রশ্ন ভিত্তিহীন তবে নানাভাবে এগুলো মানুষকে ভাবায়, মানুষের মনে একটি মিথ্যে ভয় জাগিয়ে তুলে।

জিএম নিয়ে মানুষের নানা প্রশ্ন, নানা সমালোচনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ নিয়ে যে আশংকা তা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের লাভবান করে তোলে।

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে জিএম সৃষ্টির ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা সমালোচনার কারণে বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উৎকর্ষ সাধনে সদা সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় বংশধর জিএম ফসল (second generation GM Crop) এ কারণেই প্রথম বংশধর জিএম ফসল (first generation GM Crop) অপেক্ষা আরও পরিশীলিত।

গণমাধ্যমে জিএম নিয়ে নানারকম আলোচনার ফলে জিএম প্রযুক্তি আরো আধুনিক হয়েছে আরো উন্নত হয়েছে এবং অধিকতর নিরাপদ হতে পারছে। আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ সত্যটাকে জানতে পারে। অজানা অনেক কথা অনেক জিজ্ঞাসার জবাব মিলে যায়। এর মধ্য দিয়ে মানুষ নিশ্চিত হয়ে কোনো খাদ্যকে গ্রহণ করা অথবা বর্জন করার সুযোগ পায়।

৩. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল নিয়ে চিন্তাধারা

পৃথিবীতে জিএমও নিয়ে মানুষের মধ্যে তিন রকমের ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি ধারা হলো জিএমও, জিএম ফসল এসব নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক ধারা। এ ধারার পক্ষে যারা তারা জিএম প্রযুক্তির মধ্যে যে বিজ্ঞানটা নিহিত তা নিয়ে সন্তুষ্ট। গণ মাধ্যমে এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে তাদের আগ্রহ খুব একটা নেই। আর একটি ধারা রয়েছে জিএমও, জিএম খাদ্য নিয়ে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নেতিবাচক। এ ধারার অনেকেই পরিবেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত। তাদের মধ্যে অনেকে আবার গণমাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে খুব আগ্রহী। নিজেদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তারা সচেষ্ট। আর একটি ধারাও রয়েছে জিএম খাদ্য নিয়ে। তারা জিএম নিয়ে জানতে চায়, জেনে-বুঝে-শুনে তবেই একে গ্রহণ বা বর্জন যা যুক্তিসঙ্গত তা-ই করতে চায়। নিজেদের বুঝতে না পারার কারণে বা ভুলবশত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রযুক্তি যেন আমরা ছুঁড়ে না ফেলি, আবার প্রযুক্তির প্রতি অন্ধ মোহ বা অর্থলাভের লিপ্সা যেন আমাদের নিকট একটি অগ্রহণযোগ্য প্রযুক্তিকে গ্রহণযোগ্য করে না তোলে এটিই তাদের উদ্দেশ্য।

৪. নৈতিক প্রশ্ন

জিএম ফসল নিয়ে একটি প্রশ্ন হলো, কোনোরকম বাছ বিচার ছাড়া যে কোনো জীবের জিন ফসলে ঢুকিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত বা নৈতিক। এ প্রশ্নটি যাদের মনে আসে তাদের যুক্তি হলো এই যে, দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের ফসল আজকের রূপটি পরিগ্রহ করেছে। প্রাকৃতিক ও মানুষের নির্বাচনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় ফসলের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড এগিয়েছে। এতদিন একটি ফসল প্রজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন জাতসমূহের মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটিয়ে ফসল উন্নয়নের কাজ এগিয়েছে। কখনো কোনো ফসলের নানা জাতের মধ্যে পর-পরাগায়ন সৃষ্টি করেছে নানা রকম ভিন্নতা। আর এসব ভিন্নতা থেকে মানুষ বাছাই করে নিয়েছে নানা জাত। কোনো ফসল প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার কারণেই এখন আর গ্রহণ করতে পারছে না অন্য প্রজাতি, অন্য গণ, অন্য পরিবার, অন্য শ্রেণী বা অন্য কোনো জীবের জিন। প্রকৃতি দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদের মধ্যে ক্রসিং করার যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, জিএম প্রযুক্তি তাকে অগ্রহ্য করছে। অন্য ফসল, অন্য জীব বা অণুজীব অর্থাৎ যে কোনো জীবজ উৎস থেকে নিয়ে এসে জিন এখন অবলীলায় ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে ফসলে। সে ফসল আমরা খাচ্ছি। এ বিষয়টি অনেককে ভাবিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং এটি করা বিজ্ঞানীদের উচিত হচ্ছে কিনা সেটিই হলো প্রশ্ন।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, সব জীবের মধ্যে আশ্চর্যরকম মিল রয়েছে তাদের ডিএনএ-র গঠনে। সব জীবের ডিএনএ একই উপাদান দিয়ে তৈরি। সবার ডিএনএ-তে রয়েছে একই নাইট্রোজেন ক্ষারক, ফসফেট আর সুগার। সব জীবের ডিএনএ-এর মধ্যে এ সাজুয্য আছে বলেই এক জীবের জিন কর্তন করে অন্য জীবে ঢুকিয়ে দিলে সেখানে সে কাজ করতে পারে। কি ভাইরাস, কি

ব্যাকটেরিয়া, কি বট গাছ, কি ধান গাছ সবার ডিএনএ-এর মিলকে কাজে লাগিয়েছেন বিজ্ঞানীগণ। জিনের প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই বলে জিএম ফসলে সংযোজন করা যেতে পারে নানা জীবের জিন। ফলে ঔচিত্যবোধ আর নৈতিকতার যে প্রশ্ন উঠেছে তা রেখাপাত করছে না বিজ্ঞানীদের মনে, যৌক্তিক কারণেই এসব জিনকে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে ভাবছেন বিজ্ঞানীরা।

৫. পেটেন্টের প্রশ্ন

জিএম সৃষ্টির কাজের সাথে জড়িত রয়েছে ধনী দেশগুলোর প্রাইভেট বীজ কোম্পানি বা বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এসব প্রতিষ্ঠান অনেক অর্থ ব্যয় করছে জিএম প্রযুক্তির পেছনে। অনেক মেধা, শ্রম আর অর্থের মাধ্যমে এক একটি জিএম ফসল তৈরি করা হচ্ছে বিধায় এসব জাতের মেধাস্বত্ব জাত উদ্ভাবনকারী প্রজননবিদ, কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের।

অধিকাংশ জাতই কোনো না কোনো কোম্পানির নামে পেটেন্ট করা। ফলে এসব জাত পৃথিবীর যেদেশে জন্মানো হোক না কেন সেই দেশের মেধাস্বত্ব আইন বা পেটেন্ট আইন অনুযায়ী জাতটির বীজ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যেদেশে ফসলের জাত রক্ষার মেধাস্বত্ব আইন নেই এসব জাতের বীজ পেতে হলে সেসব দেশে আইন করে নিতে হবে। জিএম বীজ উৎপাদনে প্রাইভেট বীজ কোম্পানির সম্পৃক্ততা এবং এসব জাতের পেটেন্ট নিয়ে মানুষের মনে দুটি ভিন্ন জিজ্ঞাসা রয়েছে।

প্রথম বিষয়টি হলো প্রাইভেট বীজ কোম্পানির বীজ উৎপাদন ও বীজ বিপণন সংক্রান্ত। জিএম ফসলের বীজ উৎপাদনের সাথে যেমন, তেমনি বীজ বিপণনের সাথে জড়িত রয়েছে নির্দিষ্ট বীজ কোম্পানি। এসব কোম্পানি তাদের মুনাফা অর্জনের জন্য সত্যকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন। ফলে তাদের কাছে প্রতারিত হবার ভয় থাকে।

বীজ সরবরাহের ভার কোম্পানির উপর বলে দু'ভাবে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। একদিকে বীজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভারটি তাদের উপর থাকে। ফলে যেকোনো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বীজের দাম বাড়িয়ে দিয়ে এরা অধিক মুনাফা হাতিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে কৃষক এসব বীজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ধীরে ধীরে এসব বীজ কোম্পানির উপর তাদের নির্ভরশীলতা বেড়ে যাবে। এরকম অবস্থায় কৃষকের নিকট বীজ সময় মতো পৌছাতে না পারলে বীজের অভাবে কৃষিখাতে তথা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ফসলের বীজের বংশবিস্তারের লক্ষ্যে বাজারজাতকরণে পেটেন্ট যে একটি বড় বাঁধা এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিষয়। এদেশে এক কৃষকের বীজ বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করে অন্য কৃষক। কৃষক কখনো নিজের বীজ নিজেই সংরক্ষণ করে। কৃষকের নিজের বীজ নিজে সংরক্ষণ করার যে চিরায়ত কৃষ্টি তা এক্ষেত্রে ব্যাহত হতে পারে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই জিএম ফসল হাইব্রিড প্রকৃতির হওয়ায় এসব বীজ কৃষকের প্রতিবছরই ক্রয়

করে নেবার প্রয়োজন হবে। তবে লাইন জাতের ক্ষেত্রে, তা বিশুদ্ধ লাইন আর ইনব্রিড লাইন যা-ই হোকনা কেনো, কৃষক নিজের ফসলের মাঠ থেকে নিজের জন্য পরের বছরের বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে।

এ দুটি প্রশ্নই বেশ শক্ত। আসলে যারা অর্থ মেধা শ্রম দিয়ে জিএম ফসলের জাত তৈরি করে তারা যে তা থেকে মুনাফা অর্জন করতে চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক। নইলে কোম্পানিগুলো বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নতুন জাত সৃষ্টির জন্য এগিয়ে আসবে না এবং এ কাজে তারা অর্থ বিনিয়োগ করবে না, ফলে এ দিকটিকে উপেক্ষা করা যাবে না। পাশাপাশি এটিও ঠিক যে, জিএম ফসলের আবাদ যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়, তবে কৃষক এ ফসলের আবাদ করতে আগ্রহী হবে এবং দ্রুত এসব ফসলের বিস্তৃতি ঘটবে। তাতে করে কৃষক বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

এসব ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় বীজের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং এ দেশে কোন নিয়ম বীজ সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবসা করা সম্ভব হবে তা দেশের প্রচলিত বীজ আইন এবং বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এ বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি এবং ফসলের জাত সংরক্ষণ সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইন অনুযায়ী করা হবে। কোনো দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির সুবিধার দিকটিকে অগ্রাধিকার দিয়েই এসব জিএম জাতের বীজ কোন দেশে আনা উচিত।

৬. বীজ সংরক্ষণের অধিকার

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক দেশে কৃষক চাষবাসের জন্য নিজের বীজ নিজেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। ফসলের ইনব্রেড জাতের ক্ষেত্রে এতদিন তা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছিল না। জিএম জাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইব্রিড প্রকৃতির। হাইব্রিড বীজের সুবিধা এই যে, এসব জাত অধিক ফলনশীল।

বীজ কোম্পানির জন্য সুবিধা এই যে, প্রতিবছর এ বীজ তৈরি করতে হয় বলে প্রতিবছর তাদের বীজ নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ থাকে। কাজেই হাইব্রিড জাতের সুফল ঘরে তুলতে হলে এসব বীজ প্রতিবছর কেনা ছাড়া কৃষকের কোনো উপায় নেই। ভুট্টা বা ধানের হাইব্রিডের ক্ষেত্রে কৃষক প্রতিবছর বীজ কিনছে নানা রকম বীজ কোম্পানির নিকট থেকে। নিজের বীজ নিজে সংরক্ষণ করার কোনো সুযোগ আর কৃষকের থাকছে না। এ বিষয়টিকে অনেকেই চিরায়িত টেকসই কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মনে করছে।

৭. মাটির উর্বরতা হ্রাসের প্রশ্ন

জিএম ফসল নিয়ে একটি প্রশ্ন হলো এগুলোর আবাদ অনেক বেশি উৎপাদন উপকরণ নির্ভর বিধায় তা মাটির জন্য অধিক ক্ষতিকারক কি-না। তাছাড়া কোনো কোনো জিএম ফসল যেমন– আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত আগাছানাশক প্রয়োগকে উৎসাহিত করে। ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় কি-না। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থাই অধিক উৎপাদন উপকরণ নির্ভর।

সার, পানি, কীটনাশক, আগাছানাশক, রোগজীবাণু দমনের জন্য রাসায়নিক ওষুধ ইত্যাদি এখন যেকোনো ফসলের আবাদের জন্যই একান্ত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। মাটির নিজস্ব উৎপাদনী শক্তি অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। ফলে জিএম ফসলের আবাদ হোক আর প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ হোক বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাপনায় মাটির উপর আরো চাপ বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৯. বছর বছর বীজ থেকে ফসল ফলানো

জিএম ফসল নিয়ে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন এই যে, জিএম ফসলের বীজ পরবর্তী বছর লাগালে তা থেকে কোনো বীজ হবে কি-না। অনেকের ধারণা জিএম বীজের সাথে টার্মিনেটর প্রযুক্তি প্রয়োগ করায় বীজ থেকে কেবল একবারই বীজ হয়, কৃষকের ফসল থেকে সংগৃহীত বীজ থেকে আর বীজ হয় না। এ ধারণাটি সঠিক নয়, কারণ কোনো জিএম ফসলের সাথে এখন আর টার্মিনেটর প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় না। ফলে কৃষক তার জিএম ফসল থেকে বীজ সংরক্ষণ করে পরবর্তী বছর মাঠে বীজ বপন করলে অবশ্যই তা থেকে বীজ হবে। তবে জাতটি যদি হাইব্রিড প্রকৃতির হয় তবে এর ফলন কিছুটা কমে যাবে। লাইন জাতের ক্ষেত্রে ফলন হ্রাসের কোনো কারণই নেই। নির্বিঘ্নে নিজের সংরক্ষিত বীজ দিয়ে ফসলের আবাদ করতে পারবে কৃষক।

একবিংশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও মেধাস্বত্ব

১. সূচনা

গত শতাব্দীর পূর্বে ফসল উন্নয়নের কাজটি মূলত কৃষকেরা করেছেন । নিজেদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই যাচাই বাছাই করে আলাদা করে নিয়েছেন তারা এক একটি ফসলের জাত। গত শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হলে উন্নত জাত সহজলভ্য হওয়ায় জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে কৃষকের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রদ্বয়ের পুনরাবিষ্কার ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যোগ করে। পৃথিবীর দেশে দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ফসলের জাত সৃষ্টিসহ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজ শুরু হয়। দেশের কৃষকদের নতুন জাতের চাহিদা পূরণ তথা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যটাই ছিল তখন ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দিনে দিনে ব্যক্তি উদ্যোগে বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয় পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে। উচ্চ ফলনশীল বা উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন ফসলের জাতের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বুঝতে পেরেই ব্যক্তি উদ্যোগে নতুন জাত সৃষ্টি শুরু করা হয়। নতুন নতুন উন্নত জাত সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন অর্থাৎ লাভজনক ব্যবসা শুরু করা যায় মনে করেই কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে ফসল উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হয় উন্নত দেশগুলোতে। একাজে তারা উচ্চ বেতনে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের নিয়োগ দেন। ফলে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় কাঙ্ক্ষিত সব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত।

২. ফসল উন্নয়নে প্রাইভেট কোম্পানি

দিনে দিনে ফসলের জাত সৃষ্টিতে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো এগিয়ে গেছে। এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে পড়ছে প্রাইভেট কোম্পানি বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কাছে। প্রাইভেট কোম্পানির ফসল উন্নয়ন খাতে অধিকতর বিনিয়োগ, বিজ্ঞানীদের মেধা, মনন ও পরিশ্রম এ সাফল্যের মূল কারণ। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের সরকার প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে এ কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করলো। কারণ ততদিনে এগুলোর উদ্ভাবিত জাত দেশের উৎপাদনে সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। ফলে সরকারও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলো। পৃথিবীর অনেক দেশেই ফসলের জাত সৃষ্টি এবং এর বাজারজাতকরণ একটি প্রতিযোগিতামূলক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বের প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ফসলের জাতের উপর মেধাস্বত্ব দাবী করলো অনেক শ্রম, অর্থ, মেধা ও মনন দিয়ে সৃষ্টি করা এক

একটি জাত যেন একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কেবল নিদিষ্ট কোম্পানি বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন করতে পারে সে কারণেই উঠে এলো এ দাবীটি। পশ্চিমা দেশগুলো ধীরে ধীরে এ দাবীর যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো। প্রাইভেট সেক্টরে ফসলের জাত সৃষ্টি এবং বীজ উৎপাদন ও বিপণনকে উৎসাহিত করার জন্য মেধাস্বত্ব প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়লো।

৩. উদ্ভিদ পেটেন্টিং

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে কোনো কোনো দেশে উদ্ভিদ পেটেন্টিং কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ১৯৩০ সালে এসে যুক্তরাষ্ট্র প্ল্যান্ট পেটেন্ট অ্যাক্ট (plant patent act) -এর মাধ্যমে অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তারক্ষম ফসলের জাত পেটেন্টিং করার কাজ শুরু করে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর প্ল্যান্ট ভ্যারাইটি প্রটেকশন (ASSINEL) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ১৯৩৮ সালে যার কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোকে ফসলের জাত রক্ষায় মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত করা। ইউরোপের অনেক দেশে এর ফলে নিজস্ব প্ল্যান্ট ব্রিডারস রাইট (Plant Breeders' Right, PBR) নামক আইন প্রণীত হয়।

কলকারখানায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের মেধাস্বত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক পূর্বেই। এগুলোর মেধাস্বত্ব আইনও হয়েছে অনেক পূর্বেই। বিশ্বব্যাপী এগুলোর ছিল তখন নানা প্রতিষ্ঠান যারা তদারকি করতো পেটেন্ট আইনের নানা বিষয়। এদেরই একটি প্রতিষ্ঠান হলো ওয়ার্ল্ড ইনট্যাল্যাকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (World Intellectual Property Organization, WIPO)। এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপের উদ্ভিদ প্রজননবিদেরা কিভাবে ফসলের জাতগুলোকে মেধাস্বত্বের মাধ্যমে রক্ষার উত্তম ও কার্যকর উপায় অনুসরণ করা চলে সে লক্ষ্যে একটি ইউনিয়ন গড়ে তুলে যাকে International Union for Protection of New Plant Varieties তথা UPOV নামে অভিহিত করা হয়।

প্যারিসে সংগঠিত UPOV- এর কনভেনশনে ১৯৬১ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে ফসলের জাতের উপর স্ব স্ব সদস্য রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ অধিকার পাবার সুযোগ এনে দেয়। ১৯৬১ সালের কনভেনশন ১৯৬৮ সালে কার্যকর হয়। বর্তমানে এর সদস্য ৩১টি দেশ। আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, কলম্বিয়া, চেকপ্রজাতন্ত্র, চিলি, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, ইসরায়েল, ইটালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং উরুগুয়ে। দিন দিন অনেক দেশ এ ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে।

UPOV কনভেনশনের দুটি প্রধান কাজ। একটি হলো- সদস্য দেশগুলোতে উদ্ভিদ প্রজননবিদদের ফসলের নতুন উদ্ভাবিত জাতের উপর অবশ্যই প্রদেয় ন্যূনতম অধিকার প্রদান করার আয়োজন করা এবং দ্বিতীয়টি হলো– ফসলের জাতের স্বত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রমিত মান নির্ধারণ করা। UPOV এর দেশগুলো সদস্য প্রজননবিদদের উদ্ভাবিত জাতগুলো রক্ষার ক্ষেত্রে নিজ দেশে উদ্ভাবিত জাতগুলোর ন্যায় একই রকম প্রতিরক্ষা

প্রদান করে। যেকোনো দেশ সঠিক উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে থাকলে UPOV এর সদস্য হতে পারে এবং সদস্য দেশসমূহের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা থেকে সুফল পেতে পারে।

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের উদ্দেশ্যসমূহ ১৯৭২, ১৯৭৮ এবং ১৯৯১ সালে নতুনভাবে পুনঃসংস্করণ করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের UPOV আইনে কেবল জাতীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত উদ্ভিদ প্রজাতির জাতের প্রতিরক্ষা প্রদান করা হতো। '৯১ সনের আইনে সব উদ্ভিদ গণ ও প্রজাতির জাত এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। '৭৮ এর আইনে একটি জাত প্রতিরক্ষার পূর্ব শর্ত ছিল স্বাতন্ত্র্য (Distinctness), সমরূপতা (Uniformity) এবং স্থায়িত্ব (Stability)। এক কথায় একে DUS বলে অভিহিত করা হয়। '৯১ সালে এসে জাত প্রতিরক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে দাঁড়িয়েছে– নতুনত্ব (Novelty), স্বাতন্ত্র্য, সমরূপতা এবং স্থায়িত্ব। জাতের প্রতিরক্ষা ছিল '৭৮ এ ন্যূনতম ১৫ বছর অথচ '৯১ তে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় ন্যূনতম ২০ বছর।

প্রজননবিদরা অবাধে ব্যবহার করতে পারতো উদ্ভাবিত জাত '৭৮ এর আইন অনুযায়ী, কিন্তু '৯১ এর আইন অনুযায়ী প্রজননবিদ জাতটি তার প্রজনন কর্মসূচিতে ব্যবহার করতে পারলেও তা থেকে সৃষ্ট নতুন জাতটির মেধাস্বত্ব থেকে যাবে আগের প্রজননবিদেরই। কৃষক এসব জাতের বীজ অবাধে নিজে সংরক্ষণ করতে পারতো '৭৮ এর আইন অনুসারে। একানব্বইয়ের আইনে এটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে জাতীয় আইনের উপর।

৪. ট্রিপস্ চুক্তি

মেধাস্বত্বের বিষয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার আয়োজনটি সম্পন্ন করে ধনী দেশগুলোর সহায়তায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization, WTO)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ট্রিপস (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) চুক্তি স্বাক্ষরের পর মেধাস্বত্ব আইনের বিষয়ে দেশগুলো একমত হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সব দেশ চুক্তি স্বাক্ষর দাতা দেশ হিসেবে এখন মেধাস্বত্ব সম্পর্কে আইন করতে বাধ্য। বাংলাদেশও স্বাক্ষর দাতা দেশের একটি। অতএব বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব দেশের আঙ্গিকে একটি মেধাসত্ত্ব আইন তৈরি করা একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রিপস চুক্তি একটি বহুপাক্ষিক মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত চুক্তি। এ চুক্তির কার্যকারিতা শুরু হয় ১৯৯৫ সনের ১লা জানুয়ারিতে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়নের শেষ সময় সীমা প্রদান করা হয়েছে ২০০৬ এর ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত। অন্তর্বর্তীকালীন সময় হিসাবে প্রদান করা হয়েছে এ এগার বছর। সংগত কারণেই উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন প্রণয়ন না করে আমাদের কোনো উপায় নেই। এ লক্ষ্যে কিছু অগ্রগতিও হয়েছে। একটি খসড়া আইন তৈরি করা হয়েছে 'উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন' নামে। এ খসড়াটি মূলত দাঁড় করানো হয়েছে UPOV ১৯৯১ আইনের আলোকে ২০০৪ সালে। এরপর ধারাবাহিকভাবে চলেছে এর পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কাজ। ২০০৮ সালে এসে খসড়া মেধাস্বত্ব আইনটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদন লাভের পর এটি এখন আইনে পরিণত হতে যাচ্ছে।

৫. উদ্ভিদ জাত রক্ষায় মেধাস্বত্ব

উদ্ভিদ জাত রক্ষার জন্য মেধাস্বত্ব আইনের আওতায় কোনো নতুন জাতের স্বত্ব পেতে হলে চারটি শর্ত পূরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। শর্তগুলো হলো :

(১) জাতটিকে অবশ্যই নতুন হতে হবে। উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন দিয়ে জাতটি সংরক্ষিত হবার পূর্বে এর আবাদ করা চলবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এক বছরের অধিক জাতটির বাণিজ্যিক আবাদ না করা হলে একে নতুন বলে ধরে নেয়া হবে।

(২) জাতটির স্বতন্ত্র সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলি থাকতে হবে। অঙ্গসংস্থানিক, শারীরতাত্ত্বিক বা প্রাণ রাসায়নিক এমন বৈশিষ্ট্যাবলি থাকতে হবে যা দিয়ে জাতটিকে আলাদা করে চেনা যায়।

(৩) জাতটির বৈশিষ্ট্যাবলি হবে স্থায়ী প্রকৃতির। অর্থাৎ কিনা বংশানুক্রমিকভাবে এর বৈশিষ্ট্যাবলি অবিকৃত থাকবে।

(৪) নতুন জাতটির সমরূপতা (uniformity) থাকতে হবে যেন এর উদ্ভিদগুলো দেখতে একইরকম দেখায় এবং এগুলোর পরিপক্বতা একই সময়ে সম্পন্ন হয়।

উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইনে কোনো জাত যেসব প্রতিরক্ষা পায় সেগুলো হলো–

ক) জাতটির বাণিজ্যিক উৎপাদন, এর বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়।

খ) একজন চাষী তার পরের বছরের ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে জাতটির বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে। এরজন্য কোনোরকম অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

গ) কৃষক তার ফসল ফলাবার জন্য সংরক্ষিত বীজ অন্য কৃষকের নিকট বিক্রয় বা বিনিময় করতে পারবেন না।

ঘ) উৎপাদনকারী বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় কমপক্ষে ২০ বছরের জন্য জাতটির বিপণন স্বত্ব ভোগ করবে। কোনো কোনো দেশে ২৫ বছর বা আরও অধিক সময়ের জন্য স্বত্ব প্রদান করা হয়।

ঙ) বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য রক্ষিত জাতটির বীজ বা অন্য কোনো বংশবিস্তারক্ষম অংশ ব্যবহারে কোনো বাঁধা থাকবে না।

চ) ফসল উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌলিক বিভিন্নতা (genetic variability) সৃষ্টির জন্য জাতটির ব্যবহার অনুমতি ছাড়াই করা যাবে।

অনেক দেশ উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইনে প্রজননবিদ এবং কৃষকের জন্য কিছু বিশেষ ছাড় বা অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা রেখেছে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ দ্বারা ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বত্ব রক্ষিত জাতটি ব্যবহার করতে পারাটাই হলো প্রজননবিদের জন্য বিশেষ ছাড়। উক্ত জাত বা জাতগুলো প্রজনন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে প্রজননবিদ যদি নতুন জাত তৈরি করেন তবে নতুন জাতটির স্বত্ব পাবার অধিকার প্রজননবিদ বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পাবে। তবে মেধাস্বত্ব আইন দিয়ে রক্ষিত জাতটি ব্যবহার করে

প্রজননবিদগণ যদি নতুন কোনো জাত তৈরি করেন এবং যদি নতুন জাতটিতে রক্ষিত জাতটির অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যাবলির প্রকাশ ঘটে তবে নতুন জাতটিকে অত্যাবশ্যকীয় উদ্ভূত-জাত (essentially derived variety) বলা হবে এবং যে জাত থেকে নতুন জাতটি উদ্ভাবন করা হবে সেই মূল জাতের মালিকই এর স্বত্ব পাবে। নতুন জাতটির উদ্ভাবক বা প্রতিষ্ঠান এর স্বত্ব পাবে না।

৬. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদ ও বাংলাদেশ

আমাদের দেশে জিএম উদ্ভিদ নিয়ে এখন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গবেষণা চলছে। এসব জিএম উদ্ভিদ চুক্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা হয়েছে এগুলোর দক্ষতা যাচাই করার জন্য। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এগুলোর যে কোনো একটিও যদি সফলতা প্রদর্শন করে তবে এগুলো নিয়ে শুরু হবে নিয়ন্ত্রিতভাবে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেখানেও যদি জিএম উদ্ভিদ উত্তম বলে বিবেচিত হয় তবে আসবে এর মাঠ পর্যায়ের অনিয়ন্ত্রিত যাচাই বাছাই। সবশেষে জাতটি ছাড়করণের জন্য উপযুক্ত হলে এর অনুমোদনের প্রশ্ন আসবে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত অনুমোদন লাভ করলে, আসবে এর পেটেন্ট অধিকার বা মেধাস্বত্বের প্রশ্নটি।

এসব জিএম উদ্ভিদ কোনো না কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিকট থেকে পাওয়া গেছে বলে এসব ফসলের বাণিজ্যিক আবাদের জন্য আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানকে রয়্যালটি দিতে হবে, জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে তা বিপণন করতে হবে দেশে। এ ইস্যুগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সে আরেক বিষয়। এ নিয়ে নানারকম প্রস্তুতিও নিতে হবে আমাদের। আইনী দিকগুলো নিয়েও ব্যাপক চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কৃষিতে মেধাস্বত্ব বিষয়ক আইনী লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে আমাদের ও দেশে আইন পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে।

গত কয়েক দশকে জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফসল বা পশু উন্নয়নের জন্য এখন জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। যে কোনো উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন শনাক্ত করে তা নির্দিষ্ট এনজাইম দিয়ে কর্তন করে নেয়া, এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তা সরাসরি কোনো বাহকের মাধমে ফসলে সংযোজন করে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাত তৈরি করা এখন আর কোনো কল্পনা নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে সৃষ্ট এসব জিএম ফসল বা ট্রান্সজেনিক ফসল এখন কিছু কিছু উন্নত দেশে বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করা হচ্ছে। দিনে দিনে এসব ফসল আরও অনেক দেশে আবাদের অপেক্ষায় রয়েছে। কোনো কোনো ট্রান্সজেনিক ফসলের সাফল্য এসব ফসলের প্রতি কৃষকের আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জিএম বা ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরি করার জন্য প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশের প্রাইভেট বীজ কোম্পানিগুলো। প্রচুর সময়, মেধা আর অর্থ ব্যয় করছে এসব কোম্পানি মূলত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। ফসল হোক, মাছ আর পশু হোক সব ক্ষেত্রেই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিন প্রযুক্তি। নতুন নতুন জিন সংশ্লেষণ করার কাজও এখন চলছে। উদ্ভিদ জগতের ভেতর থেকেতো বটেই এর বাইরের বিশাল জীব

জগতের যেকোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করে নেয়ার কাজও বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কষ্টলব্ধ আবিষ্কারের সুফল যেন উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান বা উদ্ভাবক বিজ্ঞানী ভোগ করতে পারে সেজন্য তাদের কষ্টলব্ধ উদ্ভাবন রক্ষার জন্যও রয়েছে মেধাস্বত্ব অধিকার আইন। জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের অধিকার রক্ষার জন্য রয়েছে পেটেন্ট (Patent) আইন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিল্প বাণিজ্যে পেটেন্ট অতি সুপরিচিত মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা। কৃষির ক্ষেত্রে এ আইনটির প্রয়োগ শুরু হয়েছে ১৯৮০ সাল থেকে।

আমাদের দেশোপযোগী ফসলের জাত রক্ষার জন্য মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের দেশের শতকরা দশভাগের কম কৃষক উন্নতমানের প্রত্যয়নযুক্ত বীজ সুবিধা পেয়ে থাকে। সিংহভাগ কৃষককে হয় নিজের সংরক্ষণ করা বীজ বা অন্য কৃষকের সংরক্ষিত বীজ ক্রয় করে ফসল ফলাতে হয়। কৃষকের বীজ সংরক্ষণ ও বীজ সংগ্রহের এ চিরাচরিত অধিকারের প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে। নইলে তা আমাদের ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা তথা বীজ বিক্রয় ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় যে অস্থিরতা নিয়ে আসবে তা দেশের মোট উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজননবিদের অধিকার আইন প্রয়োগ করা হলে আরও কয়েকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, এ ধরনের আইনের ফলে নির্দিষ্ট জাতসমূহের বীজের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। একদিকে কৃষক যেমন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ বীজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারে; অন্যদিকে বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যাবে না বিধায় বীজের দাম অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। দ্বিতীয়ত, মেধাস্বত্ব আইন কৃষকের নিকট নতুন প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে বিলম্ব ঘটাবে। কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের জাত সহজে গ্রহণ করবে কি-না সন্দেহ রয়েছে। তৃতীয়ত, কোনো উন্নত নতুন জাতের আবাদ অল্প সংখ্যক কৃষকের আবাদের আওতায় থাকবে। বড় কৃষক ও ধনী কৃষকদের মাঠে এ জাতীয় জাত অধিক আবাদ হবে। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র এবং ক্ষুদে কৃষক এসব জাতের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে। ফসলের জাত রক্ষায় মেধাসম্পদ স্বত্ব আইন আমাদের প্রণয়ন করতেই হবে। WTO-এর স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে এর কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া প্রাইভেট খাতে জাত সৃষ্টি উৎসাহ প্রদান করার জন্যও এর প্রয়োজন হবে। কৃষক ও কৃষির স্বার্থ বিবেচনায় রেখে নিজস্ব দেশের নিরিখে অর্থাৎ Sui Generis পদ্ধতিতে ফসলের জাত রক্ষার জন্য মেধাসম্পদ স্বত্ব আইন করা অধিকতর কার্যকর হবে বলে মনে হয়।

কারণ যা-ই হোক এ জাতীয় আইন প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন দেশোপযোগী হয়। দেশে বিদ্যমান বীজ ব্যবস্থাপনা তথা কৃষিজ উৎপাদনে এ আইন যেন বিরূপ প্রভাব না ফেলতে পারে। ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইন আমাদের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হবে। দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন চুক্তির নামে ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে উচ্চ মান সম্পন্ন কোনো আইন প্রণয়ন আমাদের জন্য বুমেরাং হবে বলে অনুমান করা চলে। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে যেসব বিষয়গুলো মনে রাখা একান্ত আবশ্যক হবে সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করে নিতে হবে।

ফসলের জাতের জন্য মেধা সম্পদ স্বত্ব আইন প্রণয়নের সময় প্রজননবিদ ও কৃষকের জন্য কিছু বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ করা আবশ্যক হবে। আইন কর্তৃক রক্ষিত জাতটির স্বত্ব যেন একটি ন্যূনতম সময়ের জন্য বলবৎ থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রজননবিদকে রক্ষিত জাতটি ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবাধে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং নতুন সৃষ্ট জাতটির স্বত্ব যেন প্রজননবিদ বা সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান পায় সে বিধান এতে থাকা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে কৃষক তার পরবর্তী ফসল ফলানোর জন্য যে কোনো পরিমাণ বীজ সংরক্ষণ করার অধিকার যেন পায়। এ বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরা মাথায় না নিলে তা আমাদের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করবে এবং কৃষকের চিরায়ত বীজ সংরক্ষণ অধিকার নষ্ট হলে ফসলের উৎপাদনে এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৭. ট্রান্সজেনিক ফসল ও পেটেন্ট

কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত জিন এখন প্রায় সব উন্নত দেশগুলোতে পেটেন্ট করা হচ্ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এটি যে, প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত জিনও এখন পেটেন্ট করা হচ্ছে। ফলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিজ্ঞানী এসব জিন ব্যবহার করতে হলে পেটেন্টধারী ব্যক্তি বা বিজ্ঞানীকে রয়্যালটি দিতে হবে। কৃষিতে বিশেষ করে ফসলের ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে নানারকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফসল তৈরি করা হয়েছে। এসব ট্রান্সজেনিক ফসলের মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ফসল, ভাইরাস প্রতিরোধী ফসল, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক প্রতিরোধী ফসল, আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল ইত্যাদি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের গুণগত মানও উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। টমেটোর বিলম্বিত পরিপক্বতা স্বভাব, দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ ক্ষমতা, ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ধান ইত্যাদি এখন বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করার চিন্তা করা হচ্ছে। ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদনকারী প্রাইভেট কোম্পানিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব ফসল নিয়ে ব্যবসা করতে আগ্রহী। কিন্তু সব দেশে এখনও পেটেন্ট আইন প্রণীত না হওয়ায় কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে অনেক দেশেই বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারছে না। অন্যদিকে অনেক দেশ পেটেন্ট আইনের অভাবে এসব ফসলের সুবিধাও ভোগ করতে পারছে না।

৮. বাংলাদেশের পেটেন্ট আইন

আমাদের দেশেও বর্তমানে জীব প্রযুক্তিগত গবেষণা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ফসল, মাছ আর পশু উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এসব গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এসব গবেষণার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিন আমাদের ফসলে সংযোজন করার জন্য পেটেন্ট করা জিন বাইরে থেকে নিয়ে আসা আবশ্যক হয়ে পড়ছে। গবেষণার স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান এসব জিন নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দিচ্ছে বটে, তবে এসব জিন সংযোজন করে কোনো ট্রান্সজেনিক ফসল তৈরি করতে সক্ষম হলে তার মালিকানাটা কিন্তু থাকবে জিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের। কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের পেটেন্ট আইন না থাকায় অনেক

উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট করা জিন পাওয়াও আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ছে। জিন পাবার ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু সম্পূর্ণতই পরনির্ভরশীল সেহেতু এক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যেতে হলে আমাদেরও পেটেন্ট আইন প্রণয়ন করা জরুরি।

বাংলাদেশেও একটি পেটেন্ট আইন রয়েছে। তবে কৃষির ক্ষেত্রে কিভাবে এর প্রয়োগ করা যায় সেরকম কোনো ধারা এতে নেই। তাছাড়া এতদিন এর খুব একটা প্রয়োজনও পড়েনি। আমাদের দেশে বিদ্যমান পেটেন্ট আইনটির ছোট খাটো সংশোধন করে নিলে আমাদের পক্ষে কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভবপর হবে। অবশ্য TRIPS চুক্তির স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে পেটেন্ট আইনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই।

৯. ট্রেড সিক্রেট

উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন এবং পেটেন্ট আইন ছাড়াও আর কিছু মেধাস্বত্ব আইন এখন প্রণীত হচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে কৃষির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে মুনাফা পাবার লক্ষ্যে। তার একটি হলো ট্রেড সিক্রেট (trade secret)। কৃষির অনেক উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ রয়েছে। জীবপ্রযুক্তি নির্ভর পণ্য বা উৎপাদ (product) তৈরির জন্য যেসব জীবীয় পদ্ধতি জড়িত সেসব গোপন রাখার মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া এর উদ্দেশ্য। কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মেধাস্বত্ব অধিকার। ফসলে হাইব্রিড জাত এখন পৃথিবী জুড়েই খুব জনপ্রিয়। সবজি এবং ফল ছাড়াও দানাশস্যের ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাত অত্যন্ত সফল। পৃথিবীর বহু দেশে ভুট্টার হাইব্রিড জাত এখন ভুট্টা চাষের সিংহভাগ এলাকা দখল করে ফেলেছে। ধানের হাইব্রিড জাতের আবাদও দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। সরগাম ও বাজরা ফসলেও হাইব্রিড জাত আবাদ করা হচ্ছে। হাইব্রিড জাতের প্রতি বছর বীজ সৃষ্টি করার জন্য যেসব পেরেন্টাল লাইন ব্যবহার করতে হয় এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করে যাচ্ছে উদ্ভাবক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে B লাইন বা সংরক্ষক লাইনকে (maintainer line) নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে ট্রেড সিক্রেট বাস্তবায়িত করে হাইব্রিড উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো।

আজকাল অনেক প্রজননবিদ হাইব্রিড বীজকে স্বপরাগায়ন করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে যেসব প্যারেন্ট ব্যবহার করা হয় তাদের খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর প্যারেন্টের গোপনীয়তা এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এটি বন্ধ করার জন্যই বিজ্ঞানীরা 'আত্মঘাতী জিন' (suicidal gene) হাইব্রিড জাতে সংযোজন করে দিতে চেয়েছিল। একে টারমিনেটর (terminator) প্রযুক্তি বলে অভিহিত করা হয়। বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠায় এদিকে আর এগুতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। সেজন্য তারা তাদের হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত পেরেন্টের স্বত্ব রক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের দাবি তুলেছে। প্যারেন্ট লাইনের প্যাটেন্ট করে তারা এখন এর স্বত্ব রক্ষা করছে। অন্য দিকে অনেক দেশ প্যারেন্ট লাইনের গোপনীয়তা রক্ষা করেও ট্রেড সিক্রেসি (trade secracy) পাচ্ছে।

১০. বাংলাদেশের কৃষিতে মেধাস্বত্ব বিষয়ক আইন

আমাদের দেশে কৃষির ক্ষেত্রে মেধাস্বত্বের বিষয়টি এখনও শুরুই হয়নি। সেদিক থেকে আমাদের সনাতন কৃষি ব্যবস্থাপনায় এসব বিভিন্ন প্রকার মেধাস্বত্ব আইন কি রকম প্রভাব ফেলবে তা নিশ্চিত করে বলা বেশ মুশকিল। যত ধীরেই হোক না কেনো সামনের দিনগুলোতে এদেশে ট্রান্সজেনিক ফসলের আবাদও শুরু হয়ে যাবে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশ হিসাবে এদেশে মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং এসব আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হোক তাও এ সংস্থাটি চাইবে। ফলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এসব অধিকার রক্ষা করার জন্য আমাদের আইন প্রণয়ন করতেই হবে। বাংলাদেশও মেধা সম্পদ সম্পর্কিত কোনো কোনো আইন বিশেষ করে উদ্ভিদ জাত রক্ষা আইন প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের কৃষি ও কৃষক এ দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কৃষির ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কোনো আরোপিত শর্তে নয় বরং নিজস্ব দেশ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এ আইনগুলো প্রণীত হবে আমরা এটা প্রত্যাশা করি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও ফসলের জিনসম্পদ

১. জিন সম্পদের গুরুত্ব

প্রতিটি ফসলের রয়েছে নানা স্তরের বংশধর। অনেকে খুব কাছের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবার কেউ কেউ বেশ দূরের আত্মীয়। ফসলের এসব আত্মীয়দের কোনো কোনোটি রয়েছে আবাদী পর্যায়ে ফসলের সাথে কৃষকের মাঠে, কোনো কোনোটা এখনও রয়ে গেছে বুনো পরিবেশে। ফসলের মাঠে কোনো কোনো আত্মীয় আবার আগাছা হিসেবে বুনো বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই প্রতিনিয়ত জন্মাচ্ছে। এই যে কাছের দূরের নানারকম বংশধর রয়েছে ফসলের এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতদিন আমাদের ফসলের উন্নয়নে কিছু ভূমিকাও রেখে এসেছে। ফসলের এসব বংশধরের মধ্যে রয়েছে নানা রকম বিরল বৈশিষ্ট্য। আমাদের ফসলের নানা বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব অনেক বৈশিষ্ট্য আজ ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ মূহুর্তে হয়তো ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু এক সময় তা হয়তো ভীষণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।

২. ফসলের জিন সম্পদ হ্রাসের কারণ

ফসলের এসব বংশধর কোনো অবহেলার বস্তু নয়। বরং এগুলো আমাদের ফসল উন্নয়নের মূলভিত্তি। প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ দাতা। ফসল প্রজাননবিদদের নিকট এগুলোর যথেষ্ট কদর রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ফসলের এসব জিন সম্পদ মাঠে, বন জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে প্রকৃতিতে বেশ ভালোভাবেই টিকে ছিল। এগুলোর জন্য বাড়তি কোনো ভাবনাও ছিল না সে সময়। গত শতাব্দীর ষাট সত্তরের দশকে এসে সহজে মাঠ পর্যায়ে ফসলের নানা বংশধর আবাদী পর্যায়ে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। ধানে ও গমে অল্প ক'টি সফল জাতের প্রচার ও প্রসার অন্যান্য দেশী জাতের ধানের ও গমের আবাদ নিরুৎসাহিত করতে থাকলো। এসব জাতের বীজ আগে কৃষকগণ তাদের প্রয়োজনে সংগ্রহ করে নিয়ে আবার পরের বছর সে বীজ ব্যবহার করে ফসল ফলাতো। কিন্তু কৃষক বিভিন্ন ফসলের অল্প ক'টি জাতের আবাদে আগ্রহী হয়ে পড়ায় অনেক জাত চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে আবাদের আওতার বাইরে। তাছাড়া অধিক ফসল ফলাবার জন্য এতদিন পড়ে থাকতো যেসব জমি সেসব জমিও মানুষ আবাদ করতে শুরু করলো। পতিত জমি চলে এলো আবাদের আওতায়। ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করতে গিয়ে নষ্ট করতে হয়েছে বন জঙ্গল। ফলে কেটে ফেলতে হয়েছে নানারকম গাছ গাছালি, নষ্ট হয়ে গেছে ফসলের কত ছোট ছোট বংশধর ।

৩. ফসলের জিন সংরক্ষণ

ফসলের আত্মীয়দের বিলুপ্তির কথা বুঝতে পেরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ফসলের এসব বংশধর তথা ফসলের জিনসম্পদকে রক্ষা করার জন্য শুরু হয় এসব জিন সম্পদ অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ। যেসব দেশে ফসলের উৎপত্তি ঘটেছে সেসব দেশের উৎপত্তিস্থল থেকে বিজ্ঞানীরা সত্তর–আশির দশক জুড়ে সংগ্রহ করেছে অনেক জিন সম্পদ। সৃষ্টি করা হয়েছে বহু আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের জিন ব্যাংকে সারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সংগৃহীত জিন সম্পদ এনে জড়ো করা হয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির সাধারণ সম্পদ এসব জিন সম্পদ-এ শ্লোগানের ভিত্তিতে এসব সম্পদ সংগ্রহ করা হয় সে সময়। এ শর্তে এসব জিন সম্পদ জিন ব্যাংকগুলোতে জমা করে রাখা হয়েছে নানা মেয়াদে যেন এসব জিন সরবরাহকারী দেশগুলো চাহিদা মাফিক পেতে পারে নানারকম জিন সম্পন্ন উদ্ভিদ। এমনকি এসব জিন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যেসব উন্নত ফসল বা ফসলের জাত তৈরি করা হবে তাও নিতে পারবে অন্যান্য দেশগুলো।

এসব জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত যেসব জিন সম্পদ প্রচলিত সঙ্করায়ন পদ্ধতিতে সহজে ফসলের অন্যান্য জাতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে, এদের কাজে লাগিয়ে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলেছে। ফসলের সাথে যৌন মিলনে যারা সক্ষম ছিল এগুলোর জিনকে এতদিন ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত অনেক দূর সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন যাদের সাথে আমাদের ফসলের যৌন মিলন করা অসম্ভব ছিল এদের জিন বা বৈশিষ্ট্য আমাদের ফসলে সংযোজন করা এতদিন সম্ভব হয়নি। জিন প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে এখন এসব জিন সম্পদের জিন অবলীলায় ফসলে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে । ফলে ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছে।

৪. জিন পেটেন্টিংজনিত সমস্যা

জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ যে কোনো জিন সম্পদকে ফসল উন্নয়নের কাজে লাগাবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে বটে তবে পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে নানা সমস্যাও। এর অনেক সমস্যাই ইচ্ছাকৃত, আরোপিত এবং অনৈতিক। ফসলের সংরক্ষিত জিন সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং সৃষ্ট জাতের জন্য পেটেন্টিংসহ চড়ামূল্যে তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা–এসব সমস্যা তৈরি করেছে। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জিন পেটেন্টিং (patenting) সব উন্নত দেশেই প্যাটেন্টযোগ্য মনে করা হতো। তবে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জিনের যে পেটেন্টিং চালু করেছে উন্নত দেশগুলো তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফসলের আত্মীয়দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া জিনের মালিক এককভাবে কোনো দেশ নয়। তাছাড়া নানা দেশ থেকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত জিনেরও মালিক কোনো একক ব্যক্তি বা দেশ নয়। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে এসব জিন পেটেন্টিং-এর কোনো সুযোগ নেই।

পৃথিবীর অধিকাংশ ফসলের উৎপত্তি স্থল হলো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো। নিজেদের এসব জিন সম্পদ নিজের দেশের জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করবে সে ব্যবস্থা তাদের নেই। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় নিজের জিন সম্পদ সুষ্ঠুভাবে

সংরক্ষণ করা ও এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার সামর্থ তাদের নেই। ধনী দেশগুলো জিন সম্পদে দরিদ্র কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে সবল। এসব ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশের জিন সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়েছে নানা কৌশলে। এসব সংগৃহীত জিন সম্পদ থেকে কাঙ্খিত জিন আলাদা করে নিয়ে তারা তা জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলে সংযোজন করে তৈরি করছে ফসলের উন্নত জাত। যে ব্যক্তি বা কোম্পানি উন্নয়নের কাজটি করছে তারা নতুন জাতটি তাদের নামে পেটেন্টিং করে নিচ্ছে। এ পেটেন্টিং-এর সুবাদে জিএম জাতটি বাজারজাত করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে নিচ্ছে।

সবার সাধারণ সম্পদ– এ নাম করে ধনী দেশগুলো দরিদ্র জিন সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো থেকে জিন সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়েছে। আজ এসব জিন আলাদা করে নিয়ে নিজেরাই কেবল মুনাফা লুটছে ধনী দেশগুলো। তাছাড়া পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলো থেকে সংগৃহীত এসব জিন সম্পদ থেকে আলাদা করে নেয়া জিনেরও তারা পেটেন্টিং করে তা আবার নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে সরবরাহ করছে অন্য দেশে। যাদের জিন তাদের এখন এসব জিন পেতে হচ্ছে পয়সার বিনিময়ে।

ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হলো ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো রোগ। এ রোগটি ঘটায় যে ব্যাকটেরিয়া তার নাম হলো *Xanthomonas oryzae*। এ রোগ জীবাণুর বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা দিতে সক্ষম যে জিন একে চিহ্নিত করা হয় Xa 21 হিসেবে। বিহারের পাটনাতে কাজ করার সময় আর সি চৌধুরী নামক একজন বিজ্ঞানী আফ্রিকার মালে থেকে সংগৃহীত একটি বুনো প্রজাতি *Oryza longistaminata* তে এ জিনটির সন্ধান লাভ করে। এ জিনটি ধানের ক্রোমোজোম ১১ তে অবস্থিত। ইরির বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. গুরুদেব খোশ Xa 21 জিনটিকে *Oryza sativa* তে স্থানান্তর করে। যুক্তরাষ্ট্রের ড. ট্যাঙ্কস্‌লি আণবিক মার্কার ব্যবহার করে ড. খোশের ধান গাছের জিনটি শনাক্ত করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে এ জিনটি আলাদা করে নেয়া হয় এবং জিনটি পেটেন্ট করা হয়। এখন পেটেন্টধারী এ জিনটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করছে নিজেদের ইচ্ছে মতো–যদিও জিনটি যে বুনো ধানের প্রজাতি থেকে আলাদা করা হয়েছে সে প্রজাতিটি প্রবর্তন করা হয়েছে আফ্রিকার মালে থেকে।

৫. ফসলের জিন সম্পদ পাচার

জিন প্রযুক্তির সাফল্য ফসলের জিন সম্পদকে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এতদিন জিন ব্যাংকে ফেলে রাখা ফসলের আত্মীয় প্রজাতির জিন বলতে গেলে অব্যবহৃতই থেকে গেছে। এখন জিন প্রযুক্তির কল্যাণে বুনো আধাবুনো আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি আগাছার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকেও ফসল উন্নয়নের কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে এখনও যেসব ফসলের জিন সম্পদ তাদের হাতে পৌঁছেনি সেগুলো পেতে নানারকম কৌশল অবলম্বন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে জিন সম্পদ এদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া। অনেক উন্নত দেশ এখন স্কলারশিপ পাওয়া বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের ফসলের উপর গবেষণা

পরিচালনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এদেশের ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট ফসলের জিন সম্পদ সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে যাচ্ছে। অননুমোদিত অবস্থায় দেশের ফসলের জিন সম্পদ নিয়ে যাওয়ায় জিন সম্পদ আমাদের দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটি জিন সম্পদ পাচার হয়ে যাবার একটি আধুনিকতম উপায়।

অন্যভাবেও চলে যাচ্ছে দেশের জিন সম্পদ। এদেশে ফসলের মাঠে ঘুরে বেড়াবার, ইচ্ছে মাফিক যেকোনো ফসলের জাত সংগ্রহ করায় অধিকার যেন রয়েছে সব দেশের নাগরিকের। বন জঙ্গল যে কোনো ছাড়াও স্থান থেকে নানা ফসলের বীজ বা কন্দ এ দেশের নাগরিকগণ সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে। এই যে যেকোনো ফসলের জিন সম্পদ সংগ্রহের অবারিত সুযোগ আমাদের রয়েছে তারই সুযোগ নেয় এদেশের অনেক অসাধু বীজ ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী, প্রাইভেট কোম্পানির লোকজন বা অসৎ ব্যক্তিবর্গ। আনায়াসে এ দেশের ফসলের জিন সম্পদ সংগ্রহ করে তা অন্য দেশে পয়সার বিনিময়ে পাচার করে দেয় । ব্যক্তিগত লাভের আশায় নির্দ্বিধায় এসব মূল্যবান সম্পদ তুলে দেয়া হয় বিদেশীদের হাতে।

এদেশে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে জিন সম্পদ সংগ্রহের কর্মকাণ্ড চলছে অনেক দিনে ধরেই। বিদেশীরা এসব জিন সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে এদেশে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এসব প্রকল্পের আওতায় নানা এনজিও কর্মীদের জিন সম্পদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় দেশের নানা অঞ্চলে। এই ফাঁকে সংগৃহীত জিন সম্পদের এক কপি চলে যায় অর্থ প্রদানকারী দেশের প্রতিনিধিদের নিকট। আর এভাবে এক সময় তা চলে যায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে। এদেশের জিন সম্পদ এভাবেই চলে গেছে এবং যাচ্ছে নানা পথ ধরে বিদেশের মাটিতে। এসব মূল্যবান জিন সম্পদ যাতে পাচার না হতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল ও জীব নিরাপত্তা

১. জীবের নিরাপত্তায় জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল

মানুষ প্রচলিত পদ্ধতিতে উদ্ভিদ এবং জীবাণুদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এবং মাঠ পর্যায়ে কোনোরকম ঝুঁকির বিষয় মাথায় না রেখেই পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে আসছে। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কথা শোনা যায়নি। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উদ্ভাবিত জিএম উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্ষেত্রে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ও আশংকা রয়েছে। এসব উদ্ভিদ নিয়ে নাড়াচাড়া করার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের হুমকির বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জিএম ফসল সৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতিগত ব্যবধান থাকলে শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই। হয় ফসলের ফলন বৃদ্ধি, নয়তো ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি। পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে জিএম ফসল নিয়ে জীব নিরাপত্তার বিষয়টি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতিতে সঙ্করায়ণ বা মিউটেশন ঘটিয়ে বা কোষ কলা আবাদের মাধ্যমে উদ্ভিদ সমষ্টিতে সৃষ্ট ভিন্নতা থেকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ নির্বাচন করে নেওয়া হলো মূল কাজ। জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে জিন ক্লোনিং করে এবং কৌলিক রূপান্তরণ ঘটিয়ে জাত সৃষ্টি করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত প্রজাতি থেকে জিন ফসলে আহরণ করা হয় কিন্তু জিন প্রযুক্তিতে যে কোনো উৎস থেকে জিন উদ্ভিদে সংযোজন করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্ট ফসলের জাতে জিন স্বাভাবিক স্থানে থেকে যায়, জিন স্থায়ী প্রকৃতির, এগুলোর প্রকাশও স্থায়ীভাবে ঘটে থাকে। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট জাতে সংযোজিত জিন অনিয়ন্ত্রিতভাবে যে কোনো স্থানে অন্বিষ্ট হয়, জিনের গঠনগত স্থায়িত্ব কম এবং এগুলোর প্রকাশ প্রায়শই এক রকম নয়। জিএম ফসলের জাতে জিনের প্রকাশের মাত্রা অধিক, জিন নিয়ন্ত্রণ জিন গঠন নকশা অনুযায়ী হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে জিনের প্রকাশ প্রাকৃতিকভাবে যা হবার তা-ই হয় এবং এগুলোর নিয়ন্ত্রণ হয় প্রাকৃতিকভাবে।

২. জেনেটিক্যালি মোডিফাইড খাদ্য নিয়ে আশংকার কারণ

জিএম জাতের উৎপাদিত ফসল বা জিএম খাদ্য প্রচলিত জাতসমূহে থেকে প্রাপ্ত খাদ্য থেকে যেসব কারণে ভিন্নরকম তা হলো- (১) ট্রান্স জিন কর্তৃক সৃষ্ট প্রোটিন খাবারে থাকে, (২) ট্রান্স জিনের কারণে সৃষ্ট উৎপাদ খাদ্যে থেকে যেতে পারে, (৩) খাদ্যে পরিবর্তিত মাত্রায় বিষাক্ত উপাদান বা অন্যান্য পুষ্টি থাকতে পারে, (৪) খাদ্যে নির্বাচনক্ষম মার্কার জিন কর্তৃক সৃষ্ট এনজাইম বিদ্যমান থাকতে পারে এবং (৫) এসব

খাবারে থেকে যেতে পারে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন। জিএম ফসলে সংযুক্ত কাঙ্ক্ষিত জিন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিন বিদ্যমান থাকায় যেসব ঝুঁকির কথা সাধারণত ভাবা হয় সেগুলো হলো-

(১) জিনের নির্দেশ অনুযায়ী সৃষ্ট প্রোটিন বা এদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদ বিষাক্ত হতে পারে বা এলার্জির কারণ হতে পারে অথবা এ দুটিই ঘটাতে পারে কি-না।

(২) এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুর মধ্যে সংশ্লিষ্ট হবার কারণে এরা এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে কি-না।

(৩) নতুন সংযোজিত বৈশিষ্ট্যটি ফসলের সাথে সম্পর্কিত যৌন জননক্ষম অন্য জাতে বা আগাছাতে স্থানান্তরিত হতে পারে কি-না।

(৪) পরিবেশে এসব জাত অবমুক্তির কারণে এগুলোর পরাগরেণুসহ ফসলের মধ্যে বিদ্যমান জিনের উৎপাদ মৃত্তিকাস্থ অনুজীবসহ পরিবেশের মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য জীবকূলের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে কিনা এবং পরিবেশকে বিপন্ন করতে পারে কি-না।

(৫) ভাইরাস প্রতিরোধী জিনের সাথে ফসলে আক্রমণকারী ভাইরাসের পুনঃসংযুক্তকরণের (recombination) মাধ্যমে অধিকতর আগ্রাসী ভাইরাস উপজাত (strain) সৃষ্টি করতে পারে কি-না এবং

(৬) কীট প্রতিরোধী জিনের কারণে পতঙ্গের উপর যে নির্বাচন চাপ পড়বে সেজন্য নতুন নতুন ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের উদ্ভব ঘটতে পারে কি-না।

৩. জীব নিরাপত্তা সম্পর্কে চুক্তি

জিএম নিয়ে সৃষ্ট এসব আশংকার কারণে জিএম উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মাঠ পর্যায়ে যাচাই বাছাই এবং জিএম ফসল মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করার পূর্বে কি কি জীবনিরাপত্তাজনিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত এসব নিয়ে বিভিন্ন দেশ বিষদ কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। জিএম উদ্ভিদ বা জিএম ও এর নিরাপদ স্থানান্তর, এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আইনগত বৈশ্বিক যে প্রোটোকল জাতিসংঘের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (Convention on Bio-diversity, CBD) অবলম্বন করেছে একে কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (Cartagena Protocol on Biosafety) বলা হয়। কলোম্বিয়ার কার্টাহেনা শহরে ১৯৯৯ সনে প্রোটোকলের খসড়া চূড়ান্ত করা হয় বিধায় স্থানটির স্মরণে প্রোটোকলটির এরকম নামকরণ করা হয়। পৃথিবীর ১৩৫টি দেশের স্বাক্ষর প্রদানের মধ্য দিয়ে এটি একটি আইগত বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়। বিগত ২০০৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ প্রোটোকলটির কার্যকারিতা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১৪০টি দেশ এ জীবনিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ২০০৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এ প্রোটোকল অনুমোদন করে। বাংলাদেশ এ প্রোটোকলের স্বাক্ষর দাতা দেশ হিসেবে জীব নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো নিয়ে নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপায় বলে দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রদান করতে বাধ্য। তাছাড়া আমাদের দেশে জিএম উদ্ভিদ নিয়ে ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হওয়ায় আগামী দিনে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু

হবে বিধায় এরকম গাইড লাইন অথবা জীবনিরাপত্তাজনিত আইন পাস করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। অবশ্য এ সংক্রান্ত একটি খসড়া অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৪. বাংলাদেশে জীব নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা

বাংলাদেশে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বায়োসেফটি গাইডলাইন অব বাংলাদেশ (Bio-safety Guidline of Bangladesh) তৈরি করেছে। এ গাইড লাইনের উদ্দেশ্য হলো আধুনিক জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জিএম উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব নিয়ে গবেষণা ও প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলা যেন মানবস্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও মানবস্বাস্থ্যের উপর জিএম এর সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কার্টাহেনা প্রোটোকল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় জীব নিরাপত্তা অবকাঠামো (National Biosafety Framework, NBF) প্রণয়ন করা হয়েছে। NBF জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক যে কোনো কার্যক্রম পরিচালনায় জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর উপর ভিত্তি করে জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নিয়মনীতি এবং বিধি-বিধান তৈরি করা হবে । এ মন্ত্রণালয়ের একটি ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (National Committee on Bio-safety, NCB) রয়েছে। এ কমিটি হলো জীবনিরাপত্তা দেখভাল করার যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ। ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটিকে সহায়তা দানের জন্য রয়েছে একটি বায়োসেফটি কোর কমিটি (Bio-safety Core Committee, BCC)। জীবপ্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ে দেখাশুনা করা এবং জিএম ফসল বা জিএম খাদ্য বাণিজ্যিকভাবে বিপণন করা পর্যন্ত দেখাশুনা করার দায়িত্ব এ কোর কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। NCB- এর আওতাধীন রয়েছে ইনস্টিটিউটভিত্তিক বায়োসেফটি কমিটি- যাকে বলা হয় ইনষ্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটি (Institutional Bio-safety Committee, IBC)।

প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা এ কমিটির কাজ। মাঠ পর্যায়ে রয়েছে মাঠ পর্যায়ের জীব নিরাপত্তা কমিটি (Field Level Bio-safety Committee)। মাঠ পরীক্ষণ ও মাঠে অবমুক্ত করার ক্ষেত্রে এ কমিটি জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। জীবপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছে যেসব মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলো এর প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে রয়েছে একটি করে কারিগরি কমিটি যাদের বলা হয় ন্যাশনাল ট্যাকনিক্যাল কমিটি (NTC)। এসব ট্যাকনিক্যাল কমিটি জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্যায়নের বিষয়ে NCB কে সহায়তা প্রদান করে। ইতোমধ্যে বেশ ক'টি মন্ত্রণালয়ের অধীন এ ধরনের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটিগুলো হলো- ন্যাশনাল ট্যাকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (NTCCB), ন্যাশনাল ট্যাকনিক্যাল কমিটি অন মেডিক্যাল বায়োটেকনোলজী (NTCMB) এবং ন্যাশনাল ট্যাকনিন্যাল কমিটি অন ফিসারিজ এন্ড লাইভস্টক বায়োটেকনোলজি (NTCFLB)।

কোনো আবেদন পাবার পর আবেদনপত্রটি প্রক্রিয়াকরণ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গবেষণা চালিয়ে যাবার একটি সিস্টেম এখন চালু রয়েছে। জিএম উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাবার জন্য যে নিয়ম নীতি এখন বিদ্যমান রয়েছে তা নিচের চিত্রে প্রদর্শন করা হলো।

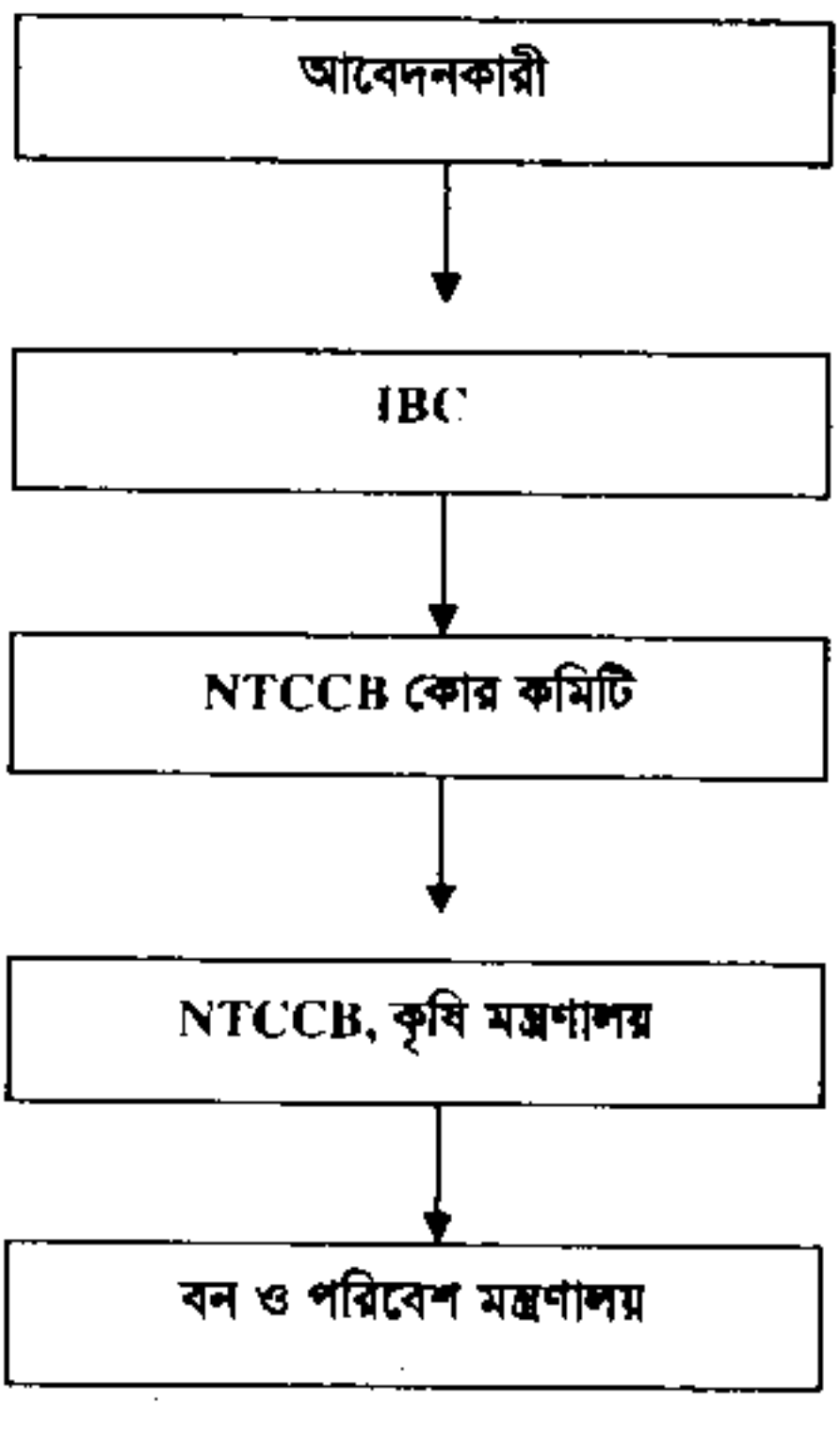

চিত্র ২৩.১ : জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিদ্যমান নীতি

আবেদনকারীর আবেদনপত্রের প্রাথমিক বাছাই করে ইনস্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটি (IBC)। পরে প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ চলে যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ট্যাকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োট্যাকনোলজির (NTCCB)— এর কোর কমিটির হাতে। কোর কমিটির মতামত আবেদনকারীর অনুকূলে হলে কমিটির যথাযথ মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ তা চলে যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ট্যাকনিক্যাল কমিটিতে। এ কমিটিতে কৃষির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও আইন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এখানে বিষয়টি বিবেচনার

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পর্যালোচনা শেষে সুপারিশ আকারে তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বায়োসেফটি কমিটির মূল্যায়নের পরে আবেদনের বিষয়ে অনুমোদন দান করা বা অনুমোদন দান না করার ক্ষমতা কমিটির রয়েছে। তবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (৪৫ দিন) পর্যন্ত পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাছে থেকে কোনো সাড়া পাওয়া না গলে এটি আপনা থেকেই অনুমোদিত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জাতীয় জীবনিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্কে যে কর্মধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

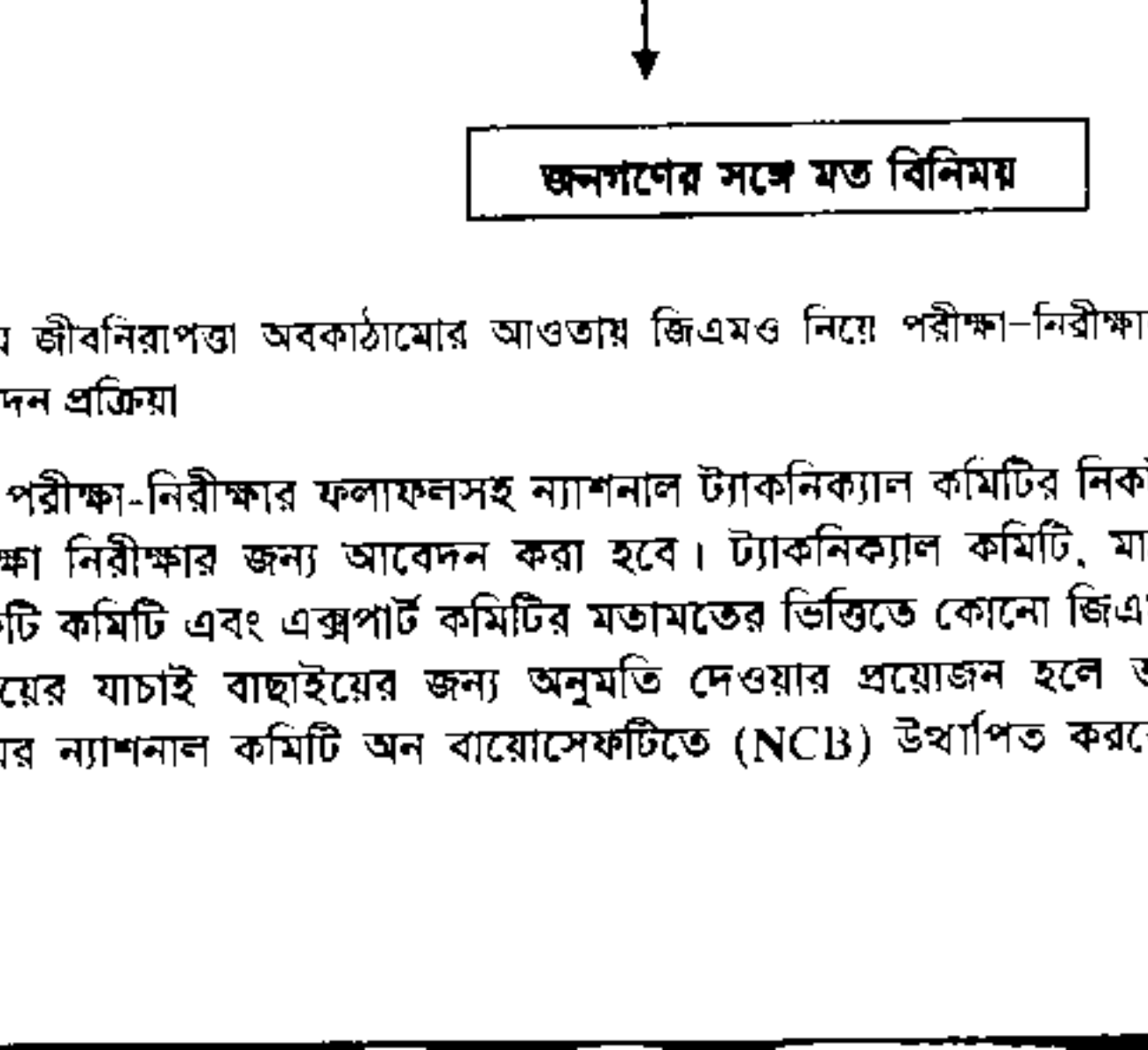

চিত্র ২৩.২ : জাতীয় জীবনিরাপত্তা অবকাঠামোর আওতায় জিএমও নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুমোদন প্রক্রিয়া

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলসহ ন্যাশনাল ট্যাকনিক্যাল কমিটির নিকট মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আবেদন করা হবে। ট্যাকনিক্যাল কমিটি, মাঠ পর্যায়ের বায়োসেফটি কমিটি এবং এক্সপার্ট কমিটির মতামতের ভিত্তিতে কোনো জিএম ফসলের মাঠ পর্যায়ের যাচাই বাছাইয়ের জন্য অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটিতে (NCB) উত্থাপিত করতে

হবে। ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (NCB) এর যে কোর কমিটি অর্থাৎ BCC রয়েছে সেখানে আবেদনকৃত বিষয়টির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের পর তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়ার বিধান রয়েছে। পঁয়তাল্লিশ কর্মদিবসের মধ্যে NCB-এর কোনো জবাব না পাওয়া গেলে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে কোনো বাঁধা নেই বলে ধরে নেওয়া হয়।

বাংলাদেশে কোনো জিএম খাদ্য বা জিএম গোখাদ্য আমদানি করতে হলে দেশের নিয়ন্ত্রণকারী কোনো ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এর অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জিএম খাদ্যের নিরাপত্তাজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় Guidelines on Safety Assesment of GM Foods নামক কোনো গাইডলাইন এখনও তৈরি করা হয়নি। ফলে এ বিষয়টি নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করা দরকার। এরকম গাইডলাইন তৈরি হয়ে গেলে যথাযথ স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরুপণ করার পর ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে আবেদনপত্রটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধমে প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে।

৫. ঝুঁকি নিরূপণ, ব্যবস্থাপনা এবং অবহিতকরণ

জিএম ফসলের আবাদ এবং জিএম খাদ্য ভক্ষণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে কোনো ঝুঁকির সৃষ্টি করবে কি-না তা নিশ্চিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশেরই আধুনিক জীবপ্রযুক্তির উৎপাদ ব্যবহার এবং ছাড়করণের জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং দমন করার সিস্টেম থাকা দরকার। এর জন্য বাংলাদেশেও থাকা দরকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য দেশের সাথে সাজুয্য রক্ষা করে তৈরি করা নিরাপত্তা প্রটোকল। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কতগুলো আন্তজার্তিক সংস্থার নিয়ম-কানুনের সাথে সমন্বয় রেখে নিজস্ব ঝুঁকি নিরূপণ, ব্যবস্থাপনা তথা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে।

ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফসলের উৎপাদিত পণ্য বা জিএম খাদ্যের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়। মূল্যায়ন করার সময় ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে তেমন উপাদান কি তা জানা, কি মাত্রায় তা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কোনটির জন্য এটি অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এগুলো নির্ণয় করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং স্বচ্ছতার সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে (case by case) ঝুঁকি নিরূপণ করার প্রয়োজন হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব থাকলে অনুমানের ভিত্তিতে ঝুঁকি নেই বা ঝুঁকি আছে তা বলা যাবে না। তবে অন্যান্য আন্তজার্তিক সংস্থার অধীনে কোনো জিএম ফসল বা জিএম খাদ্যের ঝুঁকি নিরূপণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলে এ ধরনের কোনো কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদেশে না করলেও চলতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাচাই বাছাই অবশ্যই এদেশের জল-হাওয়া-মৃত্তিকায় অনুষ্ঠিত হতে হবে। কার্টাহেনা প্রটোকল অন বায়োসেফটি (CPB) অনুযায়ী প্রতিটি দেশেরই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয়

উপায় থাকতে হবে। ঝুঁকির মাত্রা মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদ্ধতি জানা থাকতে হবে।

গোড়াতেই ঝুঁকি মূল্যায়নের বিষয়টি আসে। মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা, তুলনা করা এবং এর গুরুত্ব বিচার বিশ্লেষণ করা এবং ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে আনা বা ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়গুলো। কি কি কারণে কি মাত্রায় ঝুঁকি আসতে পারে এবং তা কতটা তৎপরতার সাথে মোকাবেলা করা যায় সেটিও ব্যবস্থাপককে বুঝতে হবে । তৃতীয় ধাপে আসে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। এজন্য প্রয়োজন হতে পারে কোনো বিশেষ কৌশল বা বিশেষ যন্ত্রপাতির। বিশ্লেষণ এবং নির্দিষ্ট উপাদানকে শনাক্ত করা প্রয়োজন হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করেই বোঝা যাবে জিএম ফসল বা জিএম খাদ্য মাঠে এবং বাজারে চালু থাকবে না-কি তা তুলে আনতে হবে। যেকোনো জিএম খাদ্য বা জিএম ফসলের উৎপাদিত পণ্য ভালভাবে শনাক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং এতে যথাযথ পরিচিতি প্রদান করা দরকার।

ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা জিএম খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও গ্রহণ করে তাদের নিকট ঝুঁকির বিষয়টি অবহিতকরণের লক্ষ্যে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ব্যবাস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। যথাযোগ্য তথ্য উপাত্তসহ ঝুঁকির বিষয়টি সাধারণের নিকট বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে হবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিবেদন যেন আগ্রহী লোকজনের নিকট সরবরাহ করা যায় সে ব্যবস্থাও থাকতে হবে। বিভিন্ন পেশার মানুষের মনের নানা প্রশ্ন যেন আন্তরিকতার সাথে মোকাবেলা করা যায় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা যেমন উচিত নয়, কোনো কিছু কমিয়ে বলার সুযোগ ও থাকা উচিত নয়। বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এবং সত্যকে অন্যদের সামনে তুলে ধরা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও জিএম ফসল

১. স্বাধীনতাউত্তরকালে ফসলের উন্নয়ন

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য। এদেশে উৎপাদনক্ষম জনশক্তির প্রায় শতকরা ৬২ ভাগ কৃষি কাজে নিয়োজিত। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান শতকরা ২৩ ভাগ। বাংলাদেশের কৃষির সবচেয়ে বড় খাত হলো ফসল খাত। সারা বছর এ দেশে প্রায় ১০০ ধরনের ফসলের আবাদ হয়। স্বাধীনতার পর থেকে গত পঁয়ত্রিশ বছরে ফসল উন্নয়ন এবং ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নতুন নতুন আধুনিক জাত উদ্ভাবন ও এগুলোর আবাদ এবং নতুন নতুন আবাদ কৌশল অবলম্বনের ফলে অনেক ফসলের ক্ষেত্রেই প্রতি একক ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাধীনতাউত্তরকালে বিভিন্ন ফসলের আবাদী এলাকার পরিমাণ এবং ফলন বৃদ্ধির পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলে ফসল খাতে আমাদের কতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার একটি আভাস পাওয়া যায়। ভূমি আবাদের ক্ষেত্রে এদেশে মোট আবাদী জমির ৭৫% ধান, ৩.১ % তেল, ৩.৫% ডাল, ৫.৮% গম, ২% শাক সবজি, ২% মসলা এবং ৮% জমিতে অন্যান্য ফসলের আবাদ হচ্ছে। ১৯৭১ সালে চালের উৎপাদন ছিল ১ কোটি মেট্রিক টন, যা ২০০১- ০২ সালে এসে প্রায় ২.৬০ কোটি টনে উন্নীত হয়। তিন দশকে চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে যেখানে গমের মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ৬০ হাজার মেট্রিক টন, সেখানে ২০০০-২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১৮ লক্ষ টনে। আর্থাৎ গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ গুণ। গত তিন দশকে আলুর উৎপাদন ৯ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৩৬ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে এবং ভুট্টা তিন হাজার টন থেকে বেড়ে ১.৫ লক্ষ টনে পৌছেছে। একই সময়ে শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩-৪ গুণ। অন্যান্য শস্য যেমন ডাল, তেলবীজ, ইক্ষু ও পাটের হেক্টর প্রতি ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বহুসংখ্যক শস্যের উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এ দেশের ৬০ ভাগ ধানের জমি এবং ১০০ ভাগ গমের জমিতে উন্নত জাতের আবাদ করা হচ্ছে। উন্নত জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি উদ্ভাবিত হয়েছে নানারকম ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি।

২. আগামী দিনের খাদ্য চাহিদা

এতক্ষণ যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এগুলো হলো ফসল উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা। বিগত তিন দশকে অর্জিত সাফল্যের পরও আজকের কৃষি তথা ফসলের উৎপাদন নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

হিসেব করলে সহজেই বেরিয়ে আসে যে ২০১০ সন নাগাদ আমাদের অতিরিক্ত খাদ্যে শস্যের প্রয়োজন হবে ৫-৬ মিলিয়ন টন। অথচ যে হারে আমাদের আবাদী জমি হ্রাস পাচ্ছে তাতে করে এ অতিরিক্ত উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এখনকার তুলনায় ২ মিলিয়ন হেক্টর কম জমিতে। সুতরাং প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন এবং তা সব জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়া কতটা কঠিন হবে তা প্রজ্ঞাবান মানুষের জন্য অনুমান করা কঠিন হবার কথা নয়।

৩. ফসল উৎপাদনের সমস্যা

বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ স্থলভাগ বন্যাপ্রবণ। সাধারণত দেশের শতকরা ২২ ভাগ এলাকা প্রতি বছর বন্যা কবলিত হয়। স্বাভাবিক বন্যায় প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমি প্লাবিত হয়। বাংলাদেশে খরিফ, রবি এবং প্রাক-খরিফ পর্যায়ে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এদেশের ৫০.৫ লক্ষ হেক্টর জমি খরা কবলিত। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নঁওগা, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাংগাইল জেলার কিছু কিছু অংশ অতি তীব্র ও তীব্র খরা কবলিত হয় দুটি ফসল মৌসুমে বা অন্তত যে কোনো এক মৌসুমে। বাংলাদেশে প্রায় ১৫-২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া ভূমিক্ষয়, ভূমি ধস ইত্যাদি সমস্যাতো রয়েছেই।

বাংলাদেশে ফসলের বড় শত্রু রোগ বালাই আর কীটপতঙ্গ। অনেক ফসলে প্রচলিত পদ্ধতিতে রোগ দমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি বিধায় রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগই কীট বা রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণের একমাত্র জনপ্রিয় দমন কৌশল হিসেবে রয়ে গেছে। কীটপতঙ্গ দমনের ক্ষেত্রেও আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি তা বলা যাবে না। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ প্রতি বছর উৎপাদিত ধানের ১৬%, গমের ১৫%, আখের ২০%, শাকসবজির ২৫%, পাটের ১৫% ও ডাল জাতীয় শস্যের ২৫% ক্ষতিসাধন করে। এদেশে প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতিতে কীট প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি করা গেছে অল্প ক'টি জাতে। ফলে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ ছাড়া এসব কীটপতঙ্গ দমনের আর কোনো উপায় এ মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই।

৪. বাংলাদেশে জিএম উদ্ভিদের পরীক্ষামূলক গবেষণা

বাংলাদেশে গত তিন চার বছর ধরে অল্প ক'টি ফসলের জিএম উদ্ভিদ নিয়ে নিয়ন্ত্রিত কাঁচ ঘরে নিবিড় পরীক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব জিএম উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে β-কেরোটিন সমৃদ্ধ BR- ২৯, Bt জিন সম্পন্ন ৯ টি বেগুনের জাত, বিলম্বিত ধ্বসা (late blight) প্রতিরোধী জিন সম্পন্ন গোলআলু গাছ এবং খরা বা লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন সম্পন্ন ধান গাছ। Bt জিন সম্পন্ন জিএম বেগুনের গবেষণা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে । বিজ্ঞানীরা ভারত থেকে জিএম বেগুনের সাথে আমাদের ৯ টি বেগুনের জাতের সংকরায়ন করে পাওয়া F_1 বীজ নিয়ে এদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। জিএম F_1 বেগুন গাছগুলো যেন Bt জিনসহ গুণে মানে আমাদের স্ব স্ব জাতগুলোর সমতুল্য হয়ে উঠে এ লক্ষ্যে F_1 গাছগুলোকে সংশ্লিষ্ট

বেগুনের জাতের সাথে ব্যাকক্রস (backcross) করা হয়। বছরে দু'বার গাছগুলো জন্মাবার সুবাদে ২ বছরে পাওয়া যায় এগুলোর BC_4 বংশধর। অত:পর এক ঋতুতে এগুলোর স্ব-পরাগায়ন সম্পন্ন করে পাওয়া গেছে BC_4F_2 উদ্ভিদ। এসব বিভিন্ন জাতের Bt জিন সম্পন্ন বেগুনের গাছগুলো যথেষ্ট মাত্রায় কীট প্রতিরোধক্ষমতা প্রদর্শন করেছে এবং এগুলোর ফলনশীলতা প্রায় নির্দিষ্ট স্ব স্ব জাতের অনুরূপ বলে দেখা গেছে। এগুলোর নিয়ে এখন নিয়ন্ত্রিত মাঠ গবেষণা চালিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সরকারের অনুমোদন পেলে নিয়ন্ত্রিত মাঠ গবেষণা চালিয়ে যাবে বিজ্ঞানীরা।

সোনালী ধান নিয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট ইতিবাচক নয়। BR 29 এ সংযোজিত জিনসমূহের বহিঃপ্রকাশ কাঙ্খিত মাত্রায় β–কেরোটিন উৎপাদন করতে পারেনি। তাছাড়া জিএম BR 29 উদ্ভিদের ফলনশীলতা সাধারণ BR 29 ধানের জাতের সমকক্ষ নয়। ফলে এ নিয়ে আরও গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া জিএম ধানের উদ্ভিদ আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতে পারে। জিএম গোলআলু আর লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধান নিয়ে গবেষণা এ দেশে এখনও বেশি দূর এগুতে পারেনি।

৫. বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড উদ্ভিদের পরীক্ষামূলক গবেষণার ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র

গত তিন দশক ধরে জিন প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কোনো কোনো ফসলে কীট প্রতিরোধিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ব্যাকটেরিয়ার Bt জিন ফসলে সংযোজন করে দিয়ে বেশ ক'টি ফসলে জিএম জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর বেশ ক'টি দেশে এসব Bt ফসলের আবাদও শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে যদি Bt ফসল আবাদ করা যায়, তবে কীটপতঙ্গের বিপক্ষে বেশ ক'টি ফসলে প্রতিরোধক্ষমতা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় বেগুন, করলা, উচ্ছে আর লাউ পরিবারের ফসলের আবাদের ক্ষেত্রে। তাছাড়া তুলা এবং ধানের মাঠেও কীট নাশক প্রায়শই প্রয়োগ করতে হয়। ফলে উৎপাদন খরচ যেমন বেড়ে যাচ্ছে তেমনি তা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে। বেগুনে এদেশে সবচেয়ে বেশি কীটনাশক দিতে হচ্ছে বলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে Bt বেগুন নিয়ে গবেষণা এগুচ্ছে এখানে। চীন দেশে Bt ধানেরও পরীক্ষামূলক আবাদ শুরু হয়েছে। Bt ধানের আবাদ নিরাপদ প্রমাণিত হলে তা এ দেশেও আবাদ করা যেতে পারে যাথাযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। এদেশে আনা যেতে পারে Bt তুলার জাত। এখন অবশ্য Bt ভুট্টারও বাণিজ্যিক আবাদ হচ্ছে কোনো কোনো দেশে। আর সবজিতে Bt জিন বা অন্যান্য কীট প্রতিরোধী উদ্ভিজ্জ জিন (Plant derived gene) ব্যবহার করে জিএম ফসলও তৈরি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আগামী দিনে প্রচলিত পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত ফসলের জাতের পাশাপাশি জিএম ফসলের আবাদ তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিবেশ বান্ধব অবস্থায় অধিক ফলন পাবার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশে কোনো কোনো ফসলের কোনো কোনো রোগজীবাণু মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ফসলের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো- *Fusarium* প্রজাতির রোগজীবাণু দিয়ে আক্রান্ত স্ক্যাব বা উইল্ট রোগ, *Phytophthora* প্রজাতি কর্তৃক গোলআলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ, গমে *Puccinia graminis* কর্তৃক সৃষ্ট ব্লাস্ট রোগ এবং *Rhizoctonia solani* কর্তৃক সৃষ্ট বহু ফসলের রট বা স্ক্যাব রোগ ও ইক্ষুর লাল পচা রোগ। ভাইরাস রোগের মধ্যে পেঁপে, টমেটো, ঢেঁড়শের নানারকম মোজাইক ভাইরাস রোগ খুবই ক্ষতিকারক। শিম ফসলেও ভাইরাস একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগজীবাণু। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে রয়েছে দ্বিবীজপত্রী ফসল আক্রমণকারী নানা *Agrobacterium* প্রজাতি, শীমজাতীয় ফসলে *Pseudomonas syringe* কর্তৃক নানা রকম রোগ, *Xanthomonas* প্রজাতির মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্ন ফসলের নানারকম রোগ।

খরা, লবণাক্ততা আর পানিবদ্ধতা বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের একটি অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি। ফলে খরা ও লবণাক্ততা কবলিত জমিতে ফসলের আবাদ করতে হলে এবং তুলনামূলকভাবে ভালো ফসল পেতে হলে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল আবাদ করতে হবে। খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে কিছু কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ধানের ক্ষেত্রে ট্রেহালেজ জিন ঢুকিয়ে দিয়ে পাওয়া জিএম উদ্ভিদ ইতোমধ্যে বাংলাদেশে নিয়ে এসে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। যদি এসব জিএম উদ্ভিদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সফলতা প্রদর্শন করতে পারে, তবে নিয়মমাফিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আগামী দিনে এসব জিএম ধান ফসল হিসেবে কৃষকের মাঠে জন্মানো হতে পারে। এক্ষেত্রে জিএম ফসলের সফলতা আমাদের জন্য এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এদেশে খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিএম ধান নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পৃথিবীর নানাদেশে আবাদকৃত জিএম ফসলের জাত এদেশে কেমন ফলাফল প্রদর্শন করে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধীরে ধীরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এদেশে শুরু করতে হবে। পাশাপাশি কীট, রোগ, খরা, ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বাছাই করে নেবার জন্য জিএম উদ্ভিদ নিয়ে আগামী দিনে নি:সন্দেহে আরও অধিকতর গবেষণা পরিচালিত হবে। হয়তো ততদিনে জিএম উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি জীব নিরাপত্তা রক্ষা করে পরীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি আরো উন্নততর হবে এবং জিএম নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এদেশের উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জিএম জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে।

তথ্যপঞ্জি

ইংরেজি

Anonymous. 2004. The state of food and Agriculture. 2003-2004. FAO Agriculture Series No. 35. Food and Agriculture Organizations of the United Nation. Rome.

Bansal K.C. 2000. Biotechnology for improving product quality in horticultural crops. *In*: Biotechnology and Plantation Crops. K.L. Chadha, P.N. Ravindran and L. Shahijram (Eds.). Malhotra Publishing House, New Delhi.

Bhattacharya R.C., S.R. Bhat and V.L. Chopra.1999. Biotechnology for increasing the efficiency of Plant Breeding.1999. *In*- V.L. Chopra, V.S. Malik and S.R. Bhat (Eds.). Applied Plant Biotechnology. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt.Ltd., New Delhi.

Chadha K.L., P.N. Ravindra and L. Shahijram. 2000. Biotechnology in Horticulture. *In*: Biotechnology and Plantation Crops. K.L. Chadha, P.N. Ravindran and L. Shahijram. (Eds.). Malhotra Publishing House, New Delhi.

Chrispeels M.J. and D.E. Sadava 1994. Plants, Genes and Agriculture. Jones and Bartlett Publishers, London.

ISAAA. 2005. Briefs No. 34: Executive Sumntary. http: // www. isaaa. irg/kc.

Kumar P.A. 2000. Biotechnological approaches to insect pest management in fruits and vegetables. *In*: Biotechnology and Plantation Crops. K.L. Chadha, P.N. Ravindran and L. Shahijram. (Eds.) Malhotra Publishing House, New Delhi.

Mandaokar D., P. A. Kumar and R.P. Sharma. 2000. Genetic engineering for vegetable crop improvement. *In*: Biotechnology and Plantation Crops. K.L. Chadha, P.N. Ravindran and L. Shahijram (Eds.). Malhotra Publishing House. New Delhi.

Pocket K No. 2. Plant products of Biotechnology. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No. 4 GM crops and the Environment. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No. 6. 2005. Bt insect resistance technology. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No. 7. 2005. Labeling GM Foods. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket No. 8. 2005. Cartagena Protocol on Biosafety. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No. 9.2005. Intellectual Property Rights. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No. 10. 2005. Herbicide tolerance technology. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No. 16. 2005. Global status of Commercialized Biotech/GM crops in 2004.Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Pocket K No.17. 2005. Genetic Engineering and GM Crops. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Robinson J. 1999. Ethics and transgenic crop: a review. Plant Biotechnology. 2 (2): 1-15.

Singh B.D. 2006. Plant Biotechnology. Kalyani Publishers, New Delhi.

Slater A., N. Scott and M. Fowler. 2003. Plant Biotechnology- The genetic manipulation of plants. Oxford University Press.

Pocket K No. 4. GM crops and the Environment. Global Knowledge Center on Crop Biotechnology. ISAAA, Philippines.

Sarker, R.H. 2005. Bangladesh is progressing towards development of transgenic crops. Newsletter. 1 (5): 1.

বাংলা

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৪। ট্রান্সজেনিক ফসল। নবীন বিজ্ঞানী। ১৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৪। ফসলের জাত রক্ষায় মেধাস্বত্ত্ব। নবীন বিজ্ঞানী। ১৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৪। কৃষিতে মেধাসম্পদস্বত্ত্ব। পুরোগামীবিজ্ঞান। ১ম -৪র্থ সংখ্যা, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ডঃ কুদরত-এ-খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

ভূঁইয়া, শ র। ২০০৬। উদ্ভিদ প্রজনন ও বিবর্তন। প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার। হযরত শাহ্জালাল মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।